বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা
একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

"বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি"
(English title: Political Economy of Agrarian-Land-Aquarian Reform in Bangladesh)

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা ১৫ জুলাই ২০১৬
স্বত্ব ২০১৬ © আবুল বারকাত
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পঞ্চম গ্রন্থ

বাংলাদেশে আবুল বারকাত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে
আবুল বারকাত
বাড়ী নং ৫, রোড নং ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
(ফোন নং: ৮১১৬৯৭২, ০১৭৫৬১৪২৩১৫;
ইমেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা রোড
নীলক্ষেত, ঢাকা।

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ISBN : 978-984-34-0949-2

মূল্য: ৫০০ টাকা, ইউএস ৪০ ডলার, ইউকে ৩০ পাউন্ড, ইউরোপ ৩২ ইউরো

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০১৬), বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে
দেশের যে ৯৩ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস
করতেন এবং এখন যাঁরা গ্রামের মানুষ
তাদের প্রতি

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা

অধ্যায় ১ 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার' নিয়ে মুখ বন্ধ কেন: কিছু ভূমিকা, কিছু প্রাক্‌কথন ৮

২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: কি এবং কেনো? ১২

২.১ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে মর্মার্থ কি? ১২

২.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কেনো? উন্নয়ন ও জীবন সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের পথ ১২

২.৩ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কেনো? পশ্চাৎমুখী আর্থ-সামাজিক প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ ১৬

৩ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সংশ্লিষ্ট প্রধান বিষয়াদির রাজনৈতিক অর্থনীতি ২৩

৩.১ খাস জমি ও জলা– দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই হিস্যা কিন্তু লুট নিরন্তর ২৩

৩.২ চরের জমি– আল্লাহ জানে মালিক কে? চরের মানুষের প্রান্তিকতা ২৭

৩.৩ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রিক প্রান্তিকতা: শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন ৩০

৩.৪ আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা: ছিটেফোঁটা সংস্কার দিয়ে হবে না ৩৪

৩.৫ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতা– জল-জলায় অধিকার নেই ৪৬

৩.৬ লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ– দারিদ্র্য ও বঞ্চনার এক নতুন মাত্রা ৪৭

৩.৭ ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্ব: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্যতম ক্ষেত্র ৪৯

৩.৮ নারীর ক্ষমতায়ন, জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনে সীমিত, বাস্তবে অনুপস্থিত ৫৪

৩.৯ ভূমি-মামলায় জাতীয় অপচয়: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের আরেকটি শক্ত যুক্তি ৬৩

৩.১০ ভূমি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আইন ও নীতিমালা: দুর্বৃত্ত-রেন্ট-সিকারদের স্বার্থ সংরক্ষণের যন্ত্র মাত্র ৬৫

৩.১১ ভূমি আইন: দরিদ্র বিরোধী আর 'রেন্ট-সিকার' দুর্বৃত্ত সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম ৬৭-৭৯

চরের জমি ৬৯ জলমহাল বিষয়ক ৬৯ চিংড়িমহাল ৭০ পাথরমহাল ৭০ বালুমহাল ৭১ চা বাগানের ভূমি ৭১ কৃষি খাস জমি ৭২ অকৃষি খাস জমি ৭২ অর্পিত সম্পত্তি ৭৩ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ৭৪ ভূমি অধিগ্রহণ ৭৪ ভূমি প্রশাসন ৭৫ ভূমি সংস্কার ৭৫ ভূমি ব্যবহার ৭৬ ওয়াকফ্ ৭৭ ট্রাস্ট ৭৭ দেবোত্তর সম্পত্তি ৭৭ ভূমি জরিপ ৭৮ ভূমি রেজিস্ট্রেশন ৭৮ আদিবাসীদের ভূমি আইন (বন আইনসহ) ৭৯

৩.১২ কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট সমবায়: বাস্তবে অনুপস্থিত কিন্তু ভাবনা জরুরি ৮১

৩.১৩ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ৮৫

৪ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: সম্ভাবনা, সম্ভাব্য প্রতিফল ও সুপারিশগুচ্ছ ৮৯

৪.১ বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারে কে কি পেতে পারেন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব-অভিঘাত: পদ্ধতিতত্ত্বীয় বিষয়াদিসহ হালনাগাদ কিছু হিসেবপত্তর ৮৯

৪.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: সুপারিশগুচ্ছ ৯৯-১০৬

খাস জমি-জলা সংক্রান্ত সুপারিশ ১০০ শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সম্পর্কিত সুপারিশ ১০২ আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি সংক্রান্ত সুপারিশ ১০৪ ভূমি মামলায় পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ সংক্রান্ত সুপারিশ ১০৪ আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা সংক্রান্ত অন্যান্য সুপারিশ ১০৬

৫ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শেষ কথা ১০৮

সারণি

সারণি ১. বাংলাদেশে ভূমি ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ১৬
২. বাংলাদেশে ভূমিহীনতার চিত্র ১৭
৩. বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১২ ১৮
৪. ভূমি মালিকানার ধরন অনুযায়ী আয়, স্বাস্থ্যসেবা খরচ, শিক্ষা খরচ, খাদ্য-ভোগ খরচ, পুঁজি-সম্পদের মূল্যমান (টাকায়) এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (কিলোক্যালরি) ২২
৫. খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে ঘুষ ২৫
৬. ২০০৮ ও ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী মানুষের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ৩৭
৭. কার্যত ভূমিহীন ও নিজস্ব বাস্তুভিটাহীন সমতল আদিবাসী খানা ৪০
৮. ভাগচাষ-বর্গা প্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সারসত্তা ৫১
৯. বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় জমি চাষ ও চাষকৃত জমি ৫৪
১০. বাংলাদেশে পুনঃবণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের সম্ভাব্য ফলাফলের হিসেবপত্তর, ২০১৫ ৯৫
১১. বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের ফলে বণ্টনকৃত জমি-জলায় সম্ভাব্য সর্বনিম্ন বার্ষিক উৎপাদন (কোনো ধরনের বাড়তি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার না করে এবং বাড়তি বিনিয়োগ না করে) ৯৮

ছক

ছক ১. রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থের ত্রিভূজ: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস ১০
২. দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির পথরেখা ১৪
৩. 'রেন্ট সিকিং' সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে ভূমি-উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম ১৫
৪. শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা-চক্র ৩২
৫. সমতলের আদিবাসীদের দারিদ্র্যের হার ৩৮
৬. সমতলের আদিবাসীদের বঞ্চনা সূচক ৪১
৭. সমতলের আদিবাসীদের খানায় বিদ্যুতায়ন হার ৪২
৮. সমতলের আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন স্কোর ৪২
৯. সমতলের আদিবাসীদের সচেতনায়নতা স্কোর ৪৩
১০. সমতলের আদিবাসীদের জীবন-সমৃদ্ধি (Well-being) স্কোর এর গতিপ্রকৃতি ৪৪
১১. বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস ৫৫
১২. বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ধর্ম-নৃগোষ্ঠিভিত্তিক নারীর অরক্ষিত-মাত্রা বা ভঙ্গুরতা-মাত্রার তুলনামূলক অবস্থান ৬২
১৩. অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচের নিরিখে ভূমি সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বর্গের আইনসমূহের স্কোর ৬৯

তথ্য উৎস ১১১

নির্ঘণ্ট ১২২

কৃতজ্ঞতা

১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামের মানুষকে অতি কাছ থেকে দেখেছি। সহজ-সরল নির্ভেজাল মানুষ। দেশপ্রেমিক মানুষ। এরা বেশির ভাগই গরিব মানুষ। তেমন কিছুই তাদের ছিল না আর তার মধ্যেই যতটুকু ছিল তা পরিত্যাগ করে গ্রামের এসব মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জায়গা দিয়েছিল-খাওয়া দিয়েছিল-আগলে রেখেছিল– এসবের আমি প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষী। এসবই আমার মনে স্থায়ী দাগ কাটে ১৬ বছর বয়সে। যার ক্ষুদ্র প্রতিফল বলা যায় আমার কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ভাবনা। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই ভেতরে ভেতরে একটা ইমোশন কাজ করতে থাকে যে গ্রামের গরিব মানুষেরই যদি জীবন-মান আলোকিত-সমৃদ্ধ না হয় তাহলে মুক্তি-স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ কি হবে? তখন থেকেই ভাবতে থাকি গ্রামের গরিব মানুষ যারা জমি চাষ করে অন্যদের মুখে অন্ন তুলে দেন তারা নিজেরাই যদি জমির মালিকানার স্বত্ব না পান তাহলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি হবে? আস্তে আস্তে বিগত ৪৪ বছর পরে 'ইমোশন' তাড়িত এ ভাবনার সাথে যুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞান চেতনা ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাসসহ তত্ত্ব-তথ্যের সম্মিলন। এখন আর আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশে প্রকৃত উন্নয়ন-প্রগতি সম্ভব যে সম্ভাবনা বাস্তবে রূপদানে অন্যান্য অনেক জরুরি কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (Agrarian-Land-Aquarian Reform)। আর এ বোধও পরিপুষ্ট হয়েছে যে এই সংস্কার স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না– এ এক নিগুঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির বিষয়। আসলে গরিব মানুষকে জমির মালিকানা দেবার কথা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করেনি এমন সরকার এ দেশে এখনও জন্মগ্রহণ করেনি। অথচ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া তার জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে রমনার রেসকোর্স ময়দানে বলেছিলেন "আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনা দেয় গরিব কৃষক, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব শ্রমিক।... ইজ্জত করে কথা বলুন– ওরাই মালিক।... অবশ্য পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ করা হবে।" অবশ্য পাঁচ বছর নয় এ বক্তৃতার পাঁচ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। এসব আমাকে ভাবিত করে এজন্য যে গরিব মানুষকে জমি দেবার কথা হয়তোবা বলা যাবে কিন্তু ঐ প্রক্রিয়া বাস্তবে রূপ দিতে গেলে বাঁধা আসবে– মহাবাঁধা। আবার এটাও সত্য যে ঐ বাধা অতিক্রম না করতে পারলে সমাজ প্রগতি মুখ থুবড়ে পড়বে। বলা যেতে পারে উপরে যা যা উল্লেখ করলাম এটাই কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নে আমার চিন্তার সংক্ষিপ্ত বিবর্তন ইতিহাস।

কৃষি ও কৃষক ভাবনা শাণিত করতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ৪৪ বছরে অনেকেই অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এসব নিয়ে আমি অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ। তবে কয়েকজনের নাম না বললে নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যাবো। এদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, অধ্যাপক ড. এম মইনুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী–প্রথম দুজন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, শেষোক্তজন বর্তমান সভাপতি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান ও অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ; এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলাপমেন্ট-এর নির্বাহি পরিচালক, জনাব শামসুল হুদা; বেসরকারি সংস্থা 'নিজেরা করি'র সমন্বয়ক মিস্ খুশি কবির; বেসরকারি সংস্থা 'সমতা'র নির্বাহি পরিচালক প্রয়াত আব্দুল কাদের। এদের সবাই আমার কৃষি-কৃষক চিন্তায় বিভিন্ন সময়ে চিন্তা-উদ্রেগকারী (intellectually stimulating) দিক নির্দেশনা দিয়েছেন– এজন্য তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তবে আমার চিন্তার কোনো দায়ভার তাদের নেই, দায়ভার সবই একান্ত আমার।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কয়েক দফা টাইপ করেছেন জনাব মোজাম্মেল হক; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার গত ৩০ বছরের লেখালেখি সংগ্রহ করে দিয়েছেন মো. কবিরুজ্জামান এবং প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি টাইপ পরবর্তী প্রাথমিক দেখভাল করেছেন সেলিম রেজা। মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এইচডিআরসি)-এর এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি জনাব আফজালুল বাসারের কাছে যিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বাংলা ভাষা

সংশ্লিষ্ট ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেছেন। চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করে দেবার জন্য আমার প্রাক্তন ছাত্র মাজহার সরকারকে ধন্যবাদ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণের কাজটি করেছেন সব্যসাচী হাজরা আর ছাপার কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন শাহীন আহমেদ– এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ জন্য যে তারা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ-এর সাথে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (১৫ ফাল্গুন ১৪২২) তারিখে যৌথভাবে যে আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন করেছিলেন সেখানে "বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি" শিরোনামে মূল প্রবন্ধ রচনার গুরুদায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। আর সবশেষে দৈনন্দিন পার্থিব সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ আমার তিন কন্যা অবন্তি বারকাত, আনোখি বারকাত ও অরনি বারকাতকে এবং আমার সহধর্মিনী অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতারকে।

৩০ জুন ২০১৬ আবুল বারকাত
ঢাকা

অধ্যায় ১

‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’ নিয়ে মুখ বন্ধ কেন: কিছু ভূমিকা, কিছু প্রাক্‌কথন

এ গ্রন্থে আমি যা বলতে চাই সেসব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হবে তা আমি জানি। তবে অপ্রয়োজনীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসনে শুরুতেই কয়েকটি ধারণাগত বিষয় স্পষ্ট বলে রাখা প্রয়োজন। ধারণাগত এসব বিষয় নিম্নরূপ: প্রথমত, আমার গ্রন্থের শিরোনাম “বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি”, যেখানে “কৃষি, ভূমি, জলা” বলতে বুঝিয়েছি যথাক্রমে “Agrarian” (agricultural নয়), “Land” এবং “Water”; ‘সংস্কার’ বলতে বুঝিয়েছি “Reform”; আর ‘রাজনৈতিক অর্থনীতি’ বলতে বুঝিয়েছি “Political Economy” যা সাধারণ অর্থে আধুনিককালের চাহিদা-সরবরাহের সংকীর্ণ Economics নয়; যা ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতি। দ্বিতীয়ত, ‘ভূমি সংস্কার’-এ যে ‘ভূমির’ কথা উল্লেখ করেছি ঐ ‘ভূমি’ প্রত্যয়টি বলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুঝিয়েছি জমি (কৃষি, অকৃষি), জলা (waterbodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ ‘ভূমি’ শুধুমাত্র কৃষি জমি বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়নি, ‘ভূমি’ অর্থ কৃষি-জমি, অকৃষি-জমি, জলা, এবং জঙ্গল-বন। তৃতীয়ত, এ গ্রন্থে সহজবোধ্যতার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে ‘কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার’ বুঝাতে শুধুমাত্র ‘ভূমি সংস্কার’ “Land Reform” প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছি যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে ‘কৃষি সংস্কার’ (অর্থাৎ agrarian reform) এবং ‘ভূমি সংস্কার’ (land reform) এক কথা নয়। ‘ভূমি সংস্কার’ হলো ‘কৃষি সংস্কারের’ অধীনস্থ অবিচ্ছেদ্য অংগ। চতুর্থত, “কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের” বিষয়টি যেহেতু “শ্রেণি নিরপেক্ষ” (class neutral) বিষয় হিসেবে দেখা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক সেহেতু সম্পূর্ণ বিষয়টিকে শ্রেণিস্বার্থীয় (class interest) বিষয় হিসেবে দেখেছি। এবং পঞ্চমত, জ্ঞানতত্ত্বীয় কারণে ‘কৃষি-ভূমি-জলা’ সংস্কারের বিষয়কে অনেকেই দেখেন খণ্ডিতভাবে (fragmented অর্থে) এবং কামরাভুক্তভাবে (compartmentalized অর্থে) যা জ্ঞানতত্ত্বের (epistemologically অর্থে) নিরিখে ভ্রান্ত। আর সে কারণেই বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থিত সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে (holistic as part of historical process অর্থে) দেখবার চেষ্টা করেছি। আর এসব কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপ-বিষয়াদি চয়নের ক্ষেত্রে (যা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে দেখা যাবে)। তবে একথার অর্থ এই নয় যে সমগ্রতা ও সামূহিকতার নিরিখে যত ধরনের যত রূপের যত বৈচিত্র্যপূর্ণ উপ-উপাদান বা উপ-বিষয়াদি চিহ্নিত করা যায় তার সবকিছুই এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং/অথবা সবকিছু সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ সীমাবদ্ধতা স্বীকারে দোষ নেই যদি বিশ্লেষণে মূল উপ-উপাদান বা উপ-বিষয়াদি বাদ না পড়ে থাকে।

উন্নয়ন শাস্ত্রের একাডেমিক সাহিত্য বিশেষত রাজনৈতিক-অর্থনীতির একাডেমিক সাহিত্যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিয়ে ১৯৭০ দশক অবধি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজ হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ অবধি তেমন কেউই অস্বীকার করেননি যে আমাদের মত দেশসমূহের উন্নয়নে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় তা অত্যাবশ্যকও বটে (অর্থাৎ বলা হতো Agrarian reform is not only a necessary condition for development but also a sufficient condition)। কিন্তু ১৯৭০-এর শেষ আর ১৯৮০-র শুরুর দিকে যখন গোলকায়ন বা বিশ্বায়ন (globalization)-এর উপর অতিমাত্রায় জোর দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলা হতে থাকল “বিশ্বায়নের সুযোগ নিলে এগিয়ে যাবে আর না নিতে পারলে বিপদে পড়বে”, “বিশ্বায়নই সর্বরোগের দাওয়াই-নিয়ামক”; যখন একই সময়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন দেখা দিলো এবং পৃথিবী বৈশ্বিক পুঁজিবাদের আধিপত্যে আবারো একমেরুর দিকে অগ্রসর হলো এবং বলা শুরু হলো যে পৃথিবীতে মতাদর্শের প্রশ্ন এখন থেকে গুরুত্বহীন (end of ideology); যখন থেকে বলা শুরু হলো যে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটাই

সবচেয়ে কার্যকর, ফলপ্রদ, উৎকৃষ্ট এবং টেকসই– "পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত-বাজারকে কাজ করতে দাও", "অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্র ও সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা (regulatory role) কমাও" এবং "শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে এমন জায়গায় নিয়ে যাও যখন রাষ্ট্রেরই আর তেমন কোনো প্রয়োজন থাকবে না" আর ততক্ষণ "রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করা" (state as mere night guard); একই সময়ে যখন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের একচ্ছত্র ফর্দ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ 'ধনী' (!) দেশসমূহের দাতা সংস্থারা আমাদেরকে নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন (neo-liberal development philosophy) মেনে নিতে বাধ্য করতে থাকল যার মর্মার্থ হলো "সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দাও", "সব কিছু উদারীকরণ ও মুক্তকরণ করো", "বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজের বিধি-বিধান মেনে চলো" (যে সব বিধি-বিধান ধনী দেশের স্বার্থে বিনির্মিত)– তখন থেকেই বলা চলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নিয়ে কার্যকর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেলো; বিষয়টি হয়ে দাঁড়ালো একদমই "non issue" অথবা বলা চলে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বহীন ইস্যু। এ অবস্থায় যে সব অর্থনীতিবিদ আর সামাজিক বিজ্ঞানীরা এতদিন উন্নয়নের লক্ষে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কথা বলতেন তারা বলা শুরু করলেন পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এখন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে ভেবে লাভ নেই; তারা বলা শুরু করলেন "Hand not Land", বলা শুরু করলেন "বাণিজ্য করো আরো বাণিজ্য করো - বাণিজ্যে বেসাতি"। আসলে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেৎস্-এর আয় ও সম্পদ বণ্টনের "Trickle down theory" (অর্থাৎ মুখে ঘাম হলে তা শরীরের নিচের দিকে প্রবাহিত হয়) তত্ত্ব যখন ভুল প্রমাণিত হলো এবং বিশ্ব ব্যাংক-আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক আমাদের উন্নয়নের ফর্দ হিসেবে যখন এ তত্ত্ব ১৯৬০ এর দশকেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে গেলো তারপরেও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার মর্মার্থ আমার মতে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রেণি বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার করা আর অন্যদিকে উন্নয়ন-চিন্তা জগতে একে বলা চলে তেমনই এক ধরনের কম্প্রোমাইজ যার নিহিতার্থ এক কথায় "মহাবুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতিসম" (great intellectual fraud)।[১]

আসলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নটি প্রচলিত রাষ্ট্র, সরকার এবং তাদের বশংবদ সরকারি-আধাসরকারি অর্থনীতিবিদ এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক বিজ্ঞানীদের পছন্দের বিষয় নয়। এ বিষয়ে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান সাধনা এবং তা প্রকাশে অনেকেই ভয় পায়। অনেকে এমনও বলেন যে, "বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে হাত দেবার অর্থ সচেতনভাবে আগুনে হাত দেয়া"। আসলে এ ভীতির গভীরে কি এবং কোন বিষয় কাজ করছে, গভীরে কোন স্বার্থ– কার স্বার্থ? বিষয়টি আমি আমার সদ্য প্রকাশিত "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে (প্রকাশকাল ২৬ মার্চ ২০১৬) বিশ্লেষণ করেছি। যে বিশ্লেষণই সম্ভবত বলে দেয় যে ওরা কেন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কথা বলে না এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অদূর ভবিষ্যতেও বলবে না। বিষয়টি এরকম: আমরা ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। আর সে লক্ষ্যে চার স্তম্ভ বিশিষ্ট ১৯৭২ এর সংবিধানে অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের কথা বলেছিলাম যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অন্যতম করণীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে কৃষি-বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল [দেখুন ১৯৭২-এর সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৮(১), ১০, ১৬]। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্রান্তে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো পথে পরিচালিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুর্বৃত্তায়িত হয় অর্থনীতি, যা রাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের কার্যকর চাহিদা (effective demand for criminalization of politics) বৃদ্ধি করে। এসবের ফলে তথাকথিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামোর অধীন সত্তা হিসেবে আমাদের দেশে বিকৃত মুক্তবাজার অর্থনীতির মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে

[১] সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনবিধি বিশ্লেষণে যারা "বেল কার্ভ" পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'এমআইটি' বিশ্ববিদ্যালয়ের "অনিশ্চয়তা বিভাগ"-এর অধ্যাপক নিকোলাস তালেব বলেছেন যে ঐ পদ্ধতি ব্যবহারে তারা বড় ধরনের বিচ্যুতিসমূহ (large deviations) অবজ্ঞা করেন ফলে তাদের বিশ্লেষণ ফল যা হয় তা হলো "বাস্তবতা বিবর্জিত" মূল্যহীন (close to nothing)। এসব সামাজিক বিজ্ঞানিদের ডাকনাম হতে পারে "GIF", Great Intellectual Fraud (দেখুন Taleb Nicholas, 2010, The Black Swan. পৃ. XX 'IX).

ওঠে এমন এক ধরনের কাঠামো যে কাঠামো উৎপাদনশীল পুঁজি বিকাশে সহায়ক নয়। সৃষ্টি হয় অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী, দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, মহাদুর্নীতিবাজ, মানুষের উপর অত্যাচারকারী, ফটকাবাজ গোষ্ঠী– এক কথায় যাদের নাম **"রেন্ট-সিকার"** (rent-seeker, যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না অন্যের সম্পদ বেদখল-জোরদখল করেন)। আর সমগ্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটিই এখন এমন এক সম-স্বার্থের ত্রিভুজাকৃতির রূপ নিয়েছে যেখানে ত্রিভুজের উপরের বাহুতে আছে ঐ রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী আর নিচের দুই বাহুর একদিকে আছে রাষ্ট্র ও সরকার আর অন্য (তৃতীয়) বাহুতে আছে রাজনীতি। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতি এখন 'রেন্ট-সিকার' গোষ্ঠীর অনুগত, অধীন, দাস সত্তা বলা চলে (দেখুন ছক ১)।

ছক ১: রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থের ত্রিভুজ:
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির উৎস

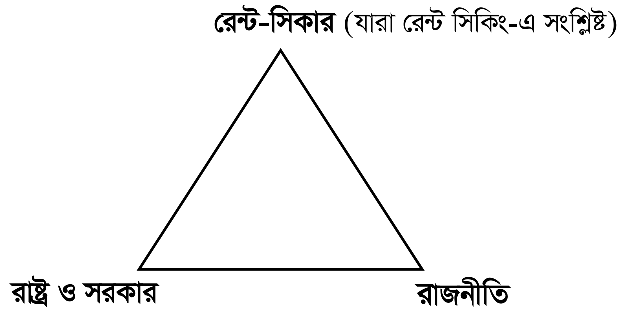

আমাদের দেশে 'রেন্ট সিকিং' পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় বিত্তের হস্তান্তর মাত্র। অর্থাৎ কাঠামোগত বিষয়টি এরকম : উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থসম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কি ভাবে কি হয়ে গেলো! এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে "For the 1%, Of the 1%, By the 1%"। এ অবস্থায় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে ক্ষেত্রে 'রেন্ট সিকিং' কাঠামো উদ্ভূত সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে যাবে অথবা তা মহাবিপদে পড়বে; 'রেন্ট-সিকার'-দের অধীনস্ত রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি তা হতে দিতে পারে না। আর তাদেরই অধীনস্ত অর্থনীতিসহ সামাজিক বিজ্ঞানের পণ্ডিতরাও (বিশেষত যারা আনুষ্ঠানিক-আধা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি অর্থনীতিবিদ অথবা নব্য-উদারবাদী অথবা বিভিন্ন গোছের প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনীতিবিদ ও সামাজিক বিজ্ঞানী) তা হতে দেবে না। যে কারণে ঐ সব পণ্ডিতেরা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাবেন– এটাই যৌক্তিক।

কৃষি-ভূমি-জলা-সংস্কার এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি একসময় ১৯৭০-এর মধ্যকাল নাগাদ যেমন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হতো আবার অন্য সময়ে (১৯৭০-এর মধ্যকাল পরবর্তী) এ প্রয়োজন বেমালুম অস্বীকার করা হতে থাকল। এ বিষয়ে অর্থনীতি-রাজনীতিশাস্ত্রসহ সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার পণ্ডিতদের গলার স্বর এখন এতই ক্ষীণ যা গলার-স্বর-মাপনির আনুবিক্ষণিক যন্ত্রেও তা ধরা যায় না। এ শুধু পাণ্ডিত্যহীনতাই নয়– এটা জ্ঞানজগতে এক মহাআপোষকামিতার মহাবিপদতূল্য; এটা অর্থনীতির পণ্ডিতদের জনগণবিরোধী অবস্থান নির্দেশ করে (যেখানে সংবিধানের মূলকথা "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক", অনুচ্ছেদ ৭ক)। এ অবস্থান কতদূর জনবিরোধী তা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্তর্নিহিত বাস্তব বিষয়াদি বিবেচনা করলে খালি চোখেই ধরা পড়ে। বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বৃহৎ বর্গের বিষয়াদি যা মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহজেই দৃশ্যমান এবং যা যেকোনো বিতর্কের ঊর্ধ্বে বৃহৎ-বর্গীয় বিষয়াদি সেসব নিম্নরূপ (যা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে):

১. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের মৌলিক যুক্তিসমূহ;

২. খাস জমি-জলা– দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যা কিন্তু লুট নিরন্তর;

৩. চরের জমির মালিক কে ? চরের মানুষের প্রান্তিকতা;

৪. ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ভূ-সম্পত্তিকেন্দ্রিক প্রান্তিকতা (শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন);

৫. আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা;

৬. মৎস্যজীবী মানুষের প্রান্তিকতা;

৭. লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ– দারিদ্র্য ও বঞ্চনার নবমাত্রা;

৮. ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগদখলস্বত্বের পরিবর্তন-রূপান্তর ও বিপন্নতা;

৯. জমি সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা (উত্তরাধিকার-বঞ্চনা);

১০. ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়;

১১. ভূমি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা: দুর্বৃত্তদের স্বার্থরক্ষার যন্ত্র;

১২. ভূমি আইন : দরিদ্র বিরোধী ও 'রেন্ট-সিকার' সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম;

১৩. ভূমি-জলা সমবায় ('গণমুখী সমবায়' প্রসঙ্গ); এবং

১৪. কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

এতক্ষণ যা বললাম তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে যুক্তিক্রমানুযায়ী যে সব বৃহৎবর্গের পরস্পর সম্পর্কিত প্রশ্নাদির উত্তর অনুসন্ধান সঙ্গত তা হলো নিম্নরূপ:

(ক) বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই কেননা?

(খ) বিকল্প যদি নাই থেকে থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ সংস্কারের মূল বিষয়াদি কি হবে, কেন, এবং সে সবের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ কি?

(গ) বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর তেমন পরিবর্তন সাধন না করে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে কতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব, কেন এবং কিভাবে?

(ঘ) সামগ্রিক-পূর্ণাঙ্গ-সামূহিক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে সম্ভাব্য করণীয় কি হতে পারে?

উপরের যুক্তিক্রম মেনে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণাদি এবং তদদ্ভূত উপসংহারসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো।

অধ্যায় ২

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারঃ কি এবং কেন?

২.১ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারঃ রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে মর্মার্থ কি?

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি সমগ্রক বিষয়; দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। *"প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে ভূমি ও কৃষি সংস্কারের প্রশ্নটা ব্যাপক অর্থে গ্রামীণ আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্ন" (আনিসুর রহমান ২০০৮, পৃ. ৯)। কৃষি সংস্কার* (agrarian reform)-এর প্রকৃত অর্থ হলো কৃষিতে এমন ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) বিকাশ ত্বরান্বয়নে কৃষির উৎপাদন সম্পর্ক (production relations, যার নির্ধারক জমি ও জলার মালিকানাসহ অভিগম্যতা কাঠামোর পরিবর্তন) পরিবর্তিত হয়। ফলে কৃষিতে শ্রেণি-সম্পর্ক (class relations) কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। আর ভূমি সংস্কার (land reform অর্থে) হলো ঐ কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষঙ্গ। *ভূমি সংস্কারকে* বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্থের কৃষি সংস্কার। ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সরকারি মালিকানার খাস জলা-জমির বণ্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ইত্যাদি।

কৃষি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হলো উল্লিখিত ভূমি সংস্কারসহ ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থার সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষিজীবী-জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগদখল স্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, ভূমি আইন, বাজার, মজুরি, পরিবেশ-বান্ধব কৃষি (টেকসই কৃষি), জমি-জলায় নারীর অধিকার উত্তরাধিকারসহ কৃষিতে নারী-শ্রমের স্বীকৃতি, ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি, প্রযুক্তি এবং ইনপুট খাতসমূহে পরিবর্তন বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার– রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ বিষয়টি আসলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তি (sustained inclusion of the excluded) কেন্দ্রিক।

২.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কেন? উন্নয়ন ও জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের পথ

"উন্নয়ন" (development) আসলে কি– এ বিতর্কে যেতে চাই না। তবে এ-কথা উচ্চকণ্ঠে বলা দরকার যে 'উন্নয়ন' বলতে প্রায়শই আমাদের যা বুঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি (জিডিপি) এবং/অথবা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি– এ ধারণা বহুলাংশে ভ্রান্ত। কারণ বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শনানুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার – এসবই গুরুত্বহীন হতে পারে অথবা বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে বৈষম্য বাড়াতে পারে যদি বণ্টন ন্যায্যতা (distributive justice) নিশ্চিত না করা যায়। আর রেন্ট-সিকারদের অধীনস্থ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে তা সম্ভব কি? আদৌ সম্ভব নয়।

উপরে যা বললাম এসবের পাশাপাশি অন্যবিধ কারণও বিদ্যমান। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধান বলছে "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক" (অনুচ্ছেদ ৭ক); সংবিধান আরো বলছে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমেই রাষ্ট্র জনগণের জন্য "অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা"-র ব্যবস্থা করবে (অনুচ্ছেদ ১৫ক)। সুতরাং প্রথম মৌলিক কথা হলো "জনগণ" – শ্রেণি-পেশা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে– প্রজাতন্ত্রের মালিক; আর দ্বিতীয় মৌলিক কথা হলো জনগণের যে অংশ "অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা" থেকে যতটুকু বঞ্চিত সে-অংশ ততটুকু দরিদ্র অথবা ততটুকু 'উন্নয়ন' বঞ্চিত। সেই সাথে বিশেষ কোনো শ্রেণি, জনগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী অথবা ধর্মগোষ্ঠী অথবা নৃগোষ্ঠী যদি বংশ-পরম্পরা সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন চালাতে বাধ্য হন সেক্ষেত্রে এ-কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে ঐ শ্রেণি-গোষ্ঠীসমূহের জীবন পরিচালন সংবিধানের বিধি মোতাবেক চলছে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে উন্নয়নের সাংবিধানিক মর্মার্থ যাতে ঐ সকল গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রতিপালিত হয় তা নিশ্চিত করা। আর বিষয়টি যদি এমন হয় যে বঞ্চনার প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং/অথবা বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণ প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করা। আর ঐ বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা প্রক্রিয়া যদি রাষ্ট্র-সৃষ্ট, রাষ্ট্র-পরিতোষিত হয়– তাহলে কি ভাবব? ভাবব বিষয়টি মারাত্মক এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ। ঐতিহাসিক এ বিপর্যয় থেকে মুক্তি সম্ভব। কারণ আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারই এ বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে পারে।

বিগত চার দশকে (১৯৭৫-২০১৫) 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়ায় আর যাই ঘটুক ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রকৃত অর্থে তেমন কোনো কাঙ্ক্ষিত মাত্রার জীবন-সমৃদ্ধি (well-being অর্থে) ঘটেনি। কারণ প্রকৃত 'উন্নয়ন'-এর মর্মার্থ হলো – উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা: (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (২) অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি, (৩) সামাজিক সুবিধাদি (প্রধানত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য), (৪) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, এবং (৫) সুরক্ষার নিশ্চয়তা। এসব স্বাধীনতার কোনোটিই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করার কোনো কার্যকর প্রক্রিয়া অন্তত গত চার দশকের 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়' দৃশ্যমান হয় না। উন্নয়ন বলতে যদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে "বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ" (inclusion of the excluded) বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে দরিদ্র-প্রান্তিক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য এ-প্রক্রিয়া আসলে কখনো শুরুই হয়নি। 'উন্নয়ন' বলতে যদি সাংবিধানিক-অধিকার নিশ্চিত করা বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি ন্যায়-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি শোষণ-মুক্ত ও শ্রেণি-বৈষম্য হ্রাসসহ জাতিগত উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়ার কার্যকর রোধ বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি ব্যাপক দরিদ্র-বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি এমন সম্মান বুঝায় যে সম্মান দেখানোর প্রতিফল হবে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য দূর– সেক্ষেত্রে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এ সব আম জনতাকে এখনো পর্যন্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কার্যকর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এবং যতক্ষণ 'রেন্ট-সিকার' সিস্টেম বহাল থাকবে ততক্ষণ যৌক্তিকভাবেই বলা সঙ্গত হবে যে সেটা সচেতনভাবেই করা হয়েছে।

বাংলাদেশ– সমৃদ্ধ এক দেশ, তবে এখানে জন-সমৃদ্ধি ঘটেনি। বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ কারণ এখানে বাংলা বর্ণমালার '৪ জ' আছে:

১ম 'জ' = জমি,

২য় 'জ' = জলা,

৩য় 'জ' = জঙ্গল (বন),

৪থ 'জ' = জন-মানুষ।

কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের দেশে জমি-জলা-জঙ্গল-এর সাথে জন-মানুষ-এর সম্পর্কের সমীকরণে একটা বড় মাপের সমস্যা আছে। সমস্যাটি হলো– যে জন-মানুষ জমি চাষ করেন (কৃষক) সম্পদ সৃষ্টি করেন (ফসল উৎপাদন করেন) তিনি ঐ জমির মালিক নন; যে জন-মানুষ জলায় শ্রম দিয়ে (জেলে) সম্পদ সৃষ্টি করেন (মাছ উৎপাদন করেন) তিনি ঐ জলার মালিক নন; আর যে জন-মানুষ জঙ্গলে-বনে শ্রম দিয়ে (প্রধানত আদিবাসী

মানুষ) সম্পদ সৃষ্টি করেন (বন সৃষ্টি ও সুরক্ষা করেন) তিনি ঐ বনের মালিক নন– **এসবই বাংলাদেশের অনুন্নয়নের গোড়ার কথা**।

অনুন্নয়নের এ-আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নের মানবিকীকরণে অতি যৌক্তিক কারণেই কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের পক্ষে অনেক মৌলিক যুক্তি বিদ্যমান– ন্যায় বিচারিক যুক্তি, নৈতিক যুক্তি, বৈষম্যহ্রাসকারী সাংবিধানিক যুক্তি, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনে শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি। তবে শেষ বিচারে কর্মকাণ্ডটি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কমিটমেন্ট সংশ্লিষ্ট আর একই সাথে 'স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের' বিষয় ("home grown development philosophy" অর্থে)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রকৃত কৃষক, প্রকৃত জেলে, প্রকৃত বনবাসী মানুষ– এরা সবাই প্রকৃত অর্থেই দরিদ্র, বঞ্চিত, বৈষম্য-অসমতার শিকার। আর এ দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা দূর করে তাদের 'উন্নয়ন' ও জীবনসমৃদ্ধির (well-being) লক্ষ্যে এখন অনেকেই বলতে চান যে জমি-জলা-জঙ্গলে তাঁদের মালিকানার (ownership) চেয়ে অভিগম্যতার (access) বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ হলো 'hard issue' এড়িয়ে 'soft issue'-তে অধিক গুরুত্ব দেয়া। আর আসলে এসব হলো প্রকৃত সমাধানের পথ এড়িয়ে যাবার শ্রেণিস্বার্থীয় কৌশলমাত্র। আসলে যে কথা একটু আগেই বলেছি সেটাই সঠিক – জমি-জলা-জঙ্গলে দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের মালিকানাই পারে তাদের জন্য প্রকৃত অর্থের উন্নয়নসহ জীবন সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে। কারণ জীবন সমৃদ্ধির নির্ণায়ক সম্পদে অভিগম্যতা নয় (যদিও অভিগম্যতা গুরুত্বহীন নয়), সম্পদে মালিকানা। যে মালিকানায় হতে পারে তাদের জীবন কেন্দ্র এবং জীবনসমৃদ্ধির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন শক্তি (দেখুন ছক ২)।

ছক ২: দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির পথরেখা

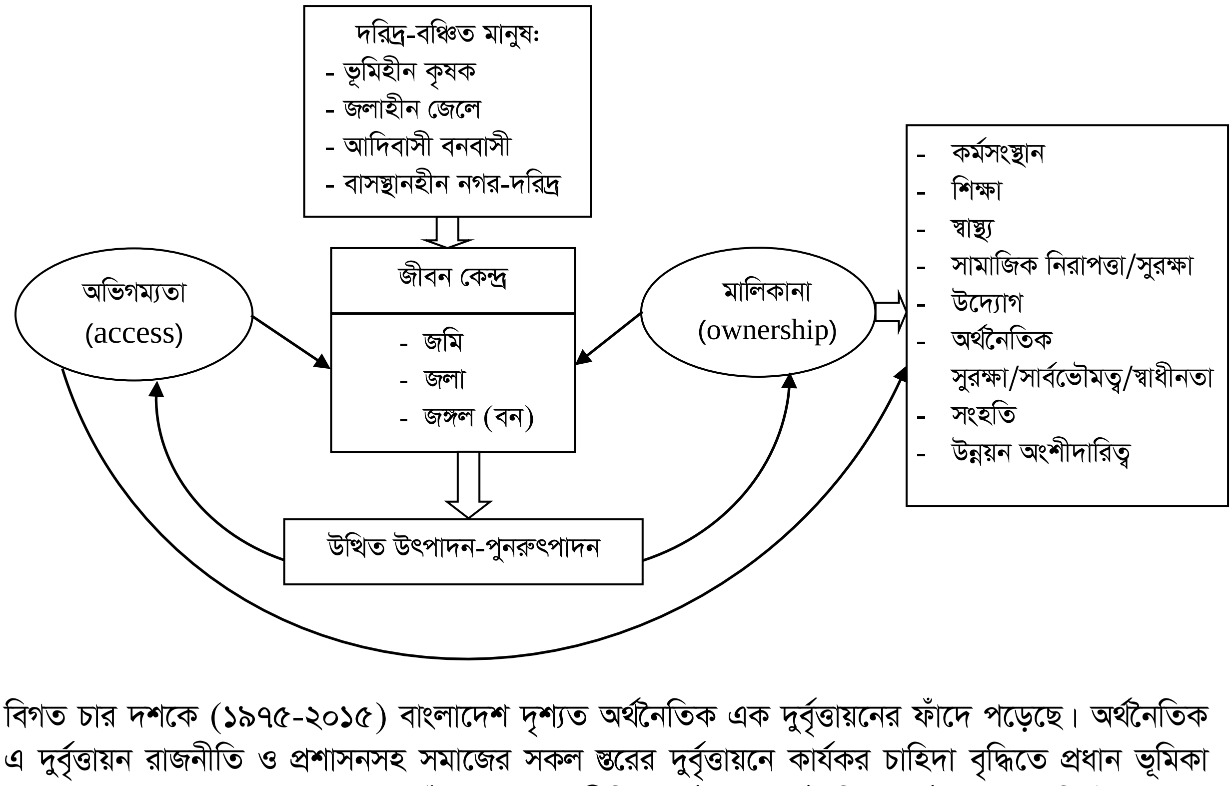

বিগত চার দশকে (১৯৭৫-২০১৫) বাংলাদেশ দৃশ্যত অর্থনৈতিক এক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে পড়েছে। অর্থনৈতিক এ দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও প্রশাসনসহ সমাজের সকল স্তরের দুর্বৃত্তায়নে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আবার এ এমন এক ফাঁদ যখন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে পরিপুষ্ট করছে। আর আগেই বলেছি এ দুবর্ত্তায়ন এখন পাকাপোক্ত হয়ে 'রেন্ট-সিকার' সিস্টেম গড়ে তুলেছে। বিদ্যমান কৃষি কাঠামো সামগ্রিক এ 'রেন্ট সিকিং' দুর্বৃত্তায়নের বাইরের কোনো বিষয় নয়। এ দুর্বৃত্তায়নের ফলে আমরা এক প্রকার প্রান্তিক-বঞ্চিত মানুষের নিরন্তরভাবে বহির্ভুক্তকরণ (exclusion of the excluded) প্রক্রিয়া লাভ করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা বঞ্চিতদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়; এ এমন এক পরিস্থিতি

যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তির (বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করার নিশ্চয়তা) সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাৎ করে দেয়। এখন এক "লুণ্ঠন সংস্কৃতি" আমাদের পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, আর অন্যদিকে দুর্বৃত্তায়নের অনুকূল সূচকগুলো ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ সীমিত হচ্ছে। মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশে এ এক প্রতিবন্ধক। চার দশকের উন্নয়নে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরও জোরালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ (ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন, এরাই চালকের আসনে থাকে); অপর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৫ কোটি ৯০ লাখ মানুষ। এরা প্রান্তিক, বহিঃস্থ, বঞ্চিত ও নিঃস্ব মানুষ। অথচ আমাদের সংবিধান বলছে "*প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ*" (অনুচ্ছেদ ৭.১)। আমাদের দেশের চলমান দারিদ্র্য, আর ভূমিহীন, নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি-জলার মালিকানা এবং অভিগম্যতা সংশ্লিষ্ট বাঁধাসমূহ তথা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার চলমান আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। কাঠামোটিই এমন যা কৃষি-ভূমি-জলা উত্থিত দারিদ্র-বঞ্চনা পুনরুৎপাদন করে (নিচের ছক ৩ দেখুন)।

ছক ৩: 'রেন্ট সিকিং' সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে
ভূমি-উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম

ক্ষেত্র

- খাস জমি ও জলা
- চরের জমি-জলা
- অর্পিত জমি-সম্পত্তি (ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়)
- আদিবাসী মানুষের জমি-বন সম্পত্তি
- জলা সম্পদে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকারহীনতা
- চিংড়ি চাষজনিত প্রান্তিকতা
- জমি-সম্পত্তিতে নারীদের অধিকারহীনতা
- ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ-মামলা
- ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ জমিতে বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্ব
- ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-দুর্নীতি
- দরিদ্র-বিরোধী আইন-কানুন ও আইনি প্রক্রিয়ায় মানুষের আস্থাহীনতা
- নারীবিরোধী ভূ-সম্পত্তির মালিকানা আইন/উত্তরাধিকার আইন

পরিণাম/অভিঘাত

- দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন: নিঃস্বায়ন থেকে ভিক্ষুকায়ন
- ভূমি-জল-বন দস্যুতা বৃদ্ধি
- ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা
- ক্রমবর্ধমান বৈষম্য
- ক্রমবর্ধমান বহিঃস্থকরণ-প্রান্তিকতা: গ্রাম থেকে শহরে "গলাধাক্কা অভিবাসন"
- শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি-প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি: নগরায়ন নয় বস্তিয়ায়ন
- জল-সম্পদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস
- নারীর ক্ষমতায়নে বাধা
- ভূমিকেন্দ্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি
- ভূমিকেন্দ্রিক মামলা-মোকদ্দমায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়
- কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস
- মঙ্গা-ক্ষুধা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ
- সামাজিক পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা

কৃষি-ভূমি-জলা উত্থিত এ দারিদ্র্য-বঞ্চনা নিরসনসহ দরিদ্র মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সংস্কার অপরিহার্য। এ বিষয়ে সংস্কার বিরোধীদের যুক্তি প্রধানত দ্বিবিধ; তাদের মতে (১) বণ্টনযোগ্য পরিমাণ ভূমি-জলা বাংলাদেশে নেই, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমি-মানুষ এবং জলা-মানুষ অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে, এবং (২) সংস্কার– শ্রেণিসংঘর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করবে। সংস্কার বিরোধীদের কেউ কেউ সংস্কারের অভিঘাত হিসেবে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার কথাও বলে ফেলেন; কেউ কেউ আবার "ভূমির কেন্দ্রিকতা" (centrality of land) অস্বীকার করে উৎপাদনের উপায়ের ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মালিকানা-অভিগম্যতার (ownership-access) পরিবর্তে উন্নয়নে ইনপুট সরবরাহকে (যেমন ক্ষুদ্র ঋণ) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিরোধী এসব যুক্তির ভিত্তি দুর্বল। প্রথমত সাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি যদি বৈষম্য সৃষ্টির ভিত্তি উচ্ছেদে সহায়ক হয় সেক্ষেত্রে এ অস্থিরতা অকাম্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত যুক্তিগতভাবেই কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ন্যায় বিচারিক এবং সাংবিধানিক (অনুচ্ছেদ ১৬ "বৈষম্যদূরীকরণে কৃষি বিপ্লব", অনুচ্ছেদ ১৯(১)(২) "সুযোগের সমতা", "সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য

নিরসনে...সম্পদের সুষম বণ্টন" ইত্যাদি); সেই সাথে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির যুক্তি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি, শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি এবং দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি।

২.৩ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কেনো? পশ্চাৎমুখী আর্থ-সামাজিক প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ

বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর যার মধ্যে ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। এক কোটি ৬০ লক্ষ একর জমি (৪৩%) ব্যক্তি মালিকানাধীন; বছরে প্রায় ২৪ লক্ষ একর জমি মামলাধীন এবং ভূমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এখন বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ (বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। প্রায় ১ কোটি একর জমি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়। চিহ্নিত খাস জমি (কৃষি ও অকৃষিসহ চরের জমি) ও খাস জলার মোট পরিমাণ ৫০ লক্ষ একর (ভূমি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না)। সেই সাথে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে সরকারের জিম্মায় আছে ২৬ লক্ষ একর; আর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১০ লক্ষ একর (সারণি ১)।

সারণি ১: বাংলাদেশে ভূমি ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

ভূমির বিবরণ	পরিমাণ
মোট জমি (লক্ষ একর)	৩৭৪
জনসংখ্যা (২০১১-এর আদমশুমারীর ভিত্তিতে ২০১৫; কোটি)	১৬
খানা (২০১১-এর আদমশুমারীর ভিত্তিতে ২০১৫; কোটি)	৩.৪
কৃষির অধীন জমি (লক্ষ একর)	২২২
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন (গ্রাম-শহরে, বিবাদপূর্ণ, অশনাক্ত খাস, বনাঞ্চল) (লক্ষ একর)	২১০
সরকারি ব্যবহারে জমি (রেল, বন্দর, সড়ক, অফিস, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবাখাত) (লক্ষ একর)	১০০
খাস জমি ও জলা (লক্ষ একর)	৫০
– কৃষি খাস জমি	১২
– অকৃষি খাস জমি	২৬
– খাস জলা (উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ)	১২
শত্রু/অর্পিত জমি (সরকারি জিম্মাদারিত্বে; ব্যক্তিগতভাবে বেদখলকৃত) (লক্ষ একর)	২৬
পরিত্যক্ত (সরকারি জিম্মাদারিত্বে; ব্যক্তিগতভাবে বেদখলকৃত) (লক্ষ একর)	১০

উৎস: বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক প্রণীত

দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি-জলা বণ্টন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকার খর্ব করা, ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ, জলাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ, ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়, জমি-জলায় বিভিন্ন ধরনের অন্যায্য ভোগদখল স্বত্ব, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক দুর্নীতি, ভূমি আইনের গণবিরোধী রূপ– এসবই এদেশে কৃষি সংস্কারের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়। গত চার দশকে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ; ঘটেছে ভূমি মালিকানার পুঞ্জিভবন। আবির্ভূত হয়েছে এক ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু গোষ্ঠী। আর এসব দস্যু "রেন্ট-সিকার"রাই আবার দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক কাঠামোতে প্রবল প্রতিপত্তিশালীই শুধু নয় তারা এখন ঐ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক।

এসবে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে তথাকথিত নগরায়ন (urbanization) যা আসলে বস্তিয়ায়ন (slumization) অথবা নগর-জীবনের গ্রামায়ন (বারকাত ও আখতার ২০০১)। 'urbanization' অর্থে নগরায়ন হলো আনুপাতিক হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু পাশাপাশি থাকবে শিল্পায়ন (industrialization)। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনা তা নয়। আমাদের তথাকথিত নগরায়ন হলো গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও কর্মহীনতার ফল। এটা গ্রাম থেকে এক ধরনের গলাধাক্কা অভিবাসন। নগরবাসীর প্রজনন হার বৃদ্ধির ফলে

নগরের জনসংখ্যা বাড়েনি, তা বেড়েছে গ্রাম থেকে ব্যাপক দরিদ্র-বঞ্চিত-নিঃস্ব মানুষের বাধ্য হয়ে শহরমুখী হবার ফলে (অর্থাৎ এ হলো rural-to-urban forced migration) এবং দরিদ্র মানুষ নগরে এসে যোগ দিচ্ছেন শিল্পে নয় অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে (informal sector) যেখানে মজুরির বিধি নেই, নেই কোনো শিল্প আইন। এসবের সাথে "রেন্ট সিকিং দুর্বৃত্ত" সিস্টেমের কারণে বেড়েছে শহরে জমির দাম– এমন বাড়া বেড়েছে যার কারণটি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অপারগ। ক্রমবর্ধমান কালো টাকার কারণেই শহরে জমির দাম-অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। ঢাকা শহরেই এখন এক কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ (যা দেশের মোট নগর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ)। যে কারণেই ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে জমি-জলা দস্যুতা এমনই প্রকট রূপ নিয়েছে যে ভূমি মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও বলেছে ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে ভূমি-দস্যুরা ১০,০০০ একর জমি জবরদখল করে আছে (যা দেশের প্রচলিত আইন, "Water Preservation Act"- বিরুদ্ধ)।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সাথে নগরায়নের সম্পর্ক সম্পর্কে অবশ্যই এ কথা গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে যে দ্রুত শহরায়নের ফলে কৃষিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীর (absentee landlord) মালিকানায় জমি-জলার পরিমাণ গত দু-তিন দশকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সরাসরি ফল হলো ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগদখলস্বত্ত্বের আওতায় জমি-জলার পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি-জলার প্রকৃত উৎপাদিকা হ্রাস, কৃষি দিন মজুরের তুলনীয় অবস্থার অবনতি ইত্যাদি।

বিগত ৫০ বছরে এ দেশে যেমন ভূমিহীনতা বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ভূমির পুঞ্জিভবন। ১৯৬০ সালে এদেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিল মোট খানার ১৯ শতাংশ যা ২০০৮ সালে মোট খানার প্রায় ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে ১ শতাংশ ধনী ভূ-স্বামীর মালিকানায় ছিল মোট কৃষি জমির ৪.৭ শতাংশ যা ২০০৮ সালে হয়েছে ১২ শতাংশ (অবশ্য এসবই সরকারি হিসেব)। আমাদের দেশে এখন কার্যত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশ (সারণি ২) অথচ তাদের হাতে আছে মোট জমির মাত্র ৪.২ শতাংশ, আর অন্যদিকে ভূমি মালিকানার মানদণ্ডে উপরতলায় অর্থাৎ ভূমি-ধনী হচ্ছে দেশের মোট পরিবারের ৬.২ শতাংশ পরিবার যাদের মালিকানায় আছে দেশের কমপক্ষে ৪০-৪৫ শতাংশ জমি।

সারণি ২: বাংলাদেশে ভূমিহীনতার* চিত্র, ২০০৮

বাসস্থানের ধরন অনুযায়ী	বাংলাদেশের মোট খানা		ভূমিহীন (%)	
	সংখ্যা (০০০)	(%)	বাংলাদেশের মোট খানার মধ্যে	বাসস্থান অনুযায়ী খানা: গ্রামীণ এবং শহরের মধ্যে
গ্রামীণ	২৫,৩৫১	৮৮.৩৫	৪৮.৩৭	৫৪.৭৫
শহুরে	৩,৩৪৪	১১.৬৫	১০.১৮	৮৭.৩৬
মোট	২৮,৬৯৫	১০০.০০		
মোট শতাংশ			৫৮.৫৫	৫৮.৫৫

উৎস: কৃষি শুমারী ২০০৮ (জাতীয় সিরিজ: ভলিউম ১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)-এর ভিত্তিতে লেখকের হিসেব।

* বসতভিটা আছে বা নাই এমন খানা, যার নিজস্ব জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০ ডেসিমেল, সেটিকে ভূমিহীন খানা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর (class-structure) বিবর্তন নিয়ে এ দেশে খুব একটা গবেষণা হয়নি। তবে সম্প্রতি সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে বিগত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) একদিকে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের অধোগতি ঘটেছে, আর অন্যদিকে ভূমিসহ অন্যান্য বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু ধনীর হাতে (দেখুন সারণি ৩)। যেহেতু আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই এমন যা এদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনিবার্যতার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করে সেহেতু এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণ জরুরি মনে করি।

আগেই বলেছি "রেন্ট সিকিং" সিস্টেমের ফাঁদে পড়েছে বাংলাদেশ। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরিব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা গত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণিকাঠামো বদলে দিয়েছে। আর্থ সামাজিক শ্রেণিকাঠামো যেভাবে বদলেছে

তা আদৌ মানব বিকাশ সহায়ক নয়। বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটি কয়েক ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টতর করে। নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো পরিবর্তন প্রবণতার সে চিত্রটিই তুলে ধরে যা দিয়ে শুধু ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনার ক্রমবৃদ্ধিই প্রতিফলিত হয় না যা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি-ভিত্তি শক্তিশালি করে, পশ্চাৎমুখী এ প্রবণতা এমনকি ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণেও সহায়ক (সারণি ৩)[২]। আমার বিশ্লেষণে বিগত তিন দশকে (১৯৮৪-২০১২) বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতার স্বরূপসমূহ নিম্নরূপ:

১. আমার হিসেবে বাংলাদেশে এখন ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (৬৬%), ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির (৩১.৩%) এবং অবশিষ্ট ৪৪ লক্ষ মানুষ (২.৭%) ধনী। গত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ (১৯৮৪ সালে ৬ কোটি থেকে ২০১২ সালে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ)। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নের ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। যা বাংলাদেশে প্রগতিহীন বা প্রগতিবিমুখ সবকিছুকে উৎসাহিত করার ভিত্তি মজবুত করেছে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১২

গ্রাম/শহর	দরিদ্র		মধ্যবিত্ত								ধনী		সর্বমোট	
			নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		মোট					
	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২	১৯৮৪	২০১২
গ্রাম														
(ভূমি মালিকানাভিত্তিক)														
% গ্রামীণ জনসংখ্যা	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৮৬.৩	১৪	১৯.৫	১০	৯.৭	৪	৩.৬	২৮	৩২.৮	৩	২.৪৩	৮৪	১২১.৬
শহর														
(সম্পদ মূল্যভিত্তিক)														
% শহরের জনসংখ্যা	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৫	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৫	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৯.২	৫	৭.৭	৩	৫.৮	০.৫	৩.৮	৮.৫	১৭.৩	০.৩	১.৯২	১৬	৩৮.৪
মোট (গ্রাম+শহর)														
% মোট জনসংখ্যা	৬০	৬৬	১৯	১৬.৯	১৩	৯.৭	৪.৫	৪.৭	৩৬.৫	৩১.৩	৩.৩	২.৭	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬০	১০৫.৫	১৯	২৭.১	১৩	১৫.৬	৪.৫	৭.৫	৩৬.৫	৫০.১	৩.৩	৪.৪	১০০	১৬০

উৎস: Barkat, Abul (2015c), A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh, পৃ. ১৩।

পদ্ধতিগত ধারণা: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য সরকারিভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এক্ষেত্রে লেখক দেশের সমাজকাঠামোর গতি পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির জনসংখ্যা পরিমাণ নির্ধারণে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মানদণ্ড হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বসত ভিটার মালিকানা ও শহরের মানুষের সম্পদের মূল্যমানকে ধরা হয়েছে। শ্রেণিকরণের এই পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে: গ্রামীণ এলাকায় বিত্তহীন অথবা কম সম্পদশালী শ্রেণি– যাদের জমির পরিমাণ ১০০ শতক পর্যন্ত এবং শহরের যেসব মানুষের মোট সম্পদের দাম ৫ লক্ষ টাকার কম, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে তাদের ধরা হয়েছে যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জমির মালিকানা ১০১ থেকে ২৪৯ শতক এবং শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের দাম ৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; গ্রামের মধ্য-মধ্যবিত্ত বিবেচিত হয়েছে ২৫০-৪৯৯ শতক জমির মালিকরা এবং শহরে ধরা হয়েছে যাদের সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ২৯ লক্ষ টাকা; গ্রামের যেসব জনগোষ্ঠির সম্পদের পরিমাণ জমির মালিকানা ৫০০ থেকে ৭৪৯ শতক তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শহরের ক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত ধরা হয়েছে তাদের যাদের সম্পদের মূল্য ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ধনী (উচ্চবিত্ত) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৫০ শতক বা তার বেশি জমির মালিকরা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব সম্পদশালীদের।

[২] যে সব অর্থনীতিবিদ শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনে এসব বিষয়াদি দেখতে পান না অথবা সযত্নে এড়িয়ে চলেন তারা সংকীর্ণ অর্থের অর্থনীতিবিদ — কাণ্ডজ্ঞানহীন পণ্ডিতমূর্খ– প্রকৃত-নির্মোহ সামাজিক বিজ্ঞানী নন।

২. শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৮ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা ভূমিহীন। ৫০ ভাগ খানাতে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ নেই (মনে রাখা দরকার বিদ্যুৎ মানে শুধুমাত্র বাল্বের আলো নয় বিদ্যুৎ মানে আলোকিত মানুষ গড়ার মাধ্যম)। শতকরা ৬৫ জন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে কার্যত বঞ্চিত। আগেই বলেছি বাংলাদেশে নগরায়ন মূলত বস্তিয়ায়ন অথবা শহুরে জীবনের গ্রামায়ন। এ নগরায়নের পাশাপাশি শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে; যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট হতাশা-নিরাশা-দুর্দশা-বঞ্চনা। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র্য ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে কোনো ধরনের প্রগতিবিরুদ্ধ (ধর্মীয় উগ্রতাসহ) কর্মকাণ্ড উৎপত্তির জন্য সহায়ক ভিত্তি সৃষ্টি করে ।

৩. বিগত ৩০ বছরে (১৯৮৪-২০১২) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দারিদ্র-তাড়িত প্রগতিবিমুখ কর্মকাণ্ডসহ ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী মন-মনন-মানসিকতা বৃদ্ধির পরিমাণও গত ত্রিশ বছরে আনুপাতিকহারে বেড়েছে।

৪. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারক বর্তমানে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ২ কোটি ৭১ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত (যারা মোট মধ্যবিত্তের ৫৪ শতাংশ), ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত (মোট মধ্যবিত্তের ৩১ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। এই মধ্যবিত্ত (যারা মোট মধ্যবিত্তের ১৬ শতাংশ) শ্রেণির বিশেষত অস্থির-অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি (যারা মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ আর মোট মধ্যবিত্তের ৮৫ শতাংশ মানুষ) থেকে সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতাসহ মৌলবাদের মেধাশক্তি গঠিত হয়।

এদেশে বিগত ত্রিশ বছরে (১৯৮৪-২০১২) শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করেছে তা যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। অবশ্য শ্রেণিকাঠামোর ক্ষয়িষ্ণু এ অবস্থা শর্তাধীনে প্রগতির শক্তি জোরদারকরণ ও সংহতকরণেও কাজে দিতে সক্ষম। বিশ্লেষণ যা বলছে তা হলো নিম্নরূপ:

ক. বিগত ৩০ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৬ শতাংশই দরিদ্র আর ১৪ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত।

খ. গ্রামের তুলনায় শহরে মধ্যবিত্তের ঘনীভবন (concentration) বেশি। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসেবে দেশের মোট মধ্যবিত্তের প্রায় ৬৬ শতাংশের আবাস এখনও গ্রামে (যাদের ৫৯ শতাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত)।

গ. বিগত ৩০ বছরে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ – ১৯৮৪ সালে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ২০১২ সালে ৫ কোটি ১ লক্ষ। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে।

ঘ. বিগত ৩০ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বৃদ্ধির হার ৪৩ শতাংশ আর অতীতের নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী।

ঙ. ২০১২ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণি) জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষ। বিগত ৩০ বছরে নবসংযোজিত ধনীর সংখ্যা ১১ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩

শতাংশ। সম্পদ যে পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য বেড়েছে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় ধনীর তুলনামূলক সংখ্যা হ্রাস: ১৯৮৪ সালে ৩.৩ শতাংশ থেকে ২০১২ সালে ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যালঘুদল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী' (super-duper rich) অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ২০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনিক শ্রেণির সম্পদের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ বিগত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান তাতে করে অতি-ধনী (যাদের বলে super-duper rich) রেন্ট-সিকারদের যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তা থেকে বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে "For the 1%, Of the 1%, By the 1%" নামে আখ্যায়িত করা যায়। মালিকানার বৈষম্য-অসমতাজনিত যে কাঠামো গড়ে উঠেছে তা শুধুমাত্র দারিদ্র্য-অসমতাকে চিরস্থায়ী করছে তা-ই নয় তা গণতন্ত্রহীনতা থেকে শুরু করে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ চিরস্থায়ীকরণের উর্বর ভূমি প্রস্তুত করছে– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ২০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৮০ শতাংশ সম্পদ)। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ– এসবই বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাসহ উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বিশ্লেষণে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যদিও কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত প্রায় ৭ দশকের (১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকসহ মনোজাগতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে। আর বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। এ সবের সুরাহা কোথায়? কোন পথে? বিষয়টি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। তবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য নিরসন হতে পারে মহাবিপর্যয়কর ভবিষ্যত থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় (অবশ্যই অন্যান্য পথ-পদ্ধতি বাদ দিয়ে নয়)।[৩]

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ দরিদ্র[৪] – যাদের ৭৬ শতাংশ গ্রামে আর ২৪ শতাংশ শহরে বাস করেন (আদমশুমারী ২০০১)। আর গ্রামীণ দরিদ্রদের অর্ধেকই সরাসরি কৃষিকাজ নির্ভর। সরকারি হিসেবে গ্রামের প্রায় সব ভূমিহীনই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন।

---

[৩] আমার এ "পথ-পদ্ধতির" তালিকাভুক্ত হলো একটি ২১ দফা এজেন্ডা অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এই ২১-দফা এজেন্ডার অন্যতম এজেন্ডা। এসবের মর্মার্থ এবং এসব বাস্তবায়নে রাজনৈতিক কাঠামো প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ১৮৪-১৯৫।

[৪] ২০০১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী দারিদ্র্যের মাত্রা ৫৬ শতাংশ আর বাংলাদেশ খানাভিত্তিক আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী- প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য ২৫ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশই দারিদ্র্য পরিমাপে আয় ও ব্যয়ের দারিদ্র্যকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য হলো সুযোগের অভাব বা সমসুযোগের অভাব। আর বৈষম্য-বঞ্চনা থেকেই এর উৎপত্তি। এ বৈষম্য-বঞ্চনা প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও শুধু অর্থনৈতিক নয়। আমার মতে গ্রামীণ দারিদ্র্য-শহুরে দারিদ্র্য নির্বিশেষে দারিদ্র্যকে দেখতে হবে অনেক ধরনের দারিদ্র্যের পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে, যার মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরীর দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, রাজনৈতিক দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য (নারী, ধর্ম, বর্ণ, আদিবাসী, চরের মানুষ), মানস-কাঠামোর

সরকারি হিসেবেই গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের গড় স্থায়ী সম্পদের মূল্যমান ধনীদের (যাদের ৭.৫ একর অথবা তার বেশি জমির মালিকানা আছে) চেয়ে ১৬ গুণ কম। দরিদ্রদের আয়ের অধিকাংশ (৮৭%) খাদ্য বাবদ ব্যয় হয়, যেটা অদরিদ্রদের ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ, আর ধনীদের ক্ষেত্রে বড় জোর ১০ শতাংশ । অর্থাৎ জীবনমানের অন্যতম মাপকাঠি খাদ্য বহির্ভূত ব্যয়-এর নিরিখে ভূমি-দরিদ্রদের প্রান্তিকতা সুস্পষ্ট। সেই সাথে খাদ্য পরিভোগের কাঠামোতে পরিবারে নারী-পুরুষ বৈষম্যও এমন মাত্রায় যেখানে নারীরা দ্বিগুণ দরিদ্র।

একথা আজকাল বেশ শোনা যায় যে গ্রামে এখন কৃষি-বহির্ভূত অনেক কর্মকাণ্ড (non-farm activities) বিকশিত হয়েছে যা গ্রামের মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে কৃষি-অনির্ভর করছে (অথবা কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমাচ্ছে)। এসব কথা বেশ জোর দিয়ে বলে থাকেন মূলত "সরকারি অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী", এবং সে সব অর্থনীতিবিদ যারা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিপক্ষের যুক্তি খুঁজতে পারদর্শী (অথবা ঐ পারদর্শিতা দেখালে তাদের লাভ হয়)। তাঁরা কিন্তু কখনও বলেন না যে গ্রামের একজন দরিদ্র-অতিদরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের মোট প্রকৃত আয় কত এবং তার মধ্যে কৃষি-বহির্ভূত আয়ের পরিমাণ কত এবং তা দিয়ে জীবন পরিচালন সম্ভব কিনা? তারা বলেন না কৃষি-বহির্ভূত আয়ের সাথে ক্রমাগত ভূমিহীনতা প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? তারা এও বলেন না যে কৃষি-বহিভূর্ত ঐ আয়ের সাথে "রেন্ট সিকিং" সিস্টেমের সম্পর্কটা কি? তারা এ নিয়েও কোনো কিছু বলেন না যে গ্রামের ভূমিহীন কৃষক ভূমি মালিকানা চান কিনা? আর জলায় মালিকানাহীন জলজীবী জেলেরা জলায় মালিকানা চান কিনা? তারা এও বলেন না যে ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক আর জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত জেলে সম্প্রদায়ের কাছে জমি-জলায় মালিকানার বিষয়টি মূল্যবান বিষয় কিনা? এসব নিয়ে তারা বলবেন না। কারণ যেমনটি বলেছিলেন আইনস্টাইন "যা কিছু মূল্যবান তার অনেক কিছুই মূল্যায়নও করা যায় না, আর যা কিছু মূল্যায়ন করা হয় তার অনেক কিছুই মূল্যবান নয়।[৫] তারা একথাও সযত্নে এড়িয়ে যান যে বাংলাদেশে এখনও ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ খানার আয়ের উৎস কৃষি।[৬]

আসল কথা হলো: গ্রামে ভূমি মালিকানাই নির্ধারণ করে ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক-মনস্তাত্বিক রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তি মাত্রা। গ্রামে ভূমি মালিকানা দিয়েই নির্ধারিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীদের প্রতি বৈষম্য মাত্রা (সারণি ৪)। যেমন নারীদের শিক্ষার সাথে পরিবারের জমি মালিকানার সম্পর্ক সরাসরি। শুধু তাই নয় গ্রামের একজন সন্তান কোন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অবতরণ করবে সেটাও নির্ধারণ হয় তাঁর পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে যার মাপকাঠি ভূমির উপর মালিকানা। তা না হলে দেশের ১ কোটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ৮৬ শতাংশ কেন গ্রাম থেকে আসে এবং কেনই বা অর্ধেকের বেশি মাদ্রাসা শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবার থেকে আসে? (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬খ)। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়– যেমন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানেও গরিব মানুষ ধনীদের তুলনায় পাঁচগুণ কম সুবিধা ভোগ করেন অথবা পাঁচগুণ কম স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন। এমনকি খানায় বিদ্যুত সুবিধার ক্ষেত্রেও জমি-মালিকানা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। এখানেও বৈষম্য স্পষ্ট। যেসব গ্রামে বিদ্যুত আছে (দেশের প্রায় ৯০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৪০ হাজার গ্রামে) সে সব গ্রামে ধনী পরিবারের ৯০ শতাংশের ঊর্ধ্বে আর দরিদ্র পরিবারের মাত্র ২৫ শতাংশে বিদ্যুত সংযোগ আছে[৭]। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যটি এমনি যে তা সুপেয় পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য– আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে

দারিদ্র্য ইত্যাদি (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্যচিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ জুলাই ২০০৬)।

[৫] অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্তর্গত 'ইকোনমিট্রিকস' বিদ্যার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে শাস্ত্রীয় গুরু জন মেইনার্ড কেইনস আইনস্টাইনের এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন। দেখুন Robert Skidelsky. 2010. "Keynes: The Return of the Master" . London: Penguin Books, পৃ. ৮৬।

[৬] দেখুন, World Bank (2016b). Dynamics of Rural Growth in Bangladesh: Sustaining Poverty Reduction. Washington, D.C: World Bank Group.

[৭] বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul (2006), Energy Security and its Implications for the Poor, CSD-14, UN HQs, NY. Barkat Abul (2006), Rural Electricity Cooperatives in Bangladesh: Impact on Employment Creation and Poverty Reduction, Shanghai–China.

দরিদ্রদের মধ্যে ধনীদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি (পুষ্টিহীনতা ও স্বল্প আয় প্রধান কারণ)। যে কারণে বলা হচ্ছে "আর্সেনিকোসিস– দারিদ্র্যের রোগ"।[৮]

সারণি ৪: ভূমি মালিকানার ধরন অনুযায়ী আয়, স্বাস্থ্যসেবা খরচ, শিক্ষা খরচ, খাদ্য-ভোগ খরচ, পুঁজি-সম্পদের মূল্যমান (টাকায়) এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (কিলো ক্যালরি)

ভূমি মালিকানা বর্গ	বাৎসরিক গড় আয় (টাকা)	বাৎসরিক গড় স্বাস্থ্যসেবা খরচ (টাকা)	বাৎসরিক গড় শিক্ষা খরচ (টাকা)	বাৎসরিক গড় খাদ্য-ভোগ খরচ (টাকা)	পুঁজি-সম্পদের মূল্যমান ২০০২ (টাকা)	দৈনিক মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ (কি:ক্যাল:)
ভূমিহীন (০-৪৯ শতাংশ)	৩৮,৯৮৯	২,৬৭৯	১,০৪০	৩১,৯৭৪	১৭৬,৫১০	২,১৯৪
প্রান্তিক (৫০-১৪৯ শতাংশ)	৪৬,১৭১	৩,১১৫	১,৫৩৮	৩৩,০৩৮	৪৭৮,৭৬৯	২,২৭৮
ক্ষুদ্র (১৫০-২৪৯ শতাংশ)	৭৬,৪৭০	৩,০১১	১,৮১২	৩৮,২৮০	৭৫৯,৭১২	২,২৮১
মধ্য (২৫০-৭৪৯ শতাংশ)	৮৪,৫৭৯	৩,০৩৪	৩,৭৮১	৪৮,০৪৬	১,০৯৫,০৩৩	২,৬৬৬
বৃহৎ (৭৫০ শতাংশ এবং তার বেশি)	১৯৫,১৬৫	৬,২২৬	৪,৭৪৮	৭১,৪৪৯	২,৭৯১,৯৫৯	২,৮৮০

উৎস: বাংলাদেশ সরকার ২০০৩

[৮] বিস্তারিত দেখুন, Barkat Abul, AKM Munir, and S Akhter (2001), Arsenic Contamination of Drinking Water in Bangladesh – Overcoming Sickness and Measures to Improve Health Situation, DLB, Germany.

অধ্যায় ৩

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সংশ্লিষ্ট প্রধান বিষয়াদির রাজনৈতিক অর্থনীতি

৩.১ খাস জমি ও জলা– দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই হিস্যা কিন্তু লুট নিরন্তর

১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" জমিদারদের প্রজাপীড়নের সুযোগ দিল। এ নিয়ে কৃষক– জমি ও জলার উপর তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। কৃষকের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফসল "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫" যদিও বা অর্জিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অবশেষে ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে যাবার পর ১৯৫১ সালে গৃহীত হলো "পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (EBSATA[৯]-1951)"– যেখানে আইনের দৃষ্টিতে কৃষককে তার ন্যায্য অধিকার পুরোপুরিভাবে দেওয়া হয়েছিল। আইনে স্পষ্ট বলা ছিল *"রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী সত্তা থাকবে না"*। অবশ্য "জনকল্যাণকামী" এই আইনটি আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি কার্যত 'জমিদার' 'জোতদার' একাকার হয়েছে (এ প্রসঙ্গে আমি ৩.১০ অনুচ্ছেদে কিছুটা আলোচনা করেছি)।

খাস জমির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে এদেশের কৃষক প্রজাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে এমনটি আশা করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক সামন্ত সেনাপ্রভুরা উল্লিখিত পূর্ববঙ্গ অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনকে কৃষক স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহৃত হতে দেয়নি। প্রজাস্বত্ব আইনকে তারা বার বার পরিবর্তন করে। উদ্দেশ্য ছিল, দেশে এমন একটি শ্রেণিকাঠামো তৈরি করা যা ঐসব সেনাশাসকদের হীনস্বার্থ হাসিল করতে পারে। ফলে পাকিস্তানী শাসনের পুরো সময়কালে খাস জমির বণ্টন কর্মসূচি প্রকৃত গরিব কৃষকশ্রেণির ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনি। পরবর্তীতে ১৯৭১-এ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে কৃষকের স্বপ্ন লালিত ছিল দেশের সম্পদের উপর নিজেদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গরিব, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি এবং দুস্থ ও হতদরিদ্র মানুষগুলো খাস জমি ও জলার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে খাস জমি-জলা তেমনটি বণ্টিত হয়নি। আর অন্যদিকে যে সামান্য অংশ বণ্টনের আওতায় এসেছে সেক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় গ্রাম্য টাউট, মাতব্বর, অসৎ রাজনীতিবিদ ও শহুরে উঠতি বুর্জোয়াদের একটা পরজীবী আঁতাত (অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়ন-চক্র) গড়ে উঠেছে, যা বাংলাদেশে প্রকৃত মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বড় বাঁধা।

গত তিন দশকে বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন-প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শহরে পাড়ি জমিয়েছে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে বড় বড় শহরগুলোর বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন প্রণালী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে। সমগ্র নগরায়ন (urbanization) প্রক্রিয়াটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে আসলে বস্তিয়ায়ন[১০] (slumization)। বৃহৎ অর্থে কৃষি সংস্কারের (agrarian reform) আওতায় খাস জমির সুষম বণ্টনই কেবল দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংকোচনের ফলে সৃষ্ট এই "গলা-ধাক্কা অভিবাসন" (rural

[৯] EBSATA = East Bengal State Acquisition and Tenancy Act-1951

[১০] বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul and S Akhter (2001), "A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladeh," *Harvard Asia Pacific Review*, Vol-5, Issue 1, Winter 2001, Harvard, Cambridge, MA, USA.

push migration) মোকাবেলা করতে পারত। এটি আমাদের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিরও অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য হতে পারত। সরকারের তরফ থেকে ঘোষণাপত্রের কমতি ছিল না। বলা হচ্ছিল "খাস জমি গরিব জনসাধারণের প্রাপ্য।" কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করা হয়নি। আসলে খাস জমির ইস্যুকে এতটাই অবহেলা করা হয়েছে যে, এমনকি দেশে যে কি পরিমাণ খাস জমি রয়েছে এর কোনো স্বচ্ছ বিস্তারিত হিসাব সরকারের জানা আছে বলে মনে হয় না।

ভূমি বিষয়ক সর্বশেষ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উল্লেখ করেছিল যে, দেশে মোট খাস জমি-জলার পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ একর। আমার হিসেবে দেশে বর্তমানে চিহ্নিত এ খাস জমি-জলার (identified khas land) মধ্যে কৃষি খাস জমি ১২ লক্ষ একর, অকৃষি খাস জমি ২৬ লক্ষ একর, এবং জলাভূমি ১২ লক্ষ একর[১১]। এই হিসাব প্রকৃত খাস জমির চেয়ে অনেক কম; কারণ খাস জমির এক বৃহৎ অংশ বিভিন্ন কারণে এখনও সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। খাস জমির সরকারি হিসাব মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। সরকারি হিসাবেই ২৩ লক্ষ একর খাস জলাভূমি এবং ৭১ হাজার একর খাস কৃষি জমির গরমিল আছে।

সরকারি হিসাবে বলা হচ্ছে, চিহ্নিত ১২ লক্ষ একর খাস কৃষি জমির ৪৪ শতাংশ গরিব, ভূমিহীন ও দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। গবেষণায় এ হিসেব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আসলে খাস কৃষি জমির ৮৮ শতাংশ ধনী এবং প্রভাবশালীরা অবৈধভাবে দখল করে আছে। অর্থাৎ যাদের জন্য খাস জমি সেই গরিব ও ভূমিহীন জনগণের সত্যিকার অধিকারে আছে মাত্র ১২ শতাংশ চিহ্নিত খাস কৃষি জমি। আর বণ্টনকৃত খাস কৃষি জমির সরাসরি সুবিধাভোগীদের কমপক্ষে ২০ শতাংশ আগে থেকেই ভূমি মালিক।

খাস জমির বিতরণ প্রক্রিয়াটা দরিদ্র কৃষকের জন্য বড় ধরনের বিড়ম্বনা। খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রধান নায়ক হলেন সরকারি ভূমি অফিসের কর্মকতা/কর্মচারী, স্থানীয় গণপ্রতিনিধি, এবং স্থানীয় প্রভাবশালী। মিলেমিশে এরা সৃষ্টি করেছে জমি-দস্যুর শক্তিশালী এক বলয়।

একজন ভূমিহীন ব্যক্তি খাস জমির সম্ভাব্য বণ্টন তালিকায় স্থান পাবেন কি পাবেন না তা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হলো: সে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সমাজভুক্ত কিনা, সে তাদের একই রাজনৈতিক দলভুক্ত কিনা, তালিকা প্রণেতা তার কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে কিনা, এবং ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে তার যোগাযোগ কেমন (?) ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে যে অতীতে অনেক ভূমিহীন তালিকাভুক্ত হয়েছেন অথচ শেষ পর্যন্ত জমির বরাদ্দ পাননি। বরাদ্দ না পাবার অন্যতম কারণসমূহ হলো: সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগের অভাব, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে বৈরী সম্পর্ক, খাস জমি অন্যের দ্বারা অবৈধভাবে দখল হওয়া, খাস জমির অপ্রতুলতা, অসম্পূর্ণ ও অনুপযুক্ত আবেদন পত্র।

খাস জমি বণ্টন কর্মসূচিভিত্তিক বিধি-বিধানে সংশ্লিষ্ট ভূমিহীন যারা খাস জমি পাবার জন্য নির্বাচিত হন তারা 'সালামি' (সরকারি ফি) হিসেবে একর প্রতি ১ টাকা পরিশোধ করতে দায়গ্রস্ত। সরকারি বিধান অনুযায়ী এক্ষেত্রে অন্য কোনো রকম আলাদা পরিশোধের প্রয়োজন নেই এবং এ বণ্টন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন রকম আলাদা পরিশোধ অসাধু কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। অথচ গবেষণায় স্পষ্ট প্রতীয়মান যে বণ্টন কৌশলে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই ঘুষের সাথে সম্পৃক্ত। তহশিলদারকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ নিতে দেখা যায়, তারপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় টাউটদের নিয়ে গঠিত একদল লোক এবং ভূমি অফিসের লোকজন। ১ একর খাস জমি পাওয়ার জন্য ঘাটে ঘাটে মোট প্রায় ৭ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় (সারণি ৫)।

[১১] চিহ্নিত খাস জমি-জলার বিস্তারিত বিভাজন সংক্রান্ত তথ্য সরকারিভাবে প্রকাশিত নয়। এ বিষয়ে সরকার সম্ভবত পুরো তথ্য জানে না। এক্ষেত্রে এক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কৃষি-অকৃষি-জলা-র আনুপাতিক হিসেব পাওয়া যায় মোট খাস জমি-জলার যথাক্রমে ২৪.২ শতাংশ, ৫১.৬ শতাংশ ও ২৪.২ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন: বারকাত, আবুল., শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (২০০১ ও ২০০৬ক), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি, পাঠক সমাবেশ।

সারণি ৫: খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে ঘুষ

প্রক্রিয়া/উদ্দেশ্য	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
তালিকায়ন প্রক্রিয়া:		
ভূমিহীন হিসেবে তালিকাভুক্ত	*তহশীলদার* *ইউপি চেয়ারম্যান*	খানা প্রতি ২০০ - ১০০০ টাকা
আবেদন প্রক্রিয়া:		
(ক) ফরম বিক্রি	তহশীলদার	ফরম প্রতি ২০ -১০০ টাকা
(খ) ফরম পূরণ	তহশীলদার	ফরম প্রতি ১৫ -৫০ টাকা
(গ) ফরম জমা দেয়া	তহশীলদার	ফরম প্রতি ২০ -৫০ টাকা
(ঘ) ফরমে স্বাক্ষর করা	*ইউপি চেয়ারম্যান*	ফরম প্রতি ৪০ -১০০ টাকা
নির্বাচন প্রক্রিয়া:		
(ক) খাস জমি পাবার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত	তহশীলদার, *ইউপি চেয়ারম্যান*	আবেদন প্রতি ২০০ - ১০০০ টাকা
(খ) খাস জমি পাবার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত	তহশীলদার, ইউপি চেয়ারম্যান	আবেদন প্রতি ১০০০ - ২০০০ টাকা
হস্তান্তর প্রক্রিয়া:		
(ক) আবেদনের উপর খাস জমির হোল্ডিং নম্বর স্থাপন	তহশীলদার, এসি ল্যাণ্ড, টিএনও, ডিসি, এডিসি রেভঃ, স্থানীয় টাউট	আবেদন প্রতি ১০০ - ৩০০ টাকা
(খ) জরিপ রেকর্ড এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য	কানুনগো (জরিপকারী), এসি ল্যাণ্ড অফিসের কর্মকর্তাগণ	আবেদন প্রতি ১০০ - ৩০০ টাকা
(গ) এডিসি রেভিনিউ থেকে ডিসি-এর নিকট ফাইল চালনা	একদল লোক (স্থানীয় টাউট, ভূমি অফিসের কর্মকর্তাগণ)	আবেদন প্রতি ১০০ - ৩০০ টাকা
(ঘ) খাস জমির কবুলিয়ত (চুক্তিপত্র) পাওয়া	কানুনগো, তহশীলদার, এসি ল্যাণ্ড	আবেদন প্রতি ২০০ - ৬০০ টাকা
(ঙ) খাস জমির বরাদ্দ পাওয়া	এসি ল্যাণ্ড, তহশীলদার, ইউপি চেয়ারম্যান	একর প্রতি ১০০০ - ৪০০০ টাকা
খাস জমির উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া অবস্থানের অনুমতি	তহশীলদার, পুলিশ, এসি ল্যাণ্ড, ইউপি চেয়ারম্যান	অর্থমূল্য পরিমাপ করা যায়নি
অবৈধভাবে দখলকৃত খাস জমির ফসল কেটে নেবার জন্য অনুমতি	পুলিশ, তহশীলদার	একর প্রতি ফসলের জন্য ৩০০-৫০০ টাকা
বৈধভাবে দখলকৃত খাস জমির ফসল কাটা অথবা বৈধ দখল সংরক্ষণ করা	স্থানীয় প্রভাবশালীগণ, তহশীলদার, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার	প্রতি ফসলের মৌসুমে ৩০০-৫০০ টাকা

উৎস: বারকাত, আবুল., শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (মূল ২০০১, বঙ্গানুবাদ ২০০৬ক), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার, পাঠক সমাবেশ: ঢাকা।

খাস জমি বণ্টনের বিভিন্ন পর্বে ঘুষের মাধ্যমে নির্দেশিত এই অবাধ দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সবচেয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ নিম্নরূপ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্তঃ স্বচ্ছতার অভাব, দুর্বল (অপ) পরিচালনা (দায়বদ্ধতার অভাব থেকে উদ্ভূত), দরিদ্র জনগণের অজ্ঞতা, দুর্বল সুশীল সমাজ, দুর্বল কৃষক আন্দোলন, ইত্যাদি।

খাস জমির অসম বণ্টনের ক্ষেত্রে ভূমি অফিসের দুর্নীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক একর খাস জমি পাবার জন্য গড়ে ৭-১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। একখণ্ড খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য একজন সুফল ভোগীকে গড়ে ৭২ কর্মদিবস ব্যয় করতে হয় (যা সরকার ঘোষিত এই কাজে প্রয়োজনীয় সময়ের ২৪ গুণ বেশি)।

খাস জমি-জলার বণ্টন ও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াটি মূলতঃ স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনা। ২০০১ সাল পর্যন্ত যত জমি বণ্টিত হয়েছে তার বেশির ভাগই ঘটেছে ১৯৮১-১৯৯৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৯১-৯৬ সনে খাস জমি বণ্টনের অনুপাত ১৯৮১-৯০ সনের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে ৭ বছরে ৫৬ শতাংশ, যেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১০ বছরে ৩৬ শতাংশ।

বাজার অর্থনীতি (অথবা বাজার অন্ধত্বঃ market fundamentalism অর্থে) এমনই যে দরিদ্র মানুষ জমি পাবেন কিন্তু তা ধরে রাখতে পারবেন না (issue of non retention and adverse inclusion)। গবেষণায় দেখা যায় যে ৫৪ শতাংশ সুফলভোগী বিভিন্ন কারণে জমির ওপর তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, ভূমিহীন গরিব জনগণের যে ক্ষুদ্র অংশটি খাস জমি পেয়েছেন তাদেরও প্রতি ২ জনে ১ জন খাস জমি বণ্টনের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও পাননি। বণ্টনকৃত খাস জমির উপর অধিকার টিকিয়ে রাখতে পেরেছে মাত্র ৪৬ শতাংশ সুফলভোগী (অর্থাৎ দলিল আছে, জমি চাষ করছেন এবং ফসল ঘরে উঠাতে পারছেন)। ভূমি অফিস ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাথে দখলকারীদের যোগসাজশ –জমি রক্ষা করতে না পারার প্রধান কারণ। ৫২ শতাংশ সুফলভোগী অবৈধ দখলকারীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। যে সমস্ত কারণে ভূমিহীন মানুষ তাদের মধ্যে বন্টনকৃত জমি রক্ষা করতে পারেননি সেগুলো হলোঃ অবৈধ দখলদাররা ক্ষমতাবান; স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে অবৈধ দখলদারদের যোগসাজশ সুদৃঢ়; আইন প্রক্রিয়া ধনী-সহায়ক; আইনগত জটিলতার বিষয়টিই বেআইনি; সরকারি সহযোগিতা– কাগুজে; সমস্যা সৃষ্টিকারী সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়শই নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত; গরিবদের বিভক্ত রাখার জন্য অবৈধ দখলদাররা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে কোনো কার্যকর ভূমি সংস্কার আদৌ সম্ভব কিনা এসব পরিসংখ্যান সেসব বিষয়েই সন্দেহের জন্ম দেয়।

সুফলভোগীদের ৪৬ শতাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। ভালো হয়নি ৫৪ শতাংশের (যাদের মধ্যে ৩৬ শতাংশের অবস্থা অতীতের তুলনায় খারাপ হয়েছে)। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি মূলত ২টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্তঃ (ক) ভূমির দখলি স্বত্ব ও ফসলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, (খ) জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে লাঙ্গল ও হালের বলদসহ চাষাবাদ-নিমিত্ত অন্যান্য সম্পদের উন্নতি– যে ২টি জিনিস নিশ্চিত হয়নি বলেই অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়নি। অর্থাৎ অদক্ষ ও অসম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কহীন খাস জমি-জলা বণ্টন-কেন্দ্রিক ভূমি সংস্কারই সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের জন্য আশীর্বাদ না-কি অভিশাপ– প্রশ্নটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী একখণ্ড খাস জমি প্রাপ্তির আশু সুবিধা অর্জনে দীর্ঘমেয়াদের সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে (করছেনও); সর্বব্যাপি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের আওতায় বাজার অর্থনীতির মারপ্যাচে রক্ষা করতে পারছেন না বণ্টিত খাস জমি-জলা (high non-retention rate); মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে "বৈরী অন্তর্ভুক্তিকরণ" (adverse inclusion)-এর শিকার হচ্ছেন; জোরদখলকারী জমি-জলা-দস্যুরা সংগঠিত কিন্তু দরিদ্ররা অসংগঠিত; ঘুষসহ অন্যান্য অনেক বিধি বহির্ভূত ব্যয় করতেও দরিদ্ররা খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না (করেন কি?)– এসব কারণে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমির বিষয়টি দরিদ্রদের জন্য এক ধরনের অভিশাপের বিষয় হিসাবে গণ্য হতে পারে। আবার বর্তমান কাঠামোতে যখন দেখি যে খাস জমির সুফলভোগীদের ৪৬ শতাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভাল হয়েছে– সেটা কিন্তু দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর মধ্যেও কিছুটা আশার লক্ষণ।

খাস জমি-জলাসহ চরের জমিতে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিষয়টি স্পর্শকাতর ও জটিল। তবে 'সমতা এবং রাণীশংকৈলে' খাস জমি-জলায় অধিকার প্রতিষ্ঠায় দরিদ্র মানুষের আন্দোলন- সংগ্রাম বিশ্লেষণে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় লক্ষণীয়, যা ভবিষ্যতে ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে[১২]:

১. ভূমিহীন-প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের প্রধান শক্তি তাদের একতা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে নিহিত। প্রভাবশালী জোর দখলকারীদের যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভূমিহীন-জলাহীন কৃষকদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে, কারণ তারা কৃষকদের একতা ভেঙে ফেলার জন্য সব ধরনের পথই অবলম্বন করে। যদি

[১২] বারকাত, আবুল., শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (২০০৬), বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতিঃ জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার, পাঠক সমাবেশঃ ঢাকা।

প্রতিপক্ষ এটা অর্জন করতে পারে তবে খাস জমির উপর দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

২. দরিদ্রদের উভয় লড়াই-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত– মাঠ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে শারীরিকভাবে মোকাবিলা করা, এবং একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে তহসিল অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানা এবং চূড়ান্তভাবে আদালতে তাদের ন্যায়সঙ্গত কারণে লড়ে যাওয়া।

৩. দরিদ্র মানুষকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন এবং দরিদ্র-বান্ধব এনজিওসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বঞ্চিত মানুষের জীবন মান উন্নত করা। দরিদ্র মানুষের নেতৃবৃন্দের সাথে প্রশাসন এবং নীতিমালা প্রণেতাদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ থাকা উচিত– স্থানীয় প্রভাবশালী এবং টাউটদের প্রতিহত করা অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, যারা খাসজমি গ্রাস করার সময় অফিস কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কাজ করে এবং বিপথগামী করে।

৪. নাগরিক সমাজ সংগঠন যারা কৃষক আন্দোলন এবং দরিদ্র জনগণের ভূমি-অধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত, এদের পৃষ্ঠপোষকতা সংশ্লিষ্ট আন্দোলন বেগবান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫. জনগণের ন্যায়সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় খবরের কাগজগুলোতে প্রচারিত হওয়া উচিত। খাস জমি বণ্টন কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয় সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া উচিত।

৬. দরিদ্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত এবং তাদের ভূমি-জলা অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদি সুফলের বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি সুফলের জন্য সামষ্টিক-স্বার্থ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বিচ্ছিন্ন অথবা একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পরিণামে কোনো সামষ্টিক সুফল বয়ে আনবে না।

৭. দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার আন্দোলনের সফলতার কাহিনী সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার হওয়া উচিত।

৩.২ চরের জমি– আল্লাহ জানে মালিক কে? চরের মানুষের প্রান্তিকতা[১৩]

চরের মানুষের দারিদ্র-দুর্দশা-বঞ্চনা কেন যেন চিরস্থায়ী। চর মানেই দারিদ্র্যের-পকেট। এ দেশের ৫ শতাংশ মানুষ (৭০-৭৫ লক্ষ) চরে বাস করেন যাদের ৮০ শতাংশ দরিদ্র। চরের ৬০ শতাংশ মানুষ সম্পূর্ণ ভূমিহীন- যাদের নিজ মালিকানায় কৃষি-জমি এবং বসতভিটা কোনোটাই নেই। আর চরভেদে ভূমিহীনতার এ মাত্রা বিভিন্ন, যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বায়ারচরে ৯৮ শতাংশ মানুষই ভূমিহীন। খাদ্য পরিভোগের নিরিখে চরের মানুষের দরিদ্রাবস্থা দেশের গড় অবস্থার চেয়ে অনেক খারাপ– চরের ক্ষেত্রে মাথাপিছু দৈনিক গড় খাদ্য পরিভোগ ১৯০৫ কিলোক্যালরি আর সারাদেশের ক্ষেত্রে ঐ গড় ২,২৪০ কিলোক্যালরি। আর চরম দারিদ্রের কারণে চরের অধিকাংশ মানুষের খাদ্য তালিকা কার্বোহাইড্রেট সর্বস্ব, প্রোটিন নেই বললেই চলে। আসলে চরের মানুষ যা উৎপাদন করেন তার অধিকাংশের মালিক তারা নন। অথচ হিসেব কষলে দেখা যায় যে চরের জমি চরের দরিদ্র মানুষের মালিকানায় গেলে মাথাপিছু গড় ক্যালরি ১,৯০৫ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩,৯৫৯ কিলোক্যালরিতে।

অধিকাংশ চরের মানুষ (৮৬ ভাগ) নদী ভাঙ্গনের কারণে চরে বাস করেন; দ্বিতীয় কারণ ভূমিহীনতা (২৬ ভাগ), আর তার পরে আছে জীবিকার সন্ধান (২১ ভাগ)। সবকিছু মিলে চরের অধিকাংশ মানুষই চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করেন এবং খাস জমি-জলা-বনে তাদের মালিকানাহীনতা ও অভিগম্যতার অভাবই প্রান্তিকতার মূল কারণ।

[১৩] চরের জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul., PK Roy, and MS Khan (2007), Char Land in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource, Dhaka: *Pathak Samabesh*.

চরের দরিদ্র-প্রান্তিক নারী-পুরুষ নিরন্তর উচ্ছেদ আতঙ্কে বসবাস করতে বাধ্য হন। এ কোনো নতুন ঘটনা নয়। গণমাধ্যম এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই রিপোর্ট করছে। যেমন একটি জাতীয় দৈনিক "দুদ্বীপচরে সহস্র কৃষক পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে" শিরোনামে রিপোর্ট করেছে *"আমন ধান কাটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গলাচিপার দু'টি দ্বীপচরের অন্তত এক হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছেদ আতঙ্ক। চর দুটির প্রায় ৬শ একর জমি প্রকৃত আবাদকারীদের পরিবর্তে ভূমিদস্যু, প্রভাবশালী টাউট-বাটপাড় ও অস্থানীয়দের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আরও প্রায় দেড় হাজার একর জমি একই পদ্ধতিতে বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া চলছে। যার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, সীমাহীন জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ জমি গত বছর বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত জমিতে যারা বছরের পর বছর রোদে পুড়ে বর্ষায় ভিজে চরম মানবেতরভাবে বসবাস করছে এবং কঠোর পরিশ্রমে চাষাবাদ করেছে বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের আবেদন সামান্যতম বিবেচনা করা হয়নি। উপরন্তু তাদের অনেকের আবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বন্দোবস্ত পাওয়া জোতদাররা প্রকৃত কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদে নানা পাঁয়তারা শুরু করে দিয়েছে। চলছে হুমকি ধমকি" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৭)*।

চর নিয়ে এতো কথা কিন্তু বাংলাদেশে চরের জমির মোট পরিমাণ কত তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। জানা মতে চরের জমির মোট পরিমাণ ১ হাজার ৭২৩ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৫৬ একর যা দেশের মোট ভূমির ১.২ ভাগ। এদেশের ৫ ভাগ মানুষ (৭০-৭৫ লক্ষ) চরে বসবাস করেন।

চরের জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি যা সংশ্লিষ্ট কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সম্পর্কে আমাদের গবেষণালব্ধ মূল ফলাফলসমূহ নিম্নরূপঃ

১. চরের ৯৩ ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ ভূমিহীন অথবা প্রায় ভূমিহীন। এসব মানুষ প্রকৃতই প্রান্তিক। ৬০ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ বা সম্পূর্ণ ভূমিহীন (absolute landless) যাদের নিজস্ব মালিকানায় কৃষিজমি বা বসতভিটা কোনোটাই নেই (যা দেশের গড় নিরঙ্কুশ ভূমিহীনতার তুলনায় ৩ গুণ বেশি); আর ৩৩ ভাগ মানুষ কার্যত ভূমিহীন (functional landless) যাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ২৫০ শতক অথবা এর কম।

২. চরভেদে ভূমিহীনতার মাত্রা বিভিন্ন। যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বয়ারচরে ৯৮ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ ভূমিহীন, টাঙ্গাইলের চরে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন ৩০ ভাগ, রাজবাড়ির চরে ৬৩ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ ভূমিহীন, পাবনার চরে ৪৪ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ ভূমিহীন এবং রাজশাহীর চরে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন ৬২ ভাগ মানুষ।

৩. চরের খানাপ্রতি গড় ভোগদখলি জমির পরিমাণ ১৩৩ শতক (৫০ শতক নিজ মালিকানাধীন জমি; ৬৫ শতক বর্গা/ভাড়া নেয়া জমি; আর ১৮ শতক সরকারি জমি যার মধ্যে লিজ প্রাপ্ত জমির পরিমাণ শূন্য(০) শতক। অর্থাৎ সরকারি খাস জমির উপর চরের দরিদ্র মানুষের দখলসত্ব আইনগতভাবে সংরক্ষিত নয়। চরের মানুষের ভোগদখলি জমির প্রাথমিক/প্রধান উৎসগুলো হলোঃ পৈতৃক-উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি, ক্রয়-বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও দানসূত্রে পাওয়া জমি। জমির অপ্রধান/মাধ্যমিক উৎসগুলো হলো ২ ধরনেরঃ বর্গা/ভাড়া নেয়া জমি (যার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে বর্গা/ভাড়া নেয়া, বেআইনি দখলদারের কাছ থেকে বর্গা/ভাড়া নেয়া জমি) ও সরকারি জমি।

৪. চরের খাস জমির বেআইনি দখল ও বন্দোবস্তের পরিমাণ চরভেদে বিভিন্ন, যেমন নোয়াখালীর চর জব্বার ও বয়ারচরে বেআইনি দখলদারের কাছ থেকে বর্গা/ভাড়া নেয়া জমির পরিমাণ খানাপ্রতি ২১ শতক (খানা প্রতি মোট জমির এক পঞ্চমাংশ) এবং আইনগতভাবে দখলসত্ত্ব সংরক্ষিত নয় এরূপ খাস জমির পরিমাণ ৭৬ শতাংশ (খানা প্রতি মোট জমির তিন-চতুর্থাংশ)।

৫. গড়ে খানা প্রতি বন্দোবস্ত পাওয়া জমির (settled land) পরিমাণ ০.৮ শতক যা খানাপ্রতি (মোট মালিকানাধীন জমির ২ শতাংশের কম)।

৬. চরের জমির মালিকানা বৈষম্য চরম। চরের ৭৭ ভাগ মানুষের দখলে আছে ৪৭ ভাগ জমি আর মাত্র ১ ভাগ মানুষের (যারা প্রধানত জবরদখলকারী) দখলে আছে ১৫ ভাগ জমি।

৭. চরে খানাপ্রতি মোট সম্পদের আর্থিক মূল্যমান গড়ে ৩৮ হাজার ৯৬৭ টাকা। এর মধ্যে স্থায়ী সম্পদ ২৬ হাজার ২৮১ টাকা (৬৭ ভাগ) আর স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ ১২ হাজার ৬৮৫ টাকা (৩৩ ভাগ)।

৮. চরের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১ হাজার ৯০৫ কিলোক্যালরি যা দেশের গড় দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের ১৫ শতাংশ কম। চরের মানুষের খাদ্যতালিকা কার্বোহাইড্রেড সর্বস্ব; এবং খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ মাত্র ২.৬ ভাগ।

৯. খাদ্য গ্রহণের নিরিখে চরের ৫৩ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ দরিদ্র (absolute poor) আর ৩৭ ভাগ মানুষ চরম দরিদ্র (hardcore poor) (সমগ্র দেশে গড়ে ৪৪ ভাগ মানুষ নিরঙ্কুশ দরিদ্র এবং ৩২ ভাগ মানুষ চরম দরিদ্র)।

১০. চরের মানুষ যা উৎপাদন করেন তার অধিকাংশের মালিক তারা নন। অথচ হিসেব কষলে দেখা যায় চরের জমি চরের দরিদ্র মানুষের মালিকানায় দেয়া গেলে গড় ক্যালরি পরিভোগ ১ হাজার ৯০৫ থেকে বেড়ে দাড়াবে ৩ হাজার ৯৫৯ কিলোক্যালরি। চরের খাস জমি দরিদ্র মানুষের মালিকানায় দেয়া গেলে চরের ১০ ভাগ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য আর ৩ ভাগ চরম দারিদ্র্য সরাসরি দূর করা সম্ভব।

১১. চরের ৬১ ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর (সারাদেশের গড় নিরক্ষরতার হার ৩৫ ভাগ)।

১২. চরের ৭৫ ভাগ মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস চরের জমি। এক তৃতীয়াংশ মানুষের আয়ের-প্রাথমিক উৎস কৃষিকাজ; আর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের আয়ের দ্বিতীয় কোনো উৎস নেই– বন্যা ও নদীভাঙ্গনের ফলে যাদের অবস্থা নাজুক হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

১৩. চরের অধিকাংশ মানুষই ভাসমান। একই চরে ১-২ বছর বাস করেন ২০ ভাগ মানুষ, ৩-৫ বছর বাস করেন ৪২ ভাগ মানুষ, ৬-১০ বছর বাস করেন ২৭ ভাগ মানুষ, ১৯-২৫ বছর বাস করেন ৫ ভাগ মানুষ, এবং ১৫ বছরের অধিক সময় বাস করেন ৬ ভাগ মানুষ। চরের মানুষ একই চরে বসবাস করেন গড়ে ৬ বছর।

১৪. চরে বসবাস করার কারণ প্রধানত ৩টি: (ক) নদী ভাঙ্গন (৮৬ ভাগ), (খ) ভূমিহীনতা (২৬ ভাগ), এবং (গ) জীবিকার সন্ধান (২১ ভাগ)।

১৫. চরের মানুষের বঞ্চনার প্রধান উৎস হলো: (ক) আশ্রয়হীনতা, (খ) ভূমিহীনতা, (গ) খাস জমিতে অভিগম্যতাহীনতা, (ঘ) ভূমি প্রশাসনে অভিগম্যতার অভাব, এবং (ঙ) আইন-কানুন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে অভিগম্যতার অভাব। আর এই বঞ্চনাকে ত্বরান্বিত করে ৩টি বিষয়:

- নদীভাঙ্গনের ফলে বাস্তুচ্যুতি
- চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস
- চরের জমির অবৈধ দখল ও লিজ দেয়া।

১৬. চরের ৮৯ ভাগ মানুষই নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়েছেন যাদের ৯৭ ভাগ-এর পুনর্বাসনের কোন কার্যকর পদক্ষেপ সরকারের তরফ থেকে কখনও নেয়া হয়নি। আবার চরভেদে এই পুনর্বাসনহীনতার মাত্রাও ভিন্ন (যেমন- নোয়াখালীর চরে ১০০ ভাগ নদীভাঙ্গন কবলিত মানুষ কোনোরূপ পুনর্বাসন সুযোগ-সুবিধা পাননি)।

১৭. যদিও চরের জমির হালনাগাদ সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই তথাপি বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, চরে একটি পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার সম্ভব। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চরের জমি রয়েছে তা যদি চরের সমস্ত ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের মাঝে বণ্টন করা যায় তাহলে খানাপ্রতি ৪.৭ একর জমি বণ্টন করা সম্ভব। খানাপ্রতি পুনর্বণ্টনযোগ্য জমির পরিমাণ টাঙ্গাইলের চরে ৪.৩ একর, পাবনা ও রাজশাহীর চরে ৮.৯ একর, রাজবাড়ির চরে ৮.৬ একর, এবং নোয়াখালীর চরে ৩.১ একর।

চরের মানুষের দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা যেন চিরস্থায়ী; চর মানেই দারিদ্র্য পকেট। সরকার ও নীতিনির্ধারক মহলে বক্তৃতা-বিবৃতির যদিও কোনো ঘাটতি নেই তথাপি স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত ৪৪ বছরে চরের মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার সচেতন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এমনটি আমাদের জানা নেই। এমনকি সারাদেশে মোট চর কত; চরের মোট জমির পরিমাণ কত এবং চরে কত মানুষের বাস– এরও কোনো নির্ভরযোগ্য হালনাগাদ পরিসংখ্যান নেই। চরের মানুষ উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে এবং চরের খাস জমিতে তাদের সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানব-উন্নয়ন পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগের বিষয়। চরের অধিকাংশ মানুষই গরিব, ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক, দিন মজুর, এবং দুস্থ ও হতদরিদ্র। চরের অধিকাংশ মানুষ নিজেরা নিজেদের "নিঃস্ব গরিব" হিসেবে চিহ্নিত করেন। অন্যদিকে এক শ্রেণির টাউট, মাতব্বর, অসৎ রাজনীতিবিদ এবং ভূমি-জলাদস্যু লাঠিয়াল ও সরদার গোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে চরের জমিতে অবৈধ দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। গত কয়েকবছর পত্র পত্রিকায় আমরা অনেক চর-দস্যুর নাম শুনেছি। যেমন, নব্যচোরা গ্রুপ, তালেব ব্যাপারি, রশিদ্দা শেখ, তারা মাতব্বর, বাশার মাঝি গ্যাং ইত্যাদি। তাদের এক গ্রুপের একজন নিবেদিত প্রাণ লাঠিয়াল ব্যক্তিগত সাক্ষাতে আমাকে যা বলেছে তা প্রণিধানযোগ্য বিধায় হুবহু উল্লেখ করছি:

> "আমাদের নেতার নির্দেশে আমরা এ পর্যন্ত আনুমানিক ১৫০-২০০ মানুষ খুন করেছি, আর নারী ধর্ষণ করেছি ১,৫০০-২,০০০। ৬০ হাজার একর বনের মধ্যে ৪০ হাজার একর বন কেটে সাফ করে ফেলেছি....। আমাদের কাজ হলো বিভিন্ন এলাকা থেকে ভূমিহীন মানুষ খুঁজে নেতার সামনে হাজির করা– নেতা একর প্রতি ৩,০০০-৫,০০০ টাকার বিনিময়ে তার শর্তে চরের জমি চাষ ও জমিতে বসবাস করার অনুমতি দেন। ....আমাদের গ্যাং-এ আনুমানিক ৩০০ মানুষ। ....ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করি। ....ডিসি সাহেব আমার নেতার মানুষ....। পুলিশকে আমরা নিয়মিত মোটা অঙ্কের চাঁদা দিই। এমপি সাহেবের এখানে তেমন কোনো কর্তৃত্ব নেই– নির্বাচনে আমরা তাকে উপকার করেছি। ....জরিপওয়ালারা একবার এসেছিল.... ব্যাটাদের ঘাড়ে কয় মাথা – অবস্থা দেখে ভেগেছে। .... আমাদের নেতার মুখের কথাই এখানে আইন....।"

৩.৩ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রিক প্রান্তিকতা: শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন

পাকিস্তানের সামন্ত-সেনাশাসকেরা জন্ম সূত্রেই ছিলেন বাংলাভাষা ও বাঙালি বিরোধী। যে কোনো কায়দায় ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত, দেশচ্যুত করা গেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করা সোজা হবে– এ ভাবনা থেকেই পাকিস্তানী সেনা শাসকেরা কালক্ষেপণ না করে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে "শত্রু সম্পত্তি আইন" (Enemy Property Act) জারী করে। যে আইনের মূলমন্ত্র ছিল: হিন্দুস্থান=শত্রুস্থান, ও হিন্দু=শত্রু। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান, মানবাধিকার, জন্মসূত্রে মালিকানার বিধান– এসবের পরিপন্থী হলেও শত্রু সম্পত্তি আইনটি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বাতিল ঘোষিত হয়নি; নাম পরিবর্তন হয়েছে মাত্র– নতুন নাম, অর্পিত সম্পত্তি আইন (Vested Property Act)। বিষয়টি অন্যের জমি-সম্পত্তি বেদখলের চেয়েও অনেক গভীরের– একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ১২ লক্ষ হিন্দু খানার ৫০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মোট হিন্দু খানার ৪০ শতাংশ)[১৪]। এই আইনে ভূমি-চ্যুতির পরিমাণ ২৬ লক্ষ একর যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায়) ৫৩ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত ২৬ লক্ষ একরের প্রায় ৮২ শতাংশ কৃষিজমি, ২৯ শতাংশ বসতভিটা, ৪ শতাংশ বাগান, ১ শতাংশ পুকুর, ৩ শতাংশ পতিত ও ১৯ শতাংশ অন্যান্য। ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি গড় জমি-ক্ষতির পরিমাণ ২৮৩ ডেসিমেল, যার মধ্যে ২১৯ ডেসিমেল (আইনে) সরাসরি ক্ষতি আর বাদবাকি ৬৪ ডেসিমেল ক্ষতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা ও ক্ষতিজনিত আর্থিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যয়িত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খানার ৭৮ শতাংশ হারিয়েছেন কৃষি জমি, ৬০ শতাংশ হারিয়েছেন বসতভিটা ও ২০ শতাংশ হারিয়েছেন অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি। অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপকহারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতিও (movable assets) ঘটেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায় বর্তমানে এ সম্পদ প্রায় ৬.৫ গুণ হ্রাস পেয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি আইনে আর্থিক ক্ষতির (ভূমি-জলা ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ) মোট মূল্যমান হবে বর্তমান বাজার দরে (২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসেবে) কমপক্ষে ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট জাতীয় উৎপাদনের আনুমানিক ৬৩ শতাংশের সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৪ গুণেরও বেশি। আর্থিক এ ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশ মাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মায়ের পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানব সম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা - এ সকল ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান অসীম যা নির্ধারণ করা কোনো হিসাববিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়।

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ১২ লক্ষ হিন্দু খানা ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছে– একথা সত্য। তবে তা আংশিক সত্য। আসল ক্ষতি অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত এবং গভীর। আসলে সৃষ্টি হয়েছে নিরন্তর বঞ্চনার এক ফাঁদ বা চক্র (deprivation- trap, deprivation-cycle)। যে বঞ্চনা প্রধানতঃ ৫ ধরনের বঞ্চনার জটিল এক যোগফল যা ক্রমবর্ধমান। এ ৫ ধরনের বঞ্চনা হলো ক্ষমতাহীনতা (powerlessness), ভঙ্গুরতা/মর্মাঘাত (vulnerability), শারীরিক দুর্দশা (physical weaknesses), দারিদ্র্য (poverty), এবং নিঃসঙ্গতা/বিচ্ছিন্নতা (isolation)। বঞ্চনার জটিল এ ফাঁদটির মূল নির্দেশকসমূহ নীচের ছক ৪-এ দেখানো হয়েছে।

[১৪] বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul. *et al* (2008a). Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh Living with Vested Property. Dhaka: Pathak Shamabesh. Barkat, Abul. *et al* (2000), An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution, PRIP Trust: Dhaka.

ছক ৪: শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা-চক্র

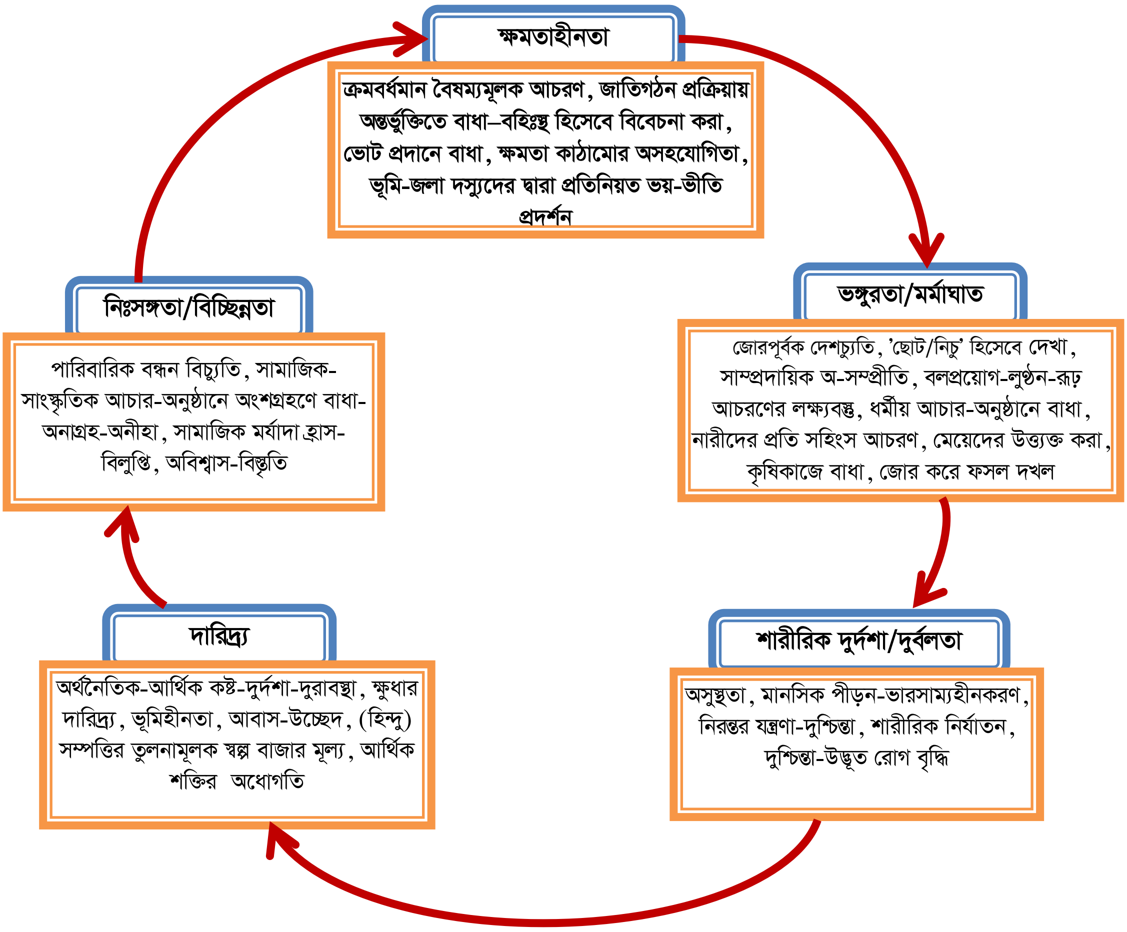

প্রধানত শত্রু সম্পত্তি আইন বলবৎ করা এবং সংশ্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষসহ বহু ধরনের বঞ্চনা-বিপর্যয়ের কারণে এবং পরবর্তীতে ঐ একই আইন ভিন্ন নামে (অর্পিত সম্পত্তি নামে) কার্যকর থাকার ফলে ব্যাপকসংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ অনিচ্ছায় দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে "নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা" (missing hindu population)। আমার হিসেবে প্রায় পাঁচ দশকে (১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত) আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ গড়ে বছরে বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন। অন্য কথায়, শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন-উদ্ভুত বঞ্চনার মাত্রা এমনই যে ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়কালে প্রতিদিন গড়ে নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা সমান নয়: যেমন ১৯৬৪-১৯৭১ (পাকিস্তানের শেষ ৭ বছর) সময়কালে প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৭০৫ জন, ১৯৭১-১৯৮১-এ প্রতিদিন ৫২১ জন, ১৯৮১-১৯৯১-এ প্রতিদিন ৪৩৮ জন, ১৯৯১-২০০১-এ প্রতিদিন ৭৬৭ জন, আর ২০০১-২০১২-এ প্রতিদিন ৬৭৪ জন। অর্থাৎ শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন-উদ্ভূত এ নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে এখন থেকে দুতিন দশক পরে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনুষ্য বঞ্চনার অথবা মানুষের "হারিয়ে যাওয়ার" অথবা মানুষের "বাষ্পিভূত হওয়ার" ('unpeopling', অথবা 'Vaporization' অথবা 'extermination' অর্থে) এর চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ আর কি হতে পারে?

গত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) বিভিন্ন সরকারের আমলে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫ শতাংশ হয়েছে ১৯৬৫-৭১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তানী সেনা শাসনামলে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবারের ২০.৬ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩.৬ শতাংশ ঘটেছে ১৯৭৬-৯০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলাদেশে সেনা শাসনামলে ও স্বৈরশাসক পরিচালিত সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রামলে। এ তথ্য নির্দেশ করে যে সেনাশাসন ও স্বৈরাচারী শাসনের সাথে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষতিমাত্রা প্রত্যক্ষভাবেই সম্পর্কিত– বিগত ৪০ বছরে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ৭২ শতাংশ এবং মোট ভূমিচ্যুতির ৮৮ শতাংশই ঘটেছে সেনাশাসন-স্বৈরশাসনামলের ২১ বছরে (১৯৬৫-৭১, ১৯৭৬-৯০)। [১৫]

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তিকরণ ও পরবর্তীতে সেগুলির বেদখল প্রক্রিয়াটি জটিল। এই প্রক্রিয়ার দুই প্রধান নায়ক হলেন - স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও ভূমি অফিস (তহসিল ও এসি ল্যাণ্ড)। সম্পদ দখল হয়েছে প্রধানত পাঁচ ভাবে:

১. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সাথে যোগসাজশে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন (৭২ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
২. ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন (৪৬ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
৩. স্থানীয় প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করেছেন– প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, মাস্তান, জোরপূর্বক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, দেশত্যাগে বাধ্য করা, ইত্যাদি (৩২ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
৪. প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারীদের একজনের মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ শত্রু/অর্পিতকরণের কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৩৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);
৫. স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে ভূসম্পত্তি দখল করেছেন (১৭ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)।

'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টি কোনো অর্থেই হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা নয়। যারা বিষয়টিকে এভাবে দেখাতে চান তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন ও সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করার একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র, যে প্রক্রিয়ায় লুটপাটের ভাগীদার হয় গুটি কয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি/শ্রেণি/গোষ্ঠী। সম্পত্তি হিন্দুর না-কি মুসলমানের না-কি সাঁওতালদের তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। সম্পত্তি সম্পত্তি কি না, কার সম্পত্তি এবং কোন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে বেদখল করা যায় সেগুলিই জোরদখলকারী দুর্বৃত্তদের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ দিক থেকে সমস্যাটি হলো একদিকে (সর্বশেষ ২০০৬-এর মাঠ জরিপভিত্তিক গবেষণা অনুযায়ী) ক্ষতিগ্রস্ত ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার (যারা ২৬ লক্ষ একর ভূমিসহ বহুধরনের সম্পদ খুইয়েছেন) আর অন্যদিকে ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫০ জন ভূমি-দস্যু সম্পদ-জবরদখলকারীর একটি গোষ্ঠী– যারা নিঃসন্দেহে 'রেন্ট-সিকার' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সহচর। কারণ-পরিণাম সম্পর্কের বিচারে এই ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫০ জন জবরদখলকারী দুর্বৃত্তদের ধর্মীয় পরিচিতি আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদি ধরেও নেই যে, এই ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫০ জন জোরদখলকারীর সকলেই মুসলমান নামধারী, সেক্ষেত্রে তারা এ দেশের মোট মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাত্র ০.৪ ভাগ। অর্থাৎ আমাদের দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর ৯৯.৬ ভাগই (যাদের অধিকাংশই দরিদ্র থেকে মধ্যশ্রেণীভুক্ত) অন্যের সম্পদ জোরদখলের সাথে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নন।

উল্লেখ্য যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে দেশের মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন করেছেন এবং যে দেশের মানুষ পাকিস্তানী সামন্ত শাসক-শোষক বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন সে দেশে 'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টিকে যারা হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছেন তাদের সুদূরপ্রসারী হীন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন হতে হবে। অন্যথায়

[১৫] Barkat, Abul. (2014b). A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through th Enemy Property Act and Vested Property Act, পৃ. ২৪-২৬।

স্বাধীনতা ও মুক্তির অন্তর্নিহিত মূল চেতনাটিই বিনষ্ট হয়ে যাবে। অসম্ভব হয়ে পড়বে সমগ্রক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, যা ছাড়া এ দেশের সামগ্রিক টেকসই মানবকল্যাণকামী উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করেছেন তাদের কেউই লুণ্ঠনকালীন সময়ে গ্রামের বা শহরের দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, অধিকাংশই ছিলেন স্থানীয় প্রভাববলয়ের মাতব্বর গোষ্ঠীভুক্ত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তি। অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা তাদের অন্তর্নিহিত চরিত্রের অংশ; সেটাই তাদের ধর্ম এবং সে ধর্মই তারা পালন করেছে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যায় প্রশ্রয়কারী রাষ্ট্রযন্ত্র ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির সাথে তাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ সুস্পষ্টভাবে কাজ করেছে। অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক অবস্থান চমকপ্রদ– তারা সদা-সর্বদা চলমান সরকার ও ক্ষমতার রাজনীতির সহচর।

৩.৪ আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতাঃ ছিটেফোঁটা সংস্কার দিয়ে হবে না

বাংলাদেশ একক জাতি সত্তার রাষ্ট্র নয়। সরকারি হিসেবে এ দেশে জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) ৩২ টি বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে "আদিবাসী মানুষ" হিসেবে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। সেই সাথে আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা ও সংস্কার প্রশ্নে একথা স্বীকার করা উচিত যে তাদের ভূমি-বন মালিকানা বিশেষত "সর্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার" (common property rights) বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত।[১৬]

আদিবাসী মানুষের কাছে ভূমি ও বন মা-তুল্য; তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ভিত্তিও ঐ ভূমি ও বন। কিন্তু আদিবাসী মানুষের ভূমি অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তাও সহজে হরণ-যোগ্য। অন্যের দ্বারা এদের ভূ-সম্পত্তির জবর দখল যথেষ্ট বিস্তৃত। সমতলের সাঁওতালদের ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙালিদের চেয়ে জোর তালে চলে। সাঁওতালদের ৭২ শতাংশ এখন ভূমিহীন। আর পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের অবস্থা আরও খারাপ। গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানি করা বাঙালিদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়িরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল আর আমদানি করা সেটলার বাঙালিদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমলা-প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫ শতাংশ, আর এখন তা মাত্র ৪৭ শতাংশ । শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; শান্তি চুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কোনো ভূমি কমিশন নেই। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের প্রসঙ্গটি কখনও কার্যকরভাবে উত্থাপনই করা হয়নি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস– আদিবাসী মানুষের দৃষ্টিতে আমরা আদিবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা-সমাজ-অর্থনীতি-মূল্যবোধ-সংস্কৃতি-সম্পদ নিয়ে ভাবতে ব্যর্থ হয়েছি। উন্নয়নের যে কোনো মানদণ্ডেই– পাহাড়-সমতল নির্বিশেষে– এ দেশের আদিবাসী মানুষ নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার। হরণ করা হয়েছে আদিবাসী মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, ন্যায় অধিকার, জন্মগত অধিকার, ঐতিহ্যগত অধিকার, প্রথাগত অধিকার, সামাজিক অধিকার ও গোষ্ঠীগত অধিকার। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এ অধিকারহরণসহ বঞ্চনা, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার মাত্রা ও গভীরতা বাড়তেই থাকবে। দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার যত রূপ আছে সবই আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য যা উত্তরোত্তর তীব্রতর হবে।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির ভাষায় আদিবাসী মানুষের ক্রমবর্ধমান অধিকারহরণ ও উদ্ভূত দারিদ্র্য (বহুমাত্রিক– শুধু ক্ষুধার দারিদ্র্য নয়), বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উৎসে আছে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক সিস্টেম গঠনের প্রাথমিক কালপর্বে এক ধরনের কেন্দ্র-প্রান্ত (centre-periphery) সম্পর্ক, যেখানে মুক্তবাজার কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে

[১৬] বিস্তারিত দেখুন, Devasish Roy and Sadeka Halim (2002), "Valuing Village Common in Forestry", Devasish Roy and Sadeka Halim (2004), "Protecting Forest Common through Indigenous Knowledge Systems: Social Innovation for Economic and Ecological Needs in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh"; Shapan Adnan (2004), Migration, Land and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

'প্রান্তকে' শোষণ করে এবং ঐ শোষণে অগ্রাধিকার পায় দুর্বল প্রান্ত।[১৭] আদিবাসী মানুষ ঐ প্রান্তের দুর্বলতম মানুষ। অতএব বিভিন্ন উপায়ে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি জবরদখল পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম। এ প্রক্রিয়ায় প্রান্ত প্রান্তস্থতর হবে– এটা স্বাভাবিক। তবে তা একই সাথে এক মারাত্মক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ। কারণ এ জন্য শেষ পর্যন্ত সমগ্র সমাজকেই অনেক বেশি বিরূপ মূল্য দিতে হবে। বিষয়টি মূলত কাঠামোগত (structural অর্থে)। তবে মানব উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী মানব উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যেও সমস্যার অনেক দূর সমাধান সম্ভব। সেক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষ-উদ্দিষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি হতে হবে স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক বেশি এবং পরিকল্পিত। বিষয়টি রাজনৈতিক। দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে সে রাষ্ট্রকে হতে হবে জনকল্যাণকামী– বহিঃস্থ (excluded) মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

আদিবাসী মানুষের "উন্নয়ন"-এর রাজনৈতিক অর্থনীতি– কিভাবে ভাববো? মূল প্রসঙ্গ যেহেতু আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি সেহেতু আমি উন্নয়ন-এর প্রচলিত সংজ্ঞাগত বিতর্কে না গিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আইন অর্থাৎ সংবিধানের ভাষায় কথা বলতে আগ্রহী। বাংলাদেশের সংবিধান বলছে "*জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক*" [অনুচ্ছেদ ৭(১)]। কিন্তু আদিবাসী মানুষ কি "জনগণ"? ইতিহাস নিরীক্ষণে এমন প্রশ্ন করা সম্ভবত অমূলক হবে না– আদিবাসী মানুষ কি মানুষ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন? সংবিধান অনুযায়ী এর পরের মৌলিক কথাটি হলো "নাগরিক যেই হোক না কেন– তার/তাদের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না"– এ কথা আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য? অর্থাৎ সোজা কথা হলো বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠী অথবা ধর্মগোষ্ঠী অথবা নৃগোষ্ঠী যদি বংশ-পরম্পরা খাদ্য-বঞ্চনা, বাসস্থান-বঞ্চনা, শিক্ষা-বঞ্চনা, স্বাস্থ্য-বঞ্চনা, বস্ত্র-বঞ্চনা, সুযোগ-বঞ্চনা, সম্পত্তির অধিকার-বঞ্চনা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য রক্ষা না করতে পারার বঞ্চনা, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট-বঞ্চনা নিয়ে জীবন চালাতে বাধ্য হন সেক্ষেত্রে এ-কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে ঐ গোষ্ঠীসমূহের জীবন পরিচালন সংবিধানের বিধি মোতাবেক চলছে না।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির ভাষায় এসব বঞ্চনার প্রধান কারণ হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এক ধরনের কেন্দ্র-প্রান্ত (centre-periphery) সম্পর্ক যেখানে কেন্দ্র প্রান্তকে অধিকতর প্রান্তস্থ করার জন্য নিরন্তর কাজ করে-শোষণ করে; যা বৈষম্য বৃদ্ধির রূপমাত্র। অথবা কেন্দ্রের উন্নয়ন গতি হবে প্রান্তের চেয়ে অধিক হারে-অধিক দ্রুত। এসবই ঘটে থাকে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক সিস্টেম গঠনের প্রাথমিক কালপর্বে প্রধানত দুর্বল জনগোষ্ঠীর সম্পদ জোরদখল-বেদখল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ও হুদা, ১৯৮৮)। এক্ষেত্রে মানব-কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে উন্নয়নের সাংবিধানিক মর্মার্থ যাতে ঐ সকল গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত ও প্রতিপালিত হয় তা নিশ্চিত করা। আর বিষয়টি যদি এমন হয় যে বঞ্চনার প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে বঞ্চনা-বৈষম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করা। আর ঐ বঞ্চনা প্রক্রিয়া যদি রাষ্ট্র সৃষ্ট ও রাষ্ট্র পরিতোষিত হয়– তাহলে কি ভাববো? বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়, তবে তা মারাত্মক এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ।

আমার মতে এদেশে আদিবাসী[১৮] জনগোষ্ঠী– পাহাড়ের এবং সমতলের– এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে উল্লিখিত বঞ্চনা-বৈষম্য প্রক্রিয়াটির শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের সময় যখন অমুসলিমদের অনেকেই দেশান্তরিত হতে বাধ্য হন, আর আদিবাসীদের (বিশেষত সমতলের) অনেকেই দেশান্তরিত হতে বাধ্য হলেন। পরবর্তীতে চলমান এ প্রক্রিয়ার গতি বেড়েছে ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। অর্থাৎ প্রক্রিয়ার শুরু আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে যা গত ৫০ বছরে প্রকট হয়েছে। আর এ প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কারণ হলো কেন্দ্রের মুক্তবাজার দর্শন। পাহাড়ি আদিবাসী-পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে

---

[১৭] এ বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণসহ তত্ত্বকাঠামো প্রসঙ্গে দেখুন, Barkat, Abul (2016), "Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh".

[১৮] ইদানিং এদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অথবা উপজাতি বলা হচ্ছে। এ নিয়েও বিতর্ক আছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণে এ গোষ্ঠীকে "আদিবাসী" বলার পক্ষে। বিতর্ক আছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়ে। আমার হিসেবে এসব গোষ্ঠীর সংখ্যা কমপক্ষে ৪৮টি। এদেশে মোট আদিবাসী ২০১৫ সালে (২০১১-এর আদমশুমারি প্রক্ষেপণ করে) হতে পারে বড়জোর ২০ লক্ষ, অথচ আমার হিসবে ঐ সংখ্যা ৪০ লক্ষের কম নয়।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বলা চলে ১৯৫০-এর দশক থেকে যখন পার্বত্য আদিবাসী মানুষের সবচেয়ে উর্বর এক-তৃতীয়াংশ কৃষি ভূমি বিনষ্ট করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলো, আর সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে আনুমানিক একই সময় থেকে তাদের সার্বজনীন-সামাজিক-প্রথাগত মালিকানাধীন জমি-জলা-বন বেদখলের মাধ্যমে। অর্থাৎ আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা-বৈষম্য প্রকটতর হওয়ার ইতিহাস কমপক্ষে ৫০ বছর। সেইসাথে পাহাড়ি-পার্বত্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ-বঞ্চনার দৃষ্টিকটু নতুন এক রূপ দেখা গেছে মধ্য ১৯৭০-এর দশক থেকে– যখন থেকে পরিকল্পিতভাবে "পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং"-এর আওতায় "ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং" প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য– সংখ্যাগুরু আদিবাসী মানুষকে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘুতে রূপান্তরের[১৯] মাধ্যমে আদিবাসী মানুষের জীবন-সম্পদ জমি-জলা-জঙ্গল-এর উপর তাদের জন্মগত, প্রথাগত ও ঐতিহাসিক অধিকার চিরস্থায়ীভাবে হরণ করা। একই প্রক্রিয়া সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে– তবে রূপটি একটু ভিন্ন। সারার্থ অভিন্ন।

উন্নয়ন বলতে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞে "বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ" (inclusion of excluded) বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এ-প্রক্রিয়া আমার মতে, আসলে কখনো শুরুই হয়নি। 'উন্নয়ন' বলতে যদি সাংবিধানিক-অধিকার (constitutional rights) নিশ্চিত করা বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি ন্যায়–অধিকার (justiciable rights) প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি জাতিগত উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়ার কার্যকর রোধ বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের প্রতি সম্মান বুঝায়, উন্নয়ন বলতে যদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্য-বঞ্চনা হ্রাস প্রক্রিয়া বুঝায়, সেক্ষেত্রে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে এখনো পর্যন্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কার্যকর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এবং আমার ধারণা সেটা সচেতনভাবেই করা হয়েছে। কারণ মুক্তবাজারে কেন্দ্রের স্বার্থে প্রান্তকে প্রান্তস্থ করে জিইয়ে রাখা দরকার; মুক্তবাজার দরিদ্র-বান্ধব হয় না, হয় না তা প্রান্তস্থ মানবকল্যাণমুখী; মুক্তবাজার– বৈষম্য-বঞ্চনা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে– আর এসব কারণেই অসমতা-বৈষম্যের জন্য সমাজকে অনেক বিরূপ মূল্য দিতে হয়।[২০]

আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সরকার ২০০৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিন বদলের সনদ "রূপকল্প ২০২১"-এর পক্ষে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে 'মানবিক উন্নয়ন' বিনির্মাণে পূর্ণ ম্যান্ডেট পেয়েছিলো। একই সরকার ২০১৪ সালে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের সুস্পষ্ট রায় হলো মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি নাগাদ অর্থাৎ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র; ২০২১-এর বাংলাদেশ হবে স্বল্প-বৈষম্যের মধ্য আয়ের দেশ; ২০২১-এর বাংলাদেশ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানুষের বাংলাদেশ (যাকে বলে 'ডিজিটাল' বাংলাদেশ)। এ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে দেশের সকল বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত-দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান, তাদের সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করাসহ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা জরুরি। আশার কথা যে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন) আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী ইশতেহার পেশ করেছিল এবং একই দল ২০১৪ সালের যে নির্বাচনী ইশতেহার পেশ করে সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বিষয়টি জরুরি হিসেবেই স্বীকৃত [ইশতেহার ২০০৮, অনুচ্ছেদ ১৮.১, ১৮.২; এবং ইশতেহার ২০১৪, অনুচ্ছেদ ২২.১, ২২.২]। এ-বিষয়ে নির্বাচনী ইশতেহারদ্বয়ে স্পষ্ট যা উল্লেখ ছিলো তা সারণি ৬-এ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে ক্ষমতাসীন সরকার

[১৯] এর ফল শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এমন যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে একসময়ের সংখ্যালঘুরা এখন সংখ্যাগুরু হবার কারণে ভোট দিয়ে বিভিন্ন স্তরে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন। আমার ধারণা ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তত্ত্বটি যাদের মাথা থেকে এসেছিলো তারা অন্যান্য অভিঘাতের সাথে সাথে অন্যায্য এ বিষয়টিও ভেবেছিলেন (দূরদর্শী বটে!!!)।

[২০] বিষয়টির সুদূরপ্রসারি সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য দেখুন, Stiglitz, Joseph. E. 2013. The Price of Inequality, Penguin Books. নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ এ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূলত যা বলেছেন তা এরকম: বাজার অর্থনীতি যেভাবে কাজ করার কথা ছিলো তা পারেনি– বাজার অর্থনীতি ফলপ্রদও (efficiency অর্থে) নয় স্থিতিশীলও (stable অর্থে) নয়; রাজনৈতিক সিস্টেম বাজারের ব্যর্থতাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিস্টেম মূলত অন্যায্য; সমাজে বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য একই সাথে রাজনৈতিক সিস্টেমের কারণ ও পরিণাম; এবং ঐ বৈষম্যই অর্থনৈতিক সিস্টেমের অস্থিতিশীতার (instability অর্থে) কারণ, যেটাই আবার বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ– এভাবেই বাজার অর্থনীতিতে এক দুষ্টচক্র কাজ করে চলেছে।

তার নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক কিছুই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তবে ২০০৮-এ যাদেরকে আদিবাসী বলা হয়েছে ২০১৪-তে তাদেরকে (ক্ষুদ্র) নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং উপজাতি বলা হচ্ছে। এ পরিবর্তন নেহায়েত সংজ্ঞাগত কিনা তা নিয়ে ভাবনা অযৌক্তিক হবে না।

সারণি ৬: ২০০৮ ও ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী মানুষের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি

২০০৮-এর নির্বাচনী ইশতেহার	২০১৪-এর নির্বাচনী ইশতেহার
অনুচ্ছেদ ১৮.১: *ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, **আদিবাসী** ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, **আদিবাসী**, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।* অনুচ্ছেদ ১৮.২: *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, **আদিবাসী** ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।*	অনুচ্ছেদ ২২.১: *সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, **নৃ-জাতিগোষ্ঠী** ও **উপজাতিদের** অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ধর্মীয় ও নৃ-জাতিসত্তাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান এবং তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয়, জীবনধারা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দৃঢ়ভাবে সমুন্নত থাকবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষা করা হবে। সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।* অনুচ্ছেদ ২২.২: *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির অবশিষ্ট অঙ্গীকার ও ধারাসমূহ বাস্তবায়িত করা হবে। পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে এবং তিন পার্বত্য জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলোর সৌন্দর্য সংরক্ষণ করে তোলা হবে। এই তিন জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।* **[২২.১ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে *"সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে আওয়ামী লীগ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে*।]**

আসলে আদিবাসী মানুষ– পাহাড়-সমতল নির্বিশেষে নিরন্তর বঞ্চিত। পার্বত্য হোক আর সমতল হোক– আদিবাসী মানুষ মানুষ হিসেবে উন্নয়নের কোনো মানদণ্ডেই ভালো নেই। জমি-জলা-জঙ্গল-এ আদিবাসী মানুষের মালিকানা বা অভিগম্যতা (সামাজিক, প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত) – এ-মানদণ্ডে আদিবাসী মানুষের হয়েছে অধোগতি। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় শাসন– কোনো কিছুতেই তাদেরকে এখনো মূলধারায়[২১] অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি; করা হয়নি। ১৯৯৭ সালে

[২১] অবশ্য 'মূলধারা' যে কি তা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। মূলধারা যদি জনকল্যাণকামী হয় তাহলে এক কথা, আর যদি তা জোসেফ স্টিগলিজের ধারণার বৈষম্য সৃষ্টিকারী-অসমতা পুনরুৎপাদনকারী মুক্তবাজার হয় তাহলে কথা হবে ভিন্ন। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদিবাসী মানুষকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াটি হয়ে যাবে কেন্দ্রকে শক্তিধর করার জন্য প্রান্তকে প্রান্ততর করা। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এ বিষয়টি নিয়ে সমাজ চিন্তকদের আরো গভীর ভাবনার সুযোগ আছে।

(০২ ডিসেম্বর) 'শান্তিচুক্তি' খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার প্রায় ২০ বছর পরেও এখনও পর্যন্ত পার্বত্য আদিবাসী মানুষের মধ্যে বঞ্চনা- বৈষম্য হ্রাসকারী জনকল্যাণকামী কোনো স্থায়ী উন্নয়নের সুলক্ষণ প্রতিভাত হয়নি।

আদিবাসী মানুষ– মানুষ হিসেবে কেমন আছেন এ-নিয়ে সরকারিভাবে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এমনকি এ দেশে মোট কয়টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী আছে, প্রতি জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা কত এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন মানদণ্ডে তারা কে কেমন আছেন– এসব বিষয়ে সরকারিভাবে প্রকাশিত গ্রহণযোগ্য তেমন কোনো তথ্য নেই। তবে নির্মোহ গবেষণা বলছে আদিবাসী মানুষ ভালো নেই। উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের নিরিখে দেশের মানুষের গড় অবস্থার তুলনায় আদিবাসী মানুষের গড় অবস্থা অনেক খারাপ। শুধু তাই নয়– উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে এমনকি নিম্নগামী প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। এ-প্রসঙ্গে পাহাড়ের ও সমতলের আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণালব্ধ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করা যেতে পারে[২২]। তথ্যসহ বিশ্লেষণসমূহ নিম্নরূপ:

১. সমগ্র বাংলাদেশে যখন নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের (absolute poverty) হার ৪৪ শতাংশ (প্রবন্ধকার কর্তৃক "বাংলাদেশ খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০" এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত; সরাসরি ক্যালরি পরিভোগ পদ্ধতি) তখন একই সময়ে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ আর সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ (ছক ৫)। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের এ-হার কয়েকটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনকি ৭০ শতাংশ অথবা তারচে' বেশি– যাদের মধ্যে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই, চাক, খিয়াং, পানখুয়া এবং বম, আর সমতলের সাওতাল, ওরাও এবং পাহান। আর চরম দারিদ্র্যের (hardcore poverty) হার সমগ্র বাংলাদেশে যখন ২২ শতাংশ তখন তা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ এবং সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ। চরম দারিদ্র্য হারের নিরিখে সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে পাহান (২৮ শতাংশ), পাত্র (২৮ শতাংশ), রাখাইন (২৬.৭ শতাংশ), গারো (২৬.৪ শতাংশ), এবং সাঁওতাল (২৫.১ শতাংশ) (ছক ৫)। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যই হোক আর চরম দারিদ্র্যই হোক– কোনটাই কমছে না আদিবাসী মানুষের। এতো শুধু খাদ্য পরিভোগের মাপকাঠির দারিদ্র্য– দারিদ্র্যের অন্যান্য রূপ হিসেবে নিলে অবস্থা হবে আরো বিপর্যয়কর।

ছক ৫: সমতলের আদিবাসীদের দারিদ্র্যের হার, ২০০৯ (%)

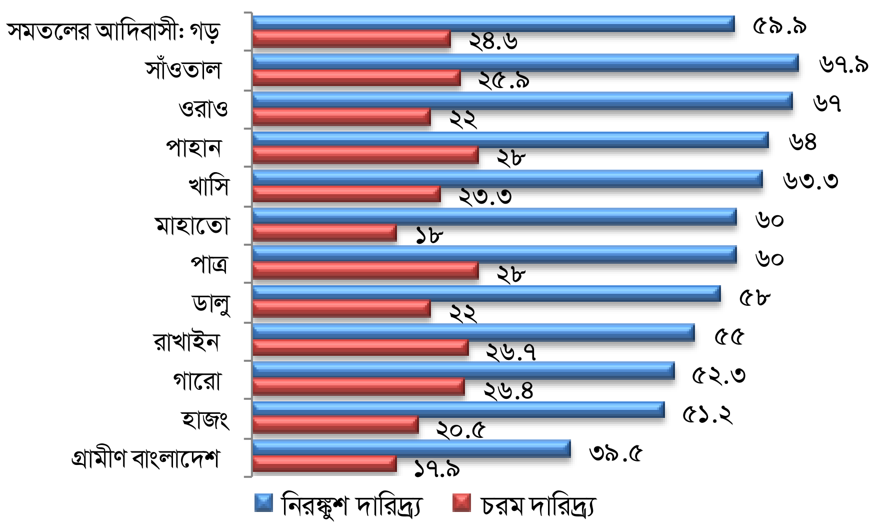

উৎস: Barkat. et al. (2009b), *পৃ.* ২৬৫

[২২] মূল তথ্য উৎসসমূহ নিম্নরূপ: Barkat, Abul. et al (2009c). Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts, CHTDF; Barkat. et. al (2009b). Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh, Barkat. et al (2010b). Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে গত তিরিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি ও ভূমি মালিকানার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে যা কোনো অর্থেই আদিবাসী মানুষের স্বার্থানুকূল নয়। যেমন এ তিরিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) পার্বত্য পাড়ার (গ্রামের) নিয়ন্ত্রণাধীন (পাড়া কর্তৃক ব্যবহারকৃত) ভূমির পরিমাণ কমেছে ৫১ শতাংশ। একই সময়ে মোট জমিতে পাহাড়ি জুম চাষের জমির অংশ ১৯৭৮এর ৭৩ শতাংশ থেকে কমে ২০০৯-এ দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশে। আর একই সময়ে লাঙ্গল চাষের জমি বেড়েছে ১০ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে। জমির মালিকানা ধরনে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হলো সামাজিক (প্রথাগত/ঐতিহ্যগত) মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তর : গত তিরিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) সামাজিক (প্রথাগত/ঐতিহ্যগত) মালিকানার আওতায় জমি মালিকানা কমেছে ৮৩ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশে, আর তার বিপরীতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি বেড়েছে ১৭ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে। অর্থাৎ কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কের আওতায় মুক্তবাজার গ্রাস করেছে আদিবাসীদের ভূ-সম্পত্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি গ্রাসের সর্বশেষ চিত্র দেখি এখন বহুজাতিক কর্পোরেশন-এর তামাক চাষে।

৩. খাগড়াছড়ি জেলায় অভিবাসী বাঙালিদের দ্বারা ব্যাপক হারে ভূমি দখলের কারণে এই অঞ্চলের জমির ব্যবহারের ধরনে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটেছে। রাঙ্গামাটি জেলায় সরকারের বন বিভাগের জন্য যে পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা এই জেলার ভূমি ব্যবহারের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। রাঙ্গামাটি জেলার পাড়াগুলোর আওতায় থাকা প্রায় ৪০শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকারি বন বিভাগ। বান্দরবান জেলার যেসব জমিতে আদিবাসীরা জুম চাষ করতো সেসব জমির একটি বড় অংশ ইজারা (লিজ) দেয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া এখনো চলমান। অর্থাৎ মুক্তবাজারে একদিকে চলছে প্রাকৃতিক বনের তথাকথিত সামাজিক বনায়ন, আর অন্যদিকে সার্বজনীন-সামাজিক-প্রথাগত জমি-জলার বাজারীকরণ-পণ্যায়ন। এসবই আদিবাসী সমাজে বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম।

৪. গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষের পরিমাণ দিন দিন কমেছে পাশাপাশি পাহাড়ি জমিতে বাণিজ্যিক চাষাবাদ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ গত ৩০ বছরে যে হারে কমেছে সেই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বাণিজ্যিক চাষাবাদ। তামাক এবং রাবার চাষ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে বাড়ছে। বাণিজ্যিক চাষাবাদের কারণে প্রাকৃতিক বনভূমি হ্রাসের সাথে সাথে প্রকৃতিতে লালিত বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি-পশু-পাখিসহ জীববৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুক্তবাজারের অধিনস্থ বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুধু আদিবাসী মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করছে না সেই সাথে বিনষ্ট করছে হাজার বছরের জীব-বৈচিত্র যা আদৌ নবায়নযোগ্য নয়।

৫. জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের মালিকানা ও অভিগম্যতা-সংশ্লিষ্ট মানব উন্নয়নবিরোধী এসব পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে সম-স্বার্থবাদী নানা পক্ষ– বন বিভাগ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বসতি গড়ে তোলা বাঙালি অভিবাসী, রোহিঙ্গা ও শান্তি বাহিনী সকলেই এই প্রক্রিয়ায় জড়িত। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমি সংক্রান্ত জটিলতা বহুমাত্রিক হয়ে পড়েছে। জমি ইজারা (লিজ) দেয়ার প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জমি ইজারা দেয়ার কারণে ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠির জমি হারানোর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে ভূমি হারানোর কারণে বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা। লক্ষ্যণীয় যে, আদিবাসীদের সাথে আদি বাঙালিদের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ খুব একটা নেই বললেই চলে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আদি বাঙালিরা বসতী স্থাপনকারী আমদানিকৃত বাঙালি অভিবাসীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। বসতী স্থাপনকারী বাঙালিদের দ্বারা জমি দখল ছাড়াও সরকারি বন বিভাগের ব্যাপক হারে জমি অধিগ্রহণ পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। জীবনধারণের একমাত্র উপায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আদিবাসীরা এখন নিজভূমে পরবাসী। এর ফলে আদিবাসী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির অধোগতি ঘটেছে।

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামে গত তিরিশ বছরে (১৯৭৭-২০০৭) আদিবাসীদের ২২ শতাংশ খানা অন্তত একবার ভূমিচ্যুত অথবা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। খানাপ্রতি গড় ভূমিচ্যুতির পরিমাণ ১১৫ ডেসিমেল। আর

বেদখলকারীদের ৮২ শতাংশই অনাদিবাসী বাঙালি। অর্থাৎ 'পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর আওতায় 'ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং' বেশ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬৭ শতাংশ খানা ভূমিহীন (জমির রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তি মালিকানা অর্থে। এছাড়াও আছে ঐতিহ্যগত-প্রথাগত মালিকানা, এবং সার্বজনীন মালিকানা অধিকার)। আর সমতলের আদিবাসীদের ৬৯ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন। সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে যাদের ভূমিহীনতার মাত্রা অত্যুচ্চ তাদের অন্যতম পাত্র (৯২ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন), পাহান (৮৫ শতাংশ), সাঁওতাল (৭৫ শতাংশ) (দেখুন সারণি ৭)। ভূমিভিত্তিক জীবন কেন্দ্রিক জনসংখ্যার এতবড় অংশ ভূমিহীন রেখে জীবন-সমৃদ্ধির বিবেচনা অমূলক।

সারণি ৭: কার্যত ভূমিহীন ও নিজস্ব বাস্তুভিটাহীন সমতল আদিবাসী খানা

সমতল আদিবাসী গ্রুপ	কার্যত ভূমিহীন* খানা (%)	নিজস্ব বাস্তুভিটাহীন খানা (%)
গারো	৬৬.৭	৫৭.০
হাজং	৬৫.০	৫৬.৬
ওরাও	৫৬.০	৫৬.১
রাখাইন	৬৬.৭	৫৫.৪
ডালু	৬০.০	৫৪.২
খাসি	১২.০**	৪৬.৩
পাত্র	৯২ .০	৪৮.৪
পাহান	৮৫.০	৫১.৯
মাহাতো	২৫.০	৫১.৩
সাঁওতাল	৭৫.০	৫১.৩
মোট (গড়)	**৬৮.৮**	**৫৪.৫**

উৎস: Barkat. et al. (2009b), *পৃ. ২৮০-২৯১।*

* *"কার্যত ভূমিহীন" খানা হলো সেই খানা যার ভিটের জমির বাইরে নিজস্ব মালিকানায় কোনো জমি নেই অথবা সর্বোচ্চ ৫০ ডেসিমেল পর্যন্ত জমি আছে।*

** *খাসি আদিবাসী খানার মালিকানাধীন ভূমির গড় পরিমাণ ২১৯ শতাংশ। এ থেকে বাস্তুভিটার পরিমাণ বাদ দিলে কার্যত ভূমিহীন খাসি আদিবাসী মানুষের খানা হবে শতকরা ১২। খাসি আদিবাসী খানার ভূমি মালিকানার তুলনামূলক আধিক্যের কারণ খাসিদের বসবাস এলাকার পাহাড়ি ভৌগলিক প্রকৃতি। অবশ্য ঐসব পাহাড়ি এলাকায় বাংলাদেশের সমতল এলাকার চেয়ে জমির ব্যবহারিক মূল্য অনেক কম।*

৮. পার্বত্য চট্টগ্রামে গত তিরিশ বছরে (১৯৭৭-২০০৭) মোট ৩৮ শতাংশ আদিবাসী খানা কমপক্ষে একবার তাদের স্থায়ী ঠিকানা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের আগে ১৩ শতাংশ খানার কমপক্ষে ১ জন সদস্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসময়ের জন্য বাড়ি থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির এ এক অভূতপূর্ব অসভ্য উদাহরণ।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিদের ৬২ শতাংশই "ডেমোগ্রাফিক ও পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং"-এর মাধ্যমে গত তিরিশ বছরে (১৯৭৭-২০০৭) পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছেন। পার্বত্য আদিবাসী মানুষকে সংখ্যালঘুতে রূপান্তরের এ এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যাকে অভিবাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতির "কালো অধ্যায়" বলা চলে।

১০. গত তিরিশ বছরে (১৯৭৮-২০০৯) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে আদিবাসী মানুষ যারা তিরিশ বছর আগে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা এখন আর সংখ্যার হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেই (জোর তালে এ পরিবর্তন শুরু হয়েছে ১৯৭৯ সাল থেকে মূল ভূমি থেকে "জনসংখ্যা স্থানান্তর" এর কারণে)– হয়েছেন সংখ্যালঘিষ্ঠ; আর অন্যদিকে আদমশুমারির গণনাতে আদিবাসী

মানুষদের অনেককেই গণনার আওতায় না আনার কারণে গণনাকৃত প্রকাশিত জনসংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যার চেয়ে কম। বিষয়টি গুরত্বপূর্ণ এবং মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। গবেষণায় দেখা যায় যে ২০০১ এর আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ৪ হাজার ৪২৬টি পাড়ার (গ্রাম) মধ্যে ৩১.৩ শতাংশ পাড়ায় জনসংখ্যা গণনাই করা হয়নি। বাদ পড়া পাড়ার জনসংখ্যা গণনা হলে ২০০৯ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা হতো ২৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৪৮ যা আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৪০১। অর্থাৎ আদমশুমারির গণনাকৃত জনসংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যার তুলনায় ৪৪ শতাংশ কম। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠিকে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যার তুলনায় হিসেবে অনেক কম দেখানো হয়েছে। এটা আদিবাসী মানুষ নিয়ে ডেমোগ্রাফিক পলিটিকস-এর নিকৃষ্ট রূপ যা স্পষ্টতই মানব-উন্নয়ন বিরোধী। এবং সম্ভবত মুক্তবাজারের কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কে প্রান্তকে প্রান্তস্থতর করার এটাও অন্যতম পদ্ধতি।

১১. পার্বত্য চট্টগ্রামের মতোই সমতলের আদিবাসীদের বঞ্চনা সূচক (deprivation index) অত্যুচ্চ। এ বঞ্চনা সূচক মান যাদের মধ্যে অতি উচ্চ তাদের অন্যতম হলো পাত্র, সাঁওতাল, পাহান, ওরাও, ডালু, হাজং এবং খাসি (ছক ৬)। এ অতুচ্চ মাত্রার বঞ্চনা সূচক যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তা হলো বঞ্চনার প্রতিটি সূচকেই আদিবাসীদের অবস্থা খারাপ।

ছক ৬: সমতলের আদিবাসীদের বঞ্চনা সূচক *
(স্কেল ০-৮, ০ = সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, ৮ = সবচেয়ে কম বঞ্চিত)

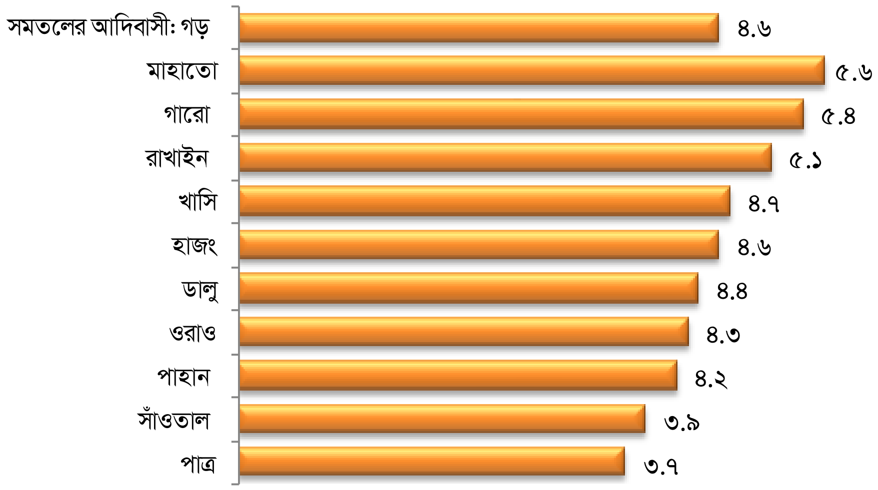

উৎস: Barkat. et al. (2009b), *পৃ.* ২৭৬

* সূচক নির্ধারণের মানদণ্ডসমূহ: একই কক্ষে পাঁচ বা ততোধিক মানুষ বাস করেন না; খানার সকল সদস্যদের রাতে ঘুমানোর চৌকি আছে; খানায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে; তথ্যের উৎসের প্রতি (রেডিও, টিভি, পত্রিকা) খানার অভিগম্যতা আছে; খানার সকল সদস্য সারা বছর তিনবেলা খাবার খান; ৬ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের শিশুরা স্কুলে যায়; সকল শিশু সকল টিকা পেয়েছে; খানার সব সদস্য নিয়মিত আর্সেনিক মুক্ত খাবার পানি খাচ্ছেন।

১২. সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে শুধু ভূমিহীনতাই নয় নিজস্ব মালিকানায় বাস্তুভিটাহীন খানার তুলনামূলক সংখ্যাও অনেক। সমতলের আদিবাসীদের প্রায় ৫৫ শতাংশ খানার নিজস্ব মালিকানায় বাস্তুভিটা নেই। এ হার যাদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি তাদের অন্যতম গারো (৫৭ শতাংশ), হাজং (৫৬.৬ শতাংশ), ওরাও (৫৬.১ শতাংশ), রাখাইন (৫৫.৪ শতাংশ) এবং ডালু (৫৪.২ শতাংশ) (সারণি ৭ দেখুন)।

১৩. সমতলের ১০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠি গত তিরিশ বছরে মোট ভূমি হারিয়েছেন (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজ ভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ) ৬ লক্ষ ৭ হাজার বিঘা, যার বর্তমান বাজার মূল্য হবে আনুমানিক ৯ হাজার ৪৩ কোটি টাকা (যে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ সরকারের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৪ শতাংশের সমান)। আদিবাসী মানুষ ভূমি হারালেন– পেলো কে? এসব ভূমির ৯০ শতাংশই বেদখল করেছে অনাদিবাসী জোরদখলকারী বাঙালিরা, আবার তাদের সংখ্যাও বেশি নয়। এরা

হলেন মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈষম্য সৃষ্টিকারী এজেন্ট যারা অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বাহক শ্রেণিভুক্ত।

১৪. খানায় বিদ্যুতের অভিগম্যতাকে বলা হয়ে থাকে মানুষকে আলোকিত করার মাধ্যম। এক্ষেত্রেও পার্বত্য-সমতল নির্বিশেষে আদিবাসী মানুষ অনেক পেছনে। যেমন বাংলাদেশে গ্রামীণ খানার ৪০ শতাংশে বিদ্যুত আছে, সেক্ষেত্রে সমতলের আদিবাসীদের বিদ্যুতায়িত খানার গড় মাত্র ২০ শতাংশ। আর পাহান, ডালু, হাজং, ওরাও, পাত্র ও সাঁওতালদের খানায় বিদ্যুৎ নেই বললেই চলে (৫ শতাংশের নিচে; দেখুন ছক ৭)। অর্থাৎ আদিবাসী মানুষকে বিদ্যুৎ দিয়ে আলোকিত (enlightened অর্থে) না করাটাই সম্ভবত বেশ পরিকল্পিত একটি প্রয়াস। কারণ খানায় বিদ্যুৎ অর্থ শুধু আলো নয়– তা বিদ্যুৎ-মধ্যস্থতাকারী ইলেকট্রনিক মাধ্যম দিয়ে মানুষকে আলোকিত করাও।

ছক ৭: সমতলের আদিবাসীদের খানায় বিদ্যুতায়ন হার, ২০০৯(%)

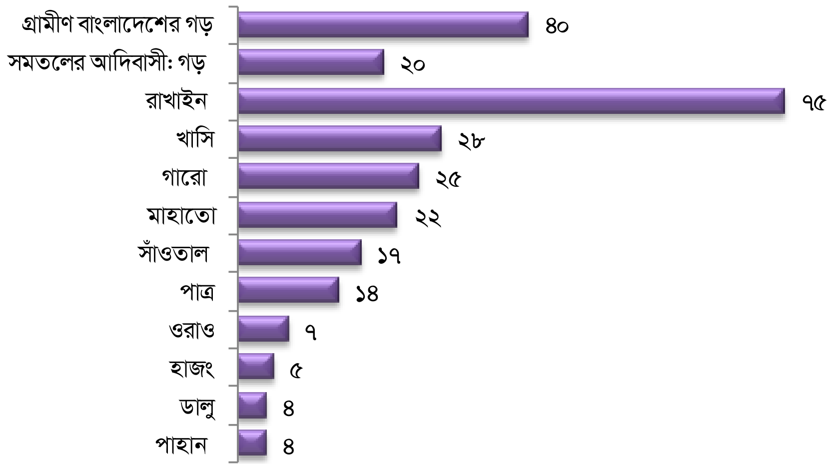

উৎস: Barkat. et al. (2009b), *পৃ.* ২৭০

১৫. আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন (empowerment) অবস্থা কেমন? ছক ৮-এ দেখা যায় সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষমতায়ন স্কোর যাদের মধ্যে স্বল্পমাত্রায় তাদের অন্যতম হলো: পাত্র (০-৯ স্কেলে ৪.৪), পাহান (৪.৫), হাজং (৪.৭), মাহাতো (৪.৭), ওরাও (৫)। আর নারীর ক্ষমতায়ন স্তর যাদের মধ্যে বেশ উঁচুতে তাদের মধ্যে আছে রাখাইন (৮.০), খাসি (৭.৩), এবং গারো (৬.৮)। উল্লেখ্য আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন স্তরের সাথে একদিকে সম্পর্কিত তাদের সামাজিক ইতিহাস-ঐতিহ্য-জীবন পরিচালন পদ্ধতি, আর অন্যদিকে একথাও ঠিক যে যাদের মধ্যে এ স্কোর কম তারা আসলেই পিছিয়ে আছেন।

ছক ৮: সমতলের আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন স্কোর
(স্কেল ০-৯ . ০ = সর্বনিম্ন . ৯= সর্বোচ্চ)

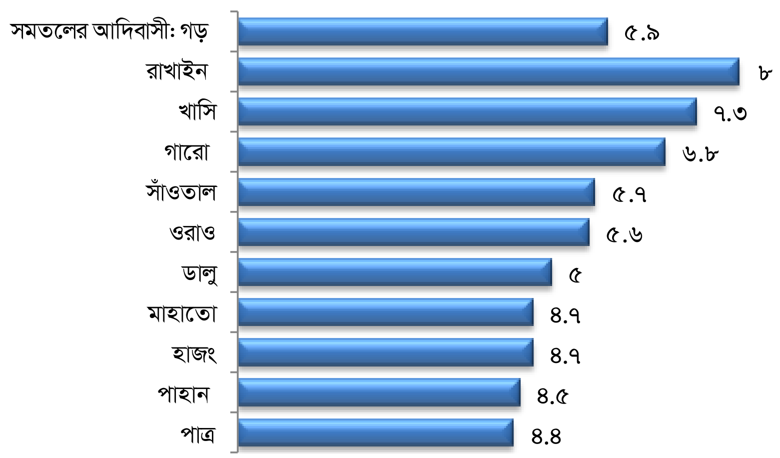

উৎস: Barkat. et al. (2009b), *পৃ.* ২৭২

১৬. আদিবাসী মানুষ রাষ্ট্র-সরকার-জীবন-জীবিকা ও সংশ্লিষ্ট অধিকার নিয়ে কতদূর সচেতন? প্রায় ১৬টি মানদণ্ড ব্যবহার করে সমতলের আদিবাসী মানুষের সচেতনায়নতা মাত্রা (conscientization score) বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে (দেখুন ছক ৯)। দেখা যাচ্ছে যে ০-১৭ স্কেলে (যেখানে ০ = একদমই সচেতন নন, আর ১৭= পূর্ণ সচেতন) সমতলের আদিবাসীদের গড় সচেতনায়নতা স্কোর ১০.৭, যেখানে সর্বনিম্নে আছেন পাহান (৮.২), ডালু (৯.৬), ওরাও (৯.৯), সাঁওতাল (১০.১); আর তুলনামূলক উপরের দিকে আছেন রাখাইন (১৩.৪), খাসি (১২.৮), পাত্র ১২.৩)।

ছক ৯: সমতলের আদিবাসীদের সচেতনায়নতা* স্কোর
(conscientization score)
(স্কেল ০-১৭; ০ = সর্বনিম্ন, ১৭ = সর্বোচ্চ)

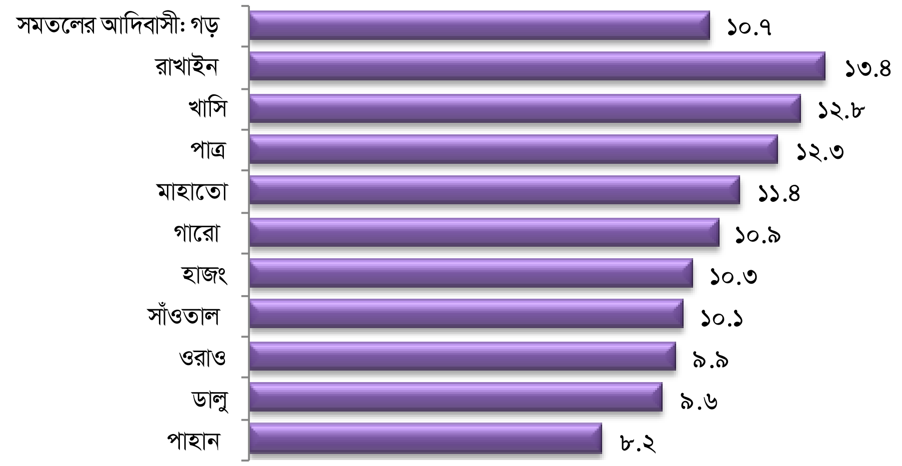

উৎস: Barkat, Abul. et al. (2009b), *পৃ.* ২৭৭

* চেতনায়নের নির্দেশকগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিজিএফ কার্ড পাবার অধিকার, আকস্মিক দুর্ঘটনায় ত্রাণ পাবার অধিকার, স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে শস্যবীজ পাবার অধিকার, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে দ্রব্য ও সেবার দাম নাগরিকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, রাষ্ট্র কর্তৃক মেয়েদের উপবৃত্তি দেয়া, স্থানীয় সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার, মা ও শিশুদের টিকা নেয়ার অধিকার, কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ভোট দেয়ার অধিকার, খাস জমি/জলা বরাদ্দ পাবার অধিকার, রাষ্ট্র কর্তৃক আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের কোটা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসী কোটা, ছেলেদের বিয়ের আইনি বয়স ২১ বছর, মেয়েদের বিয়ের আইনি বয়স ১৮ বছর, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (পুলিশ, বিজিবি, আনসার, ভিডিপি ইত্যাদি) দায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার ও সঙ্ঘ/সংস্থা ইত্যাদি গঠনের অধিকার।

১৭. আদিবাসী মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট মানুষ। সমতলের আদিবাসী মানুষ তাদের নিজেদের মত বা ধারণানুযায়ী বিগত ১০ বছরের জীবন-সমৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি নিয়ে যা বলেছেন তা দিয়েই কিছুটা হলেও এর প্রমাণ মেলে। মোট ৯টি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ব্যবহার করে আদিবাসী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি (বিগত ১০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন, ১৯৯৮-২০০৮)-র স্কোর বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, যা ছক ১০-এ দেখানো হয়েছে। স্কোর-এর range ০-৩৬, যেখানে ০ = সর্বনিম্ন জীবন-সমৃদ্ধি মান, আর ৩৬ = সর্বোচ্চ জীবন-সমৃদ্ধি মান। দেখা যাচ্ছে যে সমতলের আদিবাসীদের মতে ১৯৯৮ সালে তাদের জীবন-সমৃদ্ধির গড় স্কোর ছিল ১৩.৬ যা তাদেরই মতে ২০০৮-এ ২১-এ পৌঁছেছে (যেখানে সর্বোচ্চ মান ৩৬)। বিশ্লেষণে তিনটি বিষয় আপাত স্পষ্ট: (১) দশ বছরে সমতলের আদিবাসীদের কোন গ্রুপেরই জীবন-সমৃদ্ধিতে তেমন কোন উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন হয়নি, (২) রাখাইনদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে, (৩) গড় পরিবর্তনে অনেক পিছিয়ে আছে পাহান, পাত্র, ডালু ও হাজং।

ছক ১০: সমতলের আদিবাসীদের জীবন-সমৃদ্ধি (Well-being)* স্কোর এর গতিপ্রকৃতি (স্কেল ০-৩৬; ০ = সর্বনিম্ন, ৩৬ = সর্বোচ্চ)

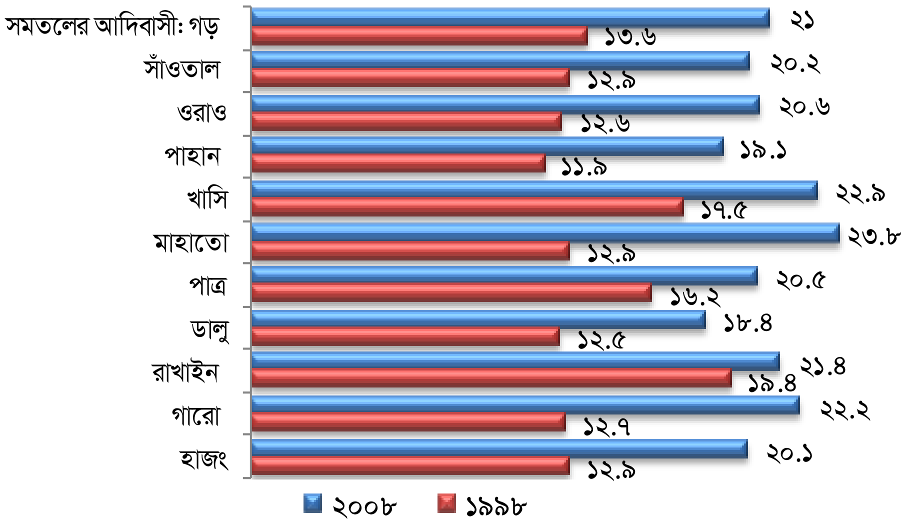

উৎস: Barkat. et al. (2009b), *পৃ. ২৭৯*

** জীবন-সমৃদ্ধির মানদণ্ড নিরূপণ হয়েছে তাদের নিজেদের ধারণাগত পরিবর্তন দিয়ে যার মধ্যে আছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খানার সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, নিরাপত্তাবোধ।*

এর পরেও যে আদিবাসী মানুষ বলছেন যে তারা আগের চেয়ে একটু ভাল আছেন তার প্রধান কারণ আমার মতে কয়েকটি: (১) আদিবাসী মানুষ সরল, (২) আদিবাসী মানুষ অল্পে তুষ্ট, (৩) আদিবাসী মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন, (৪) আদিবাসী মানুষ মানসিকভাবেই মেনে নিয়েছেন যে বর্তমান কাঠামোতে এরচেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে না। আর এ মেনে নেয়াটা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতারই ফল।

তাহলে যা দাঁড়ালো তা হলো এরকম যে বাংলাদেশ একক জাতি সত্তার রাষ্ট্র নয়। সরকারি হিসেবে এ-দেশে জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) অর্থাৎ ১৬ কোটি মানুষের দেশে আনুমানিক ২৫ লক্ষ মানুষ ২৭ টি বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। আর আমার হিসেবে ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা হবে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ আর সুনির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠী সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৪৯টি।[২৩] কিন্তু আরো গুরুতর বিষয় হলো– দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে "আদিবাসী মানুষ" হিসেবে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। আর এ-কথাও সত্য যে নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে "এক-শতাংশ-মানসিকতা" (আদিবাসী স্বার্থবিরোধী মানসিকতা) বেশ প্রবল। সেই সাথে আদিবাসী মানুষের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকতা ও সংস্কার প্রশ্নে একথা স্বীকার করা উচিত যে তাদের ভূমি-বন মালিকানা বিশেষত "সর্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার" (common property rights) বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনও যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত। আদিবাসী মানুষের কাছে ভূমি ও বন মা-তুল্য; তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ভিত্তিও ঐ ভূমি ও বন। কিন্তু আদিবাসী মানুষের ভূমি-অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তাও সহজে হরণযোগ্য। অন্যের দ্বারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূ-সম্পত্তির জবর দখল যথেষ্ট বিস্তৃত।

আদিবাসী মানুষ– পাহাড় সমতল নির্বিশেষে– বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে ভূমি ও বন থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু কারণ-প্রক্রিয়া-পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরেও বিভিন্ন কারণ আরো একবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে (যদিও বিভিন্ন কারণে সময়ভিত্তিক উচ্ছেদের হিসেবপত্তর দেয়া দুঃষ্কর)। এসবের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে: প্রথমে ১৯৪৭ সালে দেশান্তর, তারপরে অনেকবার, যেমন ১৯৬৪-

[২৩] এসব হিসেবপত্তর নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul (2016), Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh.

র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় (মূলতঃ সমতল আদিবাসী অঞ্চলে) জোরপূর্বক দেশান্তরের কারণে ভেঙে পড়া অর্থনীতি; ১৯৫০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই হ্রদ নির্মাণ; ১৯৬৪-র পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কার শত্রুসম্পত্তি আইন যা পরবর্তীতে অর্পিতসম্পত্তি আইন খ্যাত; তারপর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে দেশান্তর পরবর্তীতে আরো অনেকবার জোরপূর্বক দেশান্তর ও ভূ-সম্পত্তি দখল; ১৯৭৫ পরবর্তী (যদি আগেও ছিলো) পরিকল্পিত "ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং" বা পপুলেশন ট্রান্সফার; ভূমিদস্যুচক্রের জাল দলিল; ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদ; ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ও ব্যবহৃত ভূমিকে আদিবাসীদের না জানিয়েই রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণাসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাস হিসেবে ঘোষণা; আদিবাসীদের মতামত না নিয়েই আদিবাসী জমি-বনে জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক ও অবকাশ কেন্দ্র নির্মাণ এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্প ঘোষণা; উচ্ছেদ নোটিশ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি; জমি-জমা সংক্রান্ত আইন-কানুন, খাজনা, খারিজ ইত্যাদি সম্পর্কে আদিবাসী মানুষের অজ্ঞতা; প্রজাসত্ত্ব আইন বাস্তবায়ন না হওয়া; জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট ভূমি-অফিসে আদিবাসী কর্মকর্তা না থাকা; সরকারি ভূমি অফিসের বহুমাত্রিক দুর্নীতি এবং আদিবাসী মানুষ বিরোধী মনোভাব; ভূমি জরিপে দুর্নীতি ও ঘুষ এবং না দিলে জমি খাসকরণ; আইনের আশ্রয় না পাওয়া এমনকি মামলায় জয় হলেও জমির দখল না পাওয়া; ভূমি মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ইত্যাদি [২৪]।

সমতলের আদিবাসীদের ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙালিদের চেয়ে অনেক জোর তালে চলে। পাত্রদের ৯২ শতাংশ, পাহানদের ৮৫ শতাংশ আর সাঁওতালদের ৭৫ শতাংশ খানা এখনও কার্যত ভূমিহীন। আর পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের অবস্থা অনুরূপ; ক্ষেত্র বিশেষে আরো খারাপ। গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানি করা বাঙালিদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়িরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল আর সেটলার বাঙালিদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমলা-প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যায় আদিবাসী মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫ শতাংশ, আর এখন তা মাত্র ৪৭ শতাংশ। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; শান্তি চুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কার্যকর কোনো ভূমি কমিশন থেকেও নেই বললেই চলে। কমিশনের মূল কাজ হবার কথা ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির কিন্তু কমিশন জোর দিচ্ছে ভূমি জরিপের উপর। আর সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের প্রসঙ্গটি কখনও কার্যকরীভাবে উত্থাপনই করা হয়নি।

প্রান্তিকতার (marginalization অর্থে) যত ধরনের মাত্রা জানা আছে তার সবটাই আমাদের দেশের আদিবাসী মানুষের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে বিভিন্ন রূপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেশ রীতিতে পরিণত হয়েছে। আর এসবে সরকার-রাষ্ট্র কখনও প্রভাবক কখনও নির্বিকার।

জমি-জলা-জঙ্গল থেকে আদিবাসী মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়লে বিপর্যয় অনিবার্য– একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আদিবাসী মানুষের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এক কথায় "নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি"। আদিবাসী মানুষের দৃষ্টিতে আদিবাসীদের জীবন নিয়ে ভাবতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

পাহাড়-সমতল নির্বিশেষে জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের জন্মগত অধিকার, ঐতিহ্যগত অধিকার, সামাজিক অধিকার, গোষ্ঠীগত অধিকার ও ন্যায় অধিকার হরণ করা হয়েছে। এ হরণের মূলে আছে মুক্তবাজার দর্শন যা দরিদ্র-বান্ধব নয়, যা আদিবাসী-বান্ধব নয়। এ অধিকার হরণ– রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে মানব প্রগতির যেকোনো মানদণ্ডে আদিবাসী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়নি। আদিবাসী মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকার। নিরন্তর এ বিচ্ছিন্নতা আদিবাসী মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা-অবিশ্বাস-অনাস্থা-বিদ্বেষ-ঘৃণাবোধ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে ও করছে। পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর লক্ষ্যে এ অধিকার হরণ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পদ্ধতিগত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ যা কিছু মনুষ্য অধিকার হরণের মাধ্যম হতে পারে সব কিছুই। পার্বত্য-সমতল নির্বিশেষে আদিবাসী মানুষের জীবন নিয়ে এদেশে যা হয়েছে তা সাধারণ কোনো ঐতিহাসিক বিচ্যুতি নয়– তা মনুষ্য সৃষ্ট ঐতিহাসিক বিপর্যয়। দীর্ঘস্থায়ী ও

[২৪] বিস্তারিত দেখুনঃ বারকাত ও অন্যান্য (২০০৯ক). Barkat. et al. (2009b); Barkat and Roy (2004); Barkat (2015a); Barkat. et al. (2000); Barkat. et al. (2008a); Barkat. et al. (2008b); Barkat. et al. (2014b); Barkat. et al. (2001); Raihan, et al. (2009); Barkat. et al. (2009b); Barkat. et al. (2009c); (2010b); Adnan and Dastidar (2011).

জটিল ভূমি সমস্যা সমাধানে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ("শান্তি চুক্তি") নিঃসন্দেহে আশা জাগানিয়া ঐতিহাসিক চুক্তি। এ চুক্তির মূল চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে পার্বত্য আদিবাসী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি ঘটার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবার কথা ছিলো। এ প্রক্রিয়া বিগত প্রায় ২০ বছরে তেমন ত্বরান্বিত হয়নি। আর সমতলের আদিবাসীরা নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার। এসব লক্ষণ শুভ নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গেছে যে এ ধরনের ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে ১০-২০ বছরের মধ্যেই আবারো প্রাক-চুক্তি পর্যায়ের বিপর্যয় পুনরাবৃত্ত হয় এবং ক্ষতি মাত্রা প্রাক-চুক্তি পর্যায়ের চেয়ে বেশি হয়। ইতিহাসের এ সত্য বিবেচনায় রেখে সকল পক্ষকে চুক্তির মূল চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এগোনোই সর্বোত্তম পথ। অন্য কোনো বিকল্প খোঁজার অবকাশ নেই। বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। দায়িত্বটা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

৩.৫ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতা— জল-জলায় অধিকার নেই

এ দেশে ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য জল-জলা সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৎস্যখাতে সার্বক্ষণিক সরাসরি কাজ করছে ১২ লক্ষ মানুষ, আর ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ কাজ করছে ঋতুভিত্তিক-সাময়িক। ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর ৮০ লক্ষই দরিদ্র। সদস্য-সদস্যাসহ মৎস্যজীবী পরিবারে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যাদের অর্ধেকের বেশি যেকোনো মাপকাঠিতেই দরিদ্র এবং যাদের দৈনন্দিন আয়-প্রবাহ অতিমাত্রায় অনিশ্চিত।

মৎস্যজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতার প্রধান কারণ হলো জল-জলায় আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত (legal and justiciable) অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। জলমহাল লিজ-চুক্তি আর্দ্র ভূমিতে তাদের আইনগত অধিকার ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম। আইনগতভাবেই জলমহাল লিজ নেবার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের-সমবায় অগ্রাধিকার পাবার কথা। বাস্তব অবস্থা উল্টো। সম্পদবান দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি-কারচুপির মাধ্যমে জলমহাল লিজ নেন এবং/অথবা লিজ গ্রহণকারীর কাছে কমিশন নেন (নিয়মিত অথবা এককালীন)। জলমহালের অকশন মূল্য সাধারণত খুবই কম। ফলশ্রুতিতে সম্পদবান লিজ-হোল্ডার প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শুধু বঞ্চিতই করছেন না তাদের শ্রমের ফসল (জলা-খাজনা) আত্মসাৎ করছেন; মুনাফার হার এক্ষেত্রে ১০০০% পর্যন্ত হতে পারে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দরিদ্র মৎস্যজীবীর দারিদ্র হ্রাস (দূরীকরণ আরো পরের কথা) অসম্ভব। একথা আরো সত্য এ জন্য যে দেশের মোট ১২ লক্ষ একর খাস-জলাভুমির মাত্র ৫ শতাংশ এ পর্যন্ত দরিদ্রদের মধ্যে লিজ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ খাস-জলাভূমি জল-দস্যুরা বেদখল-জোরদখল করে আছে।

বাংলাদেশে মাছ বাজারজাতকরণ এক জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় থাকে কমপক্ষে ৬ ধাপের মধ্যস্বত্বভোগী। এসব মধ্যস্বত্বভোগীরা 'ভ্যালু চেইনে' তেমন কোনো ভ্যালু সংযোজন করে না অথচ অতি মুনাফার লোভে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শোষণ করার মাধ্যমে তাদের আয়-রোজগার কমাতে ভূমিকা রাখে।

এদেশে এখন ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীদের মাত্র ১০ শতাংশ এ পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে জল-জলা সমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্যজীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি সম্ভব যদি দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে "জাল যার জলা তার"। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টি সংক্রান্ত দারিদ্র্য (income-food-nutrition poverty) যথেষ্ট মাত্রায় দূরীকরণ হতে পারে। এসবই মৎস্য খাতে ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত ৪৩ লক্ষ হেক্টর জলাভূমি ও ৭১০ কিলোমিটার উপকূল। বছরে আনুমানিক প্রায় ১৭-১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মাছ রপ্তানি থেকে রপ্তানি আয় ১৯৮৬-৮৭ সালে ১ কোটি ৬ লক্ষ ডলার থেকে ইদানিং কালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা একচুলও কমেনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও যে দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাস নাও হতে পারে— এ দেশের চলমান মৎস্য খাত তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এ

সমীকরণ পরিবর্তন সম্ভব– যখন মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে আর সেই সাথে মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। বিষয়টি জল-জলায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মালিকানা ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত । বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই জলা সংস্কারের (aquarian reform)।

৩.৬ লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ– দারিদ্র্য ও বঞ্চনার এক নতুন মাত্রা

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প-বাণিজ্য বিষয়টি এ দেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এদেশে ১৫-২০ লক্ষ দরিদ্র শ্রমজীবী লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিষয়ক আলোচনা-বিশ্লেষণ ও নীতি-কৌশল নির্ধারণে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের প্রায় ৩২ লক্ষ হেক্টর উপকূল অঞ্চলের ২০ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য। এসব অঞ্চলের বিস্তৃতি ১৫ জেলার ৯৮টি উপজেলায়। দেশের মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার ২ কোটির বসবাস উপকূলীয় অঞ্চলে। উপকূলের মোট জমির ১০ লক্ষ হেক্টর এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রত্যেক দিন জোয়ার-ভাটার আওতায় থাকে; শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বাড়ে; জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণে উপকূল অঞ্চলে ফলনের তীব্রতা স্বল্প।

বন্যা আর লবণ পানি থেকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ (পোল্ডারসহ) কাজ শুরু হয় ষাটের দশকে। পোল্ডার নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দুর্বৃত্তদের ঠেলায় তা সম্ভব হয়নি। আসলে যা হয়েছে তা হলো: অভ্যন্তরীণ (দেশজ) মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট; ফসল উৎপাদন ব্যাহত; চিংড়িসহ মিঠাপানি ও লবণ পানির প্রাকৃতিক মৎস্য বিচরণ ও বংশ-বিস্তার ক্ষেত্রসমূহ সঙ্কুচিত হওয়া ইত্যাদি। আর সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোল্ডারে চিংড়ি চাষ বাড়লো। পোল্ডারে জলাবদ্ধতার কারণেও চিংড়ি চাষ বাড়লো। সেইসাথে ১৯৮০-৮৫-এর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিংড়ি চাষকে যখন শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেয়া হলো সাথে সাথে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা পাবার কারণে উচ্চ মুনাফার ব্যবসায় রূপান্তরিত হলো। অতএব একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ (১৯৬০-৭০ দশকে), আর অন্যদিকে ভাল-মন্দ বিচার না করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫ সালে) চিংড়ি চাষকে শিল্পের মর্যাদা দেয়ার ফলে ঘটে গেলো অঘটন– "উন্নয়ন"-এর সামাজিক অভিঘাত বিবেচনা না করার ফলে সৃষ্টি হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সীমাহীন দুর্দশার বিস্তৃত ক্ষেত্র। সালওয়ারি চিংড়ি মাছের উৎপাদন প্রবণতা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে: ১৯৭৯-৮০ সালে এ দেশে মাত্র ২০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হতো, ১৯৮৮-৮৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৮ হাজার হেক্টরে, ১৯৯৩-৯৪-এ ১ লক্ষ ৩৮ হাজারে হেক্টরে, আর ১৯৯৬-৯৭-এ ৪ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টরে।

সুপার মুনাফার লোভে নির্বিচারে চিংড়ি চাষের আওতায় চলে এসেছে অতীতের সু-ফসলী ধানী জমিসহ উপকূলীয় এলাকার বাঁধের ভিতরের আর বাইরের সকল জমি, লবণ উৎপাদনের জমি, পরিত্যক্ত ও প্রান্তীয় জমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, আর্দ্রভূমি ইত্যাদি। অপরিকল্পিত ও বিস্ফোরণমূলক এ প্রবৃদ্ধি নির্বিচারে ধ্বংস করেছে প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ সবকিছুই; পানির গুণগত মান লোপ পেয়েছে; জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়েছে; ঔষধি গাছ-গাছলার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে (এদেশে এখনও ৩২ ভাগ মানুষ ঔষধি গাছ-গাছলাভিত্তিক চিকিৎসা নির্ভর); গাছ-পালা ফলমূল-এর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে; লবণাক্ততা বিনষ্ট করেছে জমির প্রাকৃতিক গুণাবলী; হাঁস-মুরগীসহ গো-সম্পদ বিলুপ্ত প্রায় (এসবই প্রায় ২ কোটি মানুষের খাদ্যাভাসে প্রোটিন ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

চিংড়ি চাষের অঞ্চলে জমির লবণাক্ততা দানাদার ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করেছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণের উপস্থিতি ফলন-বৃদ্ধি চক্রের উপর মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে। শুধুমাত্র একর প্রতি ফলনই হ্রাস পায়নি, এমনও হয়েছে যখন পুরো ফসলই মারগেছে। ফারাক্কা বাঁধ আর সেই সাথে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় কৃষি জমিতে অম্লের (acid)

পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, লবণ-পানির জলাবদ্ধতা বেড়েছে এবং কাদামাটির প্রাকৃতিক গুণাগুণ লোপ পেয়েছে। এসবই ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা পড়েছে হুমকির মুখে। শুধু তাই নয়, চিংড়ি চাষের ফলে উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পানির ভৌত, রাসায়নিক, ও জৈবিক গুণাবলী এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা বিপন্ন করছে হাজার বছরের প্রকৃতি ও পরিবেশ। এ বিপন্নতা অনবায়নযোগ্য সম্পদ বিনষ্ট করছে। এ বিপন্নতা বংশ-পরম্পরা। এ বিপন্নতার ঋণাত্মক অভিঘাত দীর্ঘমেয়াদি হতে বাধ্য।

চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা প্রকৃতই দুর্বৃত্ত– দোর্দণ্ড প্রভাবশালী (ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী)। চিংড়ি ঘের-এর জমির মালিকানা হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন অথবা সরকারি মালিকানাধীন (খাস)। ব্যক্তিমালিকানাধীন ঘেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত মালিক প্রান্তিক অথবা ক্ষুদ্র কৃষক, যার কাছ থেকে ঘেরের প্রভাবশালী মালিক চুক্তিভিত্তিতে জমি নিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এসব চুক্তি করতে বাধ্য হন। বৃহৎ চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা একই সময় অনেকের সাথে ২-১২ বছরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হন। বাৎসরিক চুক্তির আর্থিক মূল্যমান (হারি =contract money for leasing of land) একর প্রতি ২ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা। আধা-নিবিড় (semi-intensive) চিংড়ি ঘেরে গড়ে একজন চিংড়ি মালিক বছরে একর প্রতি পাচ্ছেন ২ লক্ষ টাকা কিন্তু জমির মালিক (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক) পাচ্ছেন মাত্র ২ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা। অনেক ক্ষেত্রেই ঘের মালিক কর্তৃক বিভিন্ন কায়দায় জোরপূর্বক অন্যের (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের) জমি দখল এবং/অথবা নাম মাত্র হারি (চুক্তির অর্থ) প্রদান না করার কারণে সংঘর্ষ-সংঘাত, মামলা-মোকদ্দমার সূচনা ঘটে। একদিকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহন আর অন্যদিকে আয়-মূলক কর্মকাণ্ড থেকে অনুপস্থিত হতে বাধ্য হবার কারণে দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার পরিচালনে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ভূমিহীনতার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে সম্পদ হারানোর প্রক্রিয়া– এসব মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন। নিজ মালিকানাধীন জমির উপর আইন সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক হতে বাধ্য হচ্ছেন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক। এ লড়াইয়ে ঘের মালিকেরা প্রায়শই সশস্ত্র-পেশীশক্তি ব্যবহার করেন, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ থানা-পুলিশ কোর্ট-এর উপর তাদের প্রভাব সীমাহীন। এমনকি প্রশাসনে পোস্টিং-ট্রান্সফারও তাদেরই হাতে। এ প্রক্রিয়ায় খুন-জখম-গুম-এর শিকার হচ্ছেন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং এ অন্যায় প্রতিবাদকারী ব্যক্তি ও সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। অনেকেই এ প্রক্রিয়ায় নিজ এলাকা ত্যাগ করে দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষুদ্র মালিকেরা যখন জমির ঋতু-ভিত্তিক লিজ দেন (অথবা দিতে বাধ্য হন; জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত) তখন লিজ পরবর্তী কয়েকমাসে কৃষিতে ধান উৎপাদনের চেষ্টা করলেও জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাসের ফলে ফলন তেমনটি পান না।

সরকারি মালিকানার খাস জমিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের বিষয়টি জাল-জোচ্চুরি-দুর্নীতিতে ভরপুর। এক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন প্রশাসনের অন্য সবার সাথে আঁতাত করে চিংড়ি ঘের মালিকদের কাছে উৎকোচ নিয়ে খাস কৃষি জমির শ্রেণি পরিবর্তন (class change of khas land) করে থাকেন– কৃষি খাস জমি হয়ে যায় খাস জলা যা চিংড়ি চাষের জন্য লিজ পেয়ে যান সম্পদবান-প্রতাপশালী দুর্বৃত্ত ঘের মালিক; আবার ক্ষেত্র বিশেষে ঐ অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে জাল দলিল করে ঘের মালিক বনে যান খাস জলা-জমির "খাস মালিক।" অর্থাৎ অভিনব এসব পন্থা কার্যকরী হবার ফলে খাস জলা-জমির আইনি মালিক যাদের হবার কথা সেসব ভূমিহীন, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ সরাসরিভাবেই খাস জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হন। দরিদ্র মানুষ তার অধিকার নিশ্চিত করার এ লড়াইয়ে নামলে খুন-জখম হন, মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন– দরিদ্রদের ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের এও এক অভিনব পন্থা। সেই সাথে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হিমায়িত কারখানায় আছে স্বল্পমজুরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশু শ্রম, শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা (fungal, intestinal, respiratory diseases)। সুতরাং চিংড়ি-চাষ ও বাণিজ্য একদিকে যেমন গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত ঘের মালিক, শিল্পপতি ও রপ্তানিকারকের আর্থিক ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে, আর অন্যদিকে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জলা-জমির উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকাকে করে তোলে অনিশ্চিত।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ইতোমধ্যে উপকূলীয় ব্যাপক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাসহ ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার সকল শর্ত বিলুপ্ত করেছে। সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, ভূমি সংক্রান্ত অফিস-আদালত, সন্ত্রাসী বাহিনী ঘের মালিকদের পক্ষ নেবার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের দুকোটি মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ওভার ইনভয়েসিং (যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে) ও আণ্ডার ইনভয়েসিং (রপ্তানির ক্ষেত্রে)-এর মাধ্যমে কাস্টমস ও আয়কর বিভাগ আর ঋণসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক-বীমাসহ জলাধার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির ফাঁদে ফেলেছে– যারা দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই অতিমাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ এ দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই কাজ করছে।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে অর্থনীতি বিষয়ক সরকারি ও দাতাগোষ্ঠির পরামর্শদাতারা প্রায়ই বাহ্যিকতা (externalities)-র বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যান। সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চিংড়ির উৎপাদন ব্যয়ে যেসব ব্যয়-অভিঘাত কোনোভাবেই দেখানো হয় না সেগুলো হলো: উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি অবকাঠামোর বিলুপ্তি, উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতি, বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ও অভিঘাত, পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতি, ক্ষুধার্ত-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, পানির দূষণ, নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয় এবং হারীর দলিলে ন্যায়-অধিকার লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন। এসব ব্যয়ের কোনোটিই কল্পিত নয়, সবই বাস্তব। এসব ব্যয়ভার বহন করছেন ও করবেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম। সুতরাং বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষকে "বাজে অর্থনীতি" অথবা "bad economics" বলাই যথেষ্ট হবে না, তা পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতি (ecologically suicidal), সামাজিকভাবে নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক (socially impoverishing), এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যায় (economically unjust)। এসবই লোনা পানি সম্পদে কৃষি-জলা সংস্কারের যুক্তিকে শক্ত পায়ে দাঁড় করায়।

৩.৭ ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্ব: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্যতম ক্ষেত্র

আমাদের দেশে ভাগচাষ ও বর্গাপ্রথার বয়স আমাদের লিখিত ইতিহাসের বয়সের সমান। সেই হিন্দু-আমল থেকে মুসলিম আমল পেরিয়ে অদ্যাবধি বিরাজমান। আর আমাদের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতি সাহিত্য সবধরনের ভাগ-বর্গা চাষকে প্রায়শ সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের নির্দেশক হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে এটা পুঁজিবাদের লক্ষণ- এ কথাও বলা হয়। তবে আমাদের ভাগচাষ-বর্গাচাষ যে অন্তবর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের বাহক হতে পারে এ কথা খুব একটা স্বীকৃত নয়।[২৫]

বাংলাদেশের কৃষিতে বর্গাবাজার বিস্তৃত। ভাগচাষ-বর্গাচাষ-এর বিস্তৃতি ক্রমবর্ধমান। প্রবণতা এরকম যে, একদিকে অপেক্ষাকৃত ধনী ও মাঝারী কৃষক অধিক হারে কৃষি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফামুখী অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছেন (মূলতঃ আর্থিক ও মানব পুঁজির উপর কর্তৃত্বের কারণে), আর অন্যদিকে ভূমিহীন-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষকরা বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে কৃষিকাজেই থেকে যাচ্ছেন এবং উত্তরোত্তর অধিকহারে ভাগচাষ-বর্গাচাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন (যে কাজে তেমন কোনো তুলনামূলক আর্থিক লাভই নেই)। বিষয়টির গুরুত্বের কারণেই তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের আগে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতির কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন জরুরি। শুধু সম্পূর্ণ বিষয়টির নিহিতার্থ বুঝবার স্বার্থেই নয় বরঞ্চ যেহেতু আমরা ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ সবধরনের ভোগদখল স্বত্বকে এ দেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করি সেহেতু এ প্রয়োজনবোধ।

এটা প্রায় সর্বসম্মত ধারণা যে, বর্গা প্রথা সামন্তবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই সামন্তবাদ বলতে পশ্চিম ইউরোপীয় ইতিহাসে "ফিউডাল ব্যবস্থা" বলে যা পরিচিত তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অথচ ইউরোপীয় ফিউডাল ব্যবস্থার অনুরূপ কোনো উৎপাদন পদ্ধতি বা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে এখনও কায়েম আছে অথবা ইতিহাসের কোনোকালেই ছিল এই প্রস্তাবটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ বিতর্কে প্রবেশ না করে বাংলাদেশে প্রচলিত ভাগচাষ-বর্গা প্রথাসমূহের ধরন, তাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদন সম্পর্কগুলোর সারসত্তা

[২৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, বারকাত, আবুল (১৯৮৪), "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান", *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র জার্নাল*, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

বিচার এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে তারা কোন উৎপাদন ব্যবস্থার বাহক হিসেবে কাজ করছে-এসকল পদ্ধতিগত বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

ভাগচাষির সাথে মালিকের (জমির) সম্পর্কটা বহুমাত্রিক: ভূমি-কেন্দ্রিক, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেন্দ্রিক, বিভিন্ন ধরনের খাজনা ব্যবস্থাকেন্দ্রিক, ধার-দেনাকেন্দ্রিক। আবার ক্ষেত্র বিশেষে মালিক-ভাগচাষি সম্পর্কসমূহ বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতি বহির্ভূত রূপ পরিগ্রহ করে। উপরোক্ত সম্পর্কসমূহ কি পরিমাণে শর্তভিত্তিক, কি পরিমাণেই বা প্রথাভিত্তিক; কতটা অর্থনৈতিক, কতটাই বা অর্থনীতি বহির্ভূত- এই বিচারটা উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে ভাগ প্রথার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভাগীদার-মালিক সম্পর্কসমূহ ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত, আবার ক্ষেত্র বিশেষে সে সম্পর্ক নমনীয় নির্ভরশীলতার রূপ ধারণ করে। ভাগচাষিও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের-ভূমিহীন। স্ব-ভূমি ভাগচাষিও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের-অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ।

বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেওয়া বা মালিকের জন্য বেগার খাটা এবং শ্রম খাজনা (labour rent) – সমার্থক নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রম খাজনার প্রচলন কখনও ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জমিদারী আমলেও প্রজারা খাজনা হিসেবে যা দিত তা হলো শস্যের নির্দিষ্ট কোনো অংশ- শ্রমের নির্দিষ্ট কোনো অংশ নয়। আবার শ্রম খাজনা নেই বলে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক নেই সেটাও ঠিক নয়। ইউরোপে খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেও দাস উৎপাদন পদ্ধতির নির্ধারকতার আমলে রোমক সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে জমি চাষ হত দাস সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়; খাজনাদাতার সম্পর্কের ভিত্তিতে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে খাজনা ছিল শস্য বা অর্থ খাজনা - শ্রম খাজনা নয়। ঐ দাস উৎপাদন পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে যখন সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপ নিল তখন কিছু চাষি রয়েই গেল, যারা শস্য ও অর্থে খাজনা দিত এবং ভূমি খণ্ডের সাথে সম্পূর্ণরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত নয় (অন্যরা সার্ফে রূপান্তরিত হল)। আবার সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপ নিচ্ছে সেই উত্তরণকালে শস্য খাজনা (দ্রব্য খাজনা) বিবর্তিত হয়ে অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে শস্য খাজনায়ও রকমফের আছে। "কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের শস্য খাজনা হিসাবে দেওয়া" এবং "উৎপাদিত শস্যের কোনো এক পূর্বনির্ধারিত অংশ খাজনা হিসেবে দেওয়া"[২৬] – সমার্থক নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে খাজনা ব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি (হালের বলদ, সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ) সরবরাহের দৃষ্টিকোণ থেকে মালিক-ভাগচাষি সম্পর্ক হতে পারে সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী এবং অন্তর্বর্তীকালীন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে উৎপাদক অথবা ভূ-স্বামী। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদক ভূ-স্বামী সম্পর্কটা সামন্তবাদের লক্ষণ, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের। কিন্তু উৎপাদক ভূ-স্বামী যখন ঐসব উপকরণাদির সরবরাহ ভাগাভাগি করে নেয় তখন উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃতি কি হবে? যদি সাময়িক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক– বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে ভাগচাষ হবে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের বাহক।

ভাগচাষি যখন "নির্ভেজাল" ভাগচাষি নয় অর্থাৎ একাধারে জমির মালিক ও ভাগচাষি– এটা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সম্পর্কের পরিচায়ক। এই প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের দিকে গমনের লক্ষণ, কিন্তু এখনও রক্ত-মাংসে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক নয়। আবার উল্লিখিত "ভাগচাষি মালিক" বা "স্ব-ভূমি-ভাগচাষি" যখন উৎপাদনের উপায়টুকু (মূলতঃ জমি) হারিয়ে মজুরি শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিভূ।

বর্গা প্রথায় একদিকে বৃহৎ ও ধনী মালিক আর অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র বর্গাদার অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বর্গা মালিক যখন সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহের কারণে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তের একাংশ পুঁজিতে

---

[২৬] শস্য ভাগাভাগির অনুপাতটা (মালিক ও ভাগচাষির মধ্যে) কেমন হবে সেটা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন- জমির উর্বরতা; দুপক্ষের আপেক্ষিক আর্থিক ক্ষমতা; উৎপাদন ব্যয় বহনের ভাগাভাগি সম্পর্ক শর্ত; মূল শস্যের সাথে সহজাত অন্যান্য দ্রব্যের (যেমন খড়) বিভাজন জনিত শর্ত; উৎপাদিত শস্যের ধরন ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগাভাগির অনুপাতটা ১ ঃ ১ অথবা ২ ঃ ১ কেন এবং কেনই বা আবহমানকাল ধরে অনুরূপ অনুপাত বজায় থাকছে- বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এখনও বিতর্কের পর্যায়ে অবস্থান করছে।

রূপান্তর করছেন এবং অন্যাংশ দিয়ে সুদের ব্যবসা (উৎপাদন বিমুখ) অথবা অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ড করছেন (বাংলাদেশে এটা অত্যন্ত বাস্তব ও বিস্তৃত ঘটনা) সে অবস্থায় বর্গা মালিক-বর্গাদার সম্পর্কটি যেমন আদৌ সামন্তবাদী নয়, ঠিক তেমনি তা সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কও নয়। এটা নিঃসন্দেহে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

ভাগচাষি জমির মালিকের উপর নির্ভরশীল হতে পারে নানাভাবে। ভাগীদার যখন একাধিক মালিকের সাথে ভাগচুক্তি করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত; যখন সে (ভাগীদার) মালিক ছাড়া আর কারও কাছে শস্য বিক্রি করতে পারে না (ভাগীদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফসল ওঠার সাথে সাথে শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়); ভাগীদার যখন মালিকের ফাইফরমায়েস শুনতে এবং বেগার খাটতে বাধ্য হয়– এগুলো সবই মালিকের উপর ভাগীদারের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতার প্রকাশ। এসবের কোনোটাই পুঁজিবাদের নয়– প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

ভাগচাষ-বর্গা প্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে তাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদন সম্পর্কগুলো নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তার বিভিন্ন সারবস্তু সারণি ৮-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮: ভাগচাষ-বর্গা প্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সারসত্তা

প্রক্রিয়া	কোন উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণ?		
	সামন্তবাদী	অন্তবর্তীকালীন	পুঁজিবাদী
১. ভাগ প্রথাধীন জমির সাথে মালিকের সম্পর্ক:			
ক. মালিকের জন্য জমি পুঁজি নয়; সে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে না; আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত পুঁজি নয়, সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিমুখভাবে অপচয় করে। মালিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী নয়।	√	√	
খ. মালিকের জন্য জমি পুঁজি; সে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তকে পুঁজি হিসেবে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে; পুঁজি ও উৎপাদন অবিরাম সম্প্রসারিত হয়। মালিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী (সমস্ত জমি ভাগে দিয়ে দেয়ার উদাহরণ বৃহৎ জমির মালিকদের মধ্যে এখন পূর্বাপেক্ষা স্বল্প)।			√
গ. মালিকের জন্য জমি-পুঁজি; আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তের একাংশকে পুঁজি হিসেবে এবং অন্য অংশকে ব্যাপকভাবে সুদি কারবারে এবং/অথবা অকৃষিজ কাজে বিনিয়োগ করে।		√	
২. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের সরবরাহকারী:			
ক. উৎপাদক	√		
খ. ভূ-স্বামী			√
গ. উৎপাদক ও ভূ-স্বামী ভাগাভাগি করে নেয়		√	
৩. খাজনা পদ্ধতি:			
ক. শ্রম খাজনা – বিনা মজুরিতে শ্রম দান। ভাগচাষি তার শ্রম সময়ের একাংশ কাজ করে মালিকের জমিতে যার পুরো ফসল মালিকের প্রাপ্য, আর অন্য অংশ কাজ করে মালিক প্রদত্ত জমিতে যার পুরো বা আংশিক ফসল উৎপাদকের (ইউরোপের সার্ফ-লর্ড সম্পর্ক: ফ্রান্সের করভি ইত্যাদি)। চাষি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধা।	√		
খ. শস্য খাজনা			
– পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের শস্য- খাজনা হিসেবে দেয়া হয়	√	√	
– উৎপাদিত শস্যের কোনো এক পূর্ব নির্ধারিত অংশ খাজনা হিসেবে দেয়া হয়		√	
গ. অর্থ খাজনা		√	√
৪. ভাগচাষির মালিকানা:			
ক. ভূমিহীন ভাগচাষির কোনো ভূমি মালিকানা নেই	√		
খ. স্ব-ভূমি ভাগচাষি:			
– কিছু জমির মালিক এবং আবাদে মূলতঃ পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে		√	√
– জমির মালিক, অনেক জমি বর্গা নেয় এবং আবাদে মূলতঃ মজুরি শ্রমিক নিয়োগ করে।			√

উৎস: বারকাত, আবুল (১৯৮৪) (√ = যে উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণ)

ভাগচাষি যত দরিদ্র, ধার-দেনার প্রয়োজন তার তত বেশি। তার প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ-সুবিধা সীমিত। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো, ঋণের শর্ত ও নিয়মসমূহের কারণে দরিদ্র ভাগচাষি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগঠিত উৎসের ঋণ নিতে অক্ষম। মহাজনী ধারও পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে নিঃস্ব এবং বন্ধক রাখার মত কিছু তার নেই। এমতাবস্থায় দরিদ্র চাষির ঋণ প্রাপ্তির একমাত্র উৎস জমির মালিক। আর মালিক ঋণ দেবে কারণ সে জানে যে ভাগচাষি পালাবে না, ঋণ পেলে সে (ভাগচাষি) মালিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে এবং ধার শোধ পদ্ধতিটিও অত্যন্ত সরল (ফসল ভাগাভাগির সময় শোধের অংশ বা ধারের সুদ ভাগীদারের ফসলের ভাগ থেকে কেটে রাখলেই হলো)।

আমাদের দেশে ভাগচাষিরা যেসকল ধার-দেনা পেয়ে থাকে তা হতে পারে তিন রকমের (সুদের হার বিভিন্ন): খোরাকি ধার, আপদকালীন ধার এবং উৎপাদনশীল ধার। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধার যে আকারেই দেয়া হোক না কেন তা পরিশোধিত হয় উৎপাদিত শস্যের মাধ্যমে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানে)। খোরাকি ধার সবচেয়ে বিস্তৃত ও নিয়মিত ধার। ভাগচাষি তার ভাগের ফসলে বছরের পুরো পারিবারিক খরচ মেটাতে অক্ষম। কিনে খাওয়ার সঙ্গতিও তার নেই। সুতরাং মালিকের কাছে ফসল ধার নেয় (অকালে) এবং ফসল উঠলে শোধ দিয়ে দেয় (বিভিন্ন শর্তে সুদের হার দাঁড়ায় বাৎসরিক ২৫ শতাংশ থেকে ৩০০ শতাংশে)।

আপদকালীন ধার নেয়া হয়ে থাকে বিশেষ উপলক্ষে যেমন, বিয়ে-শাদী, অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে। এক্ষেত্রে মালিকের কাছ থেকে ধার নেয়া হতে পারে হয় ফসলে নয়তো অর্থে। তবে পরিশোধিত হয় ফসলে। উৎপাদনশীল ধার আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নতুন প্রক্রিয়া। এই ধার দেয়া হয় চাষের খরচ মেটানোর জন্য এবং এটাকে ধার হিসেবে না দেখে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণে মালিকের অংশ হিসেবেও দেখা সম্ভব। এ ধরনের ধার দেয়া হয় অর্থে নয়, কৃষিজ ইনপুটে (সার, বীজ, সেচ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি) এবং পরিশোধিত হয় ফসলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধারদাতা ধার প্রাপকের সম্পর্কটা আদৌ সামন্তবাদী সম্পর্ক নয়, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরা ভাগচাষি-মালিক সম্পর্কে ধার-দেনার প্রশ্নে প্রায়ই একটি বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দেন না। বিষয়টি হলো সুদহীন ধার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সুদহীন ধার বিদ্যমান। কেন তা বিরাজ করছে, সেটা কিসের লক্ষণ? এ বিষয়ে একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। তা হলো যে গরুর দুধ দুয়ে গোয়ালা বড়লোক হয় সে কি কখনও ঐ গরু মেরে ফেলবে? নিশ্চয়ই নয়। অনুরূপ অর্থে একদিকে ভাগীদারের শ্রমশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ তারই সৃষ্ট উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করার পূর্বশর্তটিকে বাঁচিয়ে রাখা, অন্যদিকে ঋণ গ্রহীতাকে কেনা গোলাম করে রাখা। আর যেহেতু মালিক ছাড়া অন্য কারো কাছে সে ধার পেতে পারে না, তাই গ্রামীণ দ্বন্দ্বে সে সহজে মালিকের বিপক্ষে যেতে পারে না। এমতাবস্থায় মালিক সুদহীন ধার দেবে না কেন? উপরন্তু ভাগচাষি যদি সম্পত্তিহীন চাষি হয়ে থাকে তাহলে তাকে বিনা সুদে ধার দেয়ার বিপক্ষে যুক্তি কোথায়? আর যার বিক্রির মত কিছু আছে (শ্রমশক্তি ছাড়াও) তাকে সুদহীন ধার দেবে কেন? ইতোপূর্বে উল্লিখিত ২৫ শতাংশ থেকে ৩০০ শতাংশ হারে বাৎসরিক সুদের ধার দেয়া হবে শেষোক্ত গ্রুপের ভাগচাষিদের। কারণ সুদি ধারই হলো সেই অন্যতম পদ্ধতি যার সাহায্যে শেষোক্ত গ্রুপের ভাগচাষিদেরকে দ্রুত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতির উৎপাদন সম্পর্কের পরিচায়ক হিসেবে একই গ্রামে কেউ চড়া সুদে, কেউ বিনাসুদে ধার পেতে পারে– এই দুই প্রথার সহাবস্থান আদৌ বিচিত্র নয়।

মহাজনের কাছে ভাগচাষির দায়গ্রস্ততা ভাগচাষের ক্রমবিকাশে ব্যাপক বিস্তৃত প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে যখন মহাজনের কাছে দায়গ্রস্ততার কারণে কৃষককে মহাজনের ভাগচাষিতে রূপান্তরিত হতে হচ্ছে তখন উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে পুঁজিবাদের জন্ম হচ্ছে বলা যায় না। এ ধরনের প্রক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করে মার্কস তার "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি– ১৮৫৭-১৮৫৯" তে যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হলো "শেষোক্তটা এখনও পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার কবলে পড়েনি।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ব্যতিরেকেই পুঁজির শোষণ বর্তমান। এটা সে ধরনের মহাজনী, যখন উৎপাদনের উপর পুঁজি শুধু আনুষ্ঠানিকভাবেই পুঁজি। এটা প্রাক-বুর্জোয়া ধরনের উৎপাদনের আধিপত্য"।[২৭]

সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের ভাগচাষ-বর্গা চাষ প্রথা (ও তার বিবর্তন) পশ্চিমী ভাগচাষ প্রথা থেকে ভিন্নতর। আমাদের ভাগচাষে যেভাবে পুঁজিবাদের জন্য আবাদি জমি মুক্ত হচ্ছে সেটা উৎপাদকের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং বর্তমান মালিকানা সম্পর্ক কাঠামোর অধীনে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের জন্মদানে প্রায় অপারগ। এ দৃষ্টিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বড়জোর নিকৃষ্ট পথে রক্ষণশীল পুঁজিবাদী (conservative capitalism) বিবর্তনের ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ভাগচাষ-বর্গা প্রথা আলোচনা থেকে পদ্ধতিগত দিক থেকে যেসব উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য গবেষকদের যে সকল সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদান দরকার (যা আমার জানা মতে এখনও অনুপস্থিত এবং দুএকটি যাও আছে তার মান ও যথার্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে) তা হলো: ভাগ প্রথায় প্রচলিত উৎপাদন ভাগাভাগির বিভিন্ন অনুপাত; একই গ্রামে একাধিক রকমের ভাগ প্রথার অস্তিত্ব; কৃষির খরচ ভাগাভাগির বিভিন্ন প্রথা; বিভিন্ন উপাদানের খরচ ভাগাভাগির প্রচলন; শস্য ভাগাভাগি ও খরচ ভাগাভাগির পারস্পরিক সম্পর্ক; ভাগ প্রথায় খড়ের বিভাজন; ধান ছাড়া অন্য শস্যের বিভাজন অনুপাত; উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে ভাগ প্রথার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য; ভাগ প্রথার অন্যান্য শর্ত (শর্তের মেয়াদ কোন শস্য উৎপাদন হবে এবং উৎপাদিত ফসল কোথায় ঝাড়াই, ভাগাভাগি হবে ইত্যাদির ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত দেবে); বর্গা– জোত, নিজ-জোত ও মিশ্র জোতের উৎপাদনশীলতা; মালিকের ওপর ভাগীদারের নির্ভরশীলতা; মালিক ও ভাগিদারের মধ্যে ঋণের সম্পর্ক; উৎপাদনের জন্য কৃষিজ ইনপুটের উৎস (বাজার থেকে ক্রয় করা হয়, না-কি খামার থেকে সংরক্ষিত); বর্গাজমির মালিকদের অর্থনৈতিক আচরণ; বর্গা প্রথার গুরুত্ব হ্রাস বা বৃদ্ধি।

আমাদের কৃষিতে ভাগচাষ-বর্গাচাষ ক্রমবর্ধমান। আর ভাগচাষি-বর্গাচাষিরা প্রধানত দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে গত প্রায় ২০ বছরে (১৯৮৭-২০০৪) চার ধরনের[২৮] কৃষকদের মধ্যে মালিক-চাষি এবং মালিক-বর্গাচাষির অনুপাত হ্রাস পেয়েছে আর অন্যদিকে খাঁটি-বর্গাচাষি এবং বর্গাচাষি-মালিক-এর অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৮)। গত ২০ বছরের প্রবণতা দেখাচ্ছে যে মোট কৃষি খামারের সংখ্যার নিরিখে খাঁটি বর্গাচাষি খামার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ শতাংশ থেকে প্রায় ২৮ শতাংশে, আর (খাঁটি) মালিক-চাষি খামার হ্রাস পেয়েছে ৫৬ শতাংশ থেকে ৪২ শতাংশে। পাশাপাশি বর্গাচাষি-মালিক খামার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে, আর মালিক-বর্গাচাষি খামার হ্রাস পেয়েছে ১৬ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশে। শুধু খামারের আনুপাতিক হারেই নয় মোট চাষকৃত জমির নিরিখেও বর্গাচাষের আওতায় জমির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এক্ষেত্রে গত ২০ বছরের প্রবণতা দেখাচ্ছে যে মোট আবাদকৃত জমির পরিমাণের নিরিখে খাঁটি- বর্গাচাষির চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে, আর (খাঁটি) মালিক-চাষির চাষের আওতায় জমি হ্রাস পেয়েছে ৫৮ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশে। পাশাপাশি বর্গাচাষি-মালিক খামারের চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে, আর মালিক-বর্গাচাষি খামারের চাষের আওতায় জমি হ্রাস পেয়েছে ২০ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশে। অর্থাৎ জমি চাষের ধরন যে বদলাচ্ছে এবং অধিকহারে বর্গামুখী হচ্ছে– একথা অনস্বীকার্য।

বর্গা-চাষ সংশ্লিষ্ট গত ২০ বছরের উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব: (১) খাঁটি-বর্গাচাষ বাড়ছে আর খাঁটি মালিক-চাষ কমছে, (২) মুখ্যত বর্গাচাষ (অর্থাৎ যৌথভাবে খাঁটি-বর্গাচাষ ও বর্গাচাষি-মালিক) বাড়ছে– ২০ বছরে বৃদ্ধি-খামারের অনুপাতে ২৮ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশে, আর

[২৭] Marx, Karl. Economic Manuscripts of 1857-59 in Pre-Capitalist Socio-Economic Formations.

[২৮] চার ধরনের বর্গে বিভাজিত কৃষকদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ: (১) খাঁটি বর্গাচাষি– যাদের নিজেদের কোনো জমি নেই, যে জমি তারা চাষ করে তা অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেয়া, (২) বর্গাচাষি-মালিক– যাদের চাষকৃত মোট জমির অর্ধেকের বেশি অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেয়া, আর অবশিষ্টাংশ নিজের জমি, (৩) মালিক-বর্গাচাষি– যাদের চাষকৃত মোট জমির অর্ধেকের বেশি নিজের জমি, আর অবশিষ্টাংশ বর্গা নেয়া, (৪) মালিক চাষি– যাদের চাষকৃত সবটুকুই নিজ মালিকানাধীন জমি (বিস্তারিত দেখুন, আবদুল বায়েস ও মাহবুব হোসেন ২০০৭)।

চাষকৃত জমির পরিমাণের অনুপাত বৃদ্ধি ২২ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে। আর এ মুখ্যত বর্গাচাষিরাই গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং বর্গাচাষ তাদের জীবিকা কৌশলের প্রধান মাধ্যম, (৩) যে হারে ধনী ও মাঝারি কৃষকরা ক্রমাগতভাবে জমি-চাষ ছেড়ে অধিকতর মুনাফামুখী অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকছেন তার ফলে ভবিষ্যতে একদিকে যেমন অনুপস্থিত-ভূমি মালিক এবং/অথবা (খাঁটি) মালিক-চাষ হ্রাস পাবে তেমনি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের চাষ ব্যবস্থা যা ব্যাপক দরিদ্র কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে আদৌ লাভজনক নয়। আর অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কৃষি উৎপাদনে এসবের প্রভাব হবে ঋণাত্মক। অথবা সম্ভাব্য যে রূপান্তর ঘটবে তাতে উৎপাদন বাড়বে কিন্তু উৎপাদক উত্তরোত্তর নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকবে। আর যদি তাই হয় তাহলে কৃষিতে সামাজিক শ্রেণিগত অস্থিরতা বাড়বে এবং রোধ না করা গেলে স্বাভাবিক নিয়মেই তা কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

সারণি ৯: বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় জমি চাষ ও চাষকৃত জমি

জমি চাষ ব্যবস্থা	খামারের অনুপাত (শতাংশ)		মোট চাষকৃত জমির অংশ (শতাংশ)	
	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪
শুধু/খাঁটি বর্গাচাষি	১৩.৬	২৭.৬	৬.৭	১৯.৩
বর্গাচাষি-মালিক	১৪.৪	১৮.০	৫.৩	২১.১
মালিক-বর্গাচাষি	১৫.৭	১২.৭	১৯.৮	১৬.১
(খাঁটি) মালিক-চাষি	৫৬.৩	৪১.৭	৫৮.২	৪৩.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ বায়েস, আবদুল ও মাহবুব হোসেন (২০০৭), গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি-জীবন জীবিকার পরিবর্তন আলোচনা, পৃ. ৭০

উল্লেখ্য যে, এখন বাংলাদেশের গ্রামে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষিরাই কিন্তু ৮০ শতাংশ জমি চাষ করেন; বর্গায় দেয়া জমির হিস্যা এখন মোট আবাদকৃত জমির ৩২ শতাংশ (২০ বছর আগে ছিল ১২ শতাংশ) একই সময়ে বর্গায় নেয়া জমির হিস্যা ৪০ শতাংশ (২০ বছর আগে ছিল ২৩ শতাংশ); দরিদ্র চাষিদের ৬৫ শতাংশ এখন জমি বর্গা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে বিগত ৪০ বছরে কৃষিতে সনাতনি ভাগচাষ-এর বিপরীতে বেড়েছে "বিপ্রতীপ বর্গা"– বেড়েছে বছরে চুক্তিতে এবং নগদ অর্থে বর্গা প্রথার প্রচলন। সুতরাং বিভিন্ন প্রতিকূল শর্তে ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগ-দখলস্বত্বের বিস্তৃতি প্রবণতা, সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকের জীবন-মান পরিবর্তন না হওয়া (অথবা অধোগতি), এবং ধনী-মাঝারি কৃষকের জমি চাষে ক্রমাগত অনাগ্রহ– এ সবই বর্গা চাষ সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দৃঢ়তর করে। বর্গাচাষ সংক্রান্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে নতুন অনেক ভাবনাই ভাবা যেতে পারে তবে এ মুহূর্তে যা বিবেচনায় আনা যুক্তিযুক্ত তা হলো ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইনের আওতাধীন বর্গাচাষির বর্গাস্বত্ব বাধ্যতামূলক করা; সেই সাথে পশ্চিম বাংলার "অপারেশন বর্গা" ধাঁচের সংস্কারের বিষয়াদি আমাদের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা। ভাগ-বর্গাচাষকেন্দ্রিক এ সংস্কারে অন্যান্যের মধ্যে অন্তত দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরিঃ (১) সংস্কার যেন দরিদ্র-বান্ধব হয়, এবং (২) সংস্কার যেন বর্গাদার কর্তৃক চাষকৃত জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

৩.৮ নারীর ক্ষমতায়ন, জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনে সীমিত, বাস্তবে অনুপস্থিত

"নারীর অধিকার" সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মৌলিক এবং অগ্রাধিকারযোগ্য শুধু এ কারণেই নয় যে তারা জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ। বিষয়টি নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ অন্যান্য যে কোনো মানদণ্ডেই মৌলিক এবং অগ্রাধিকারযোগ্য।

পিতৃতান্ত্রিক সামন্তমানসিকতার সমাজে তো বটেই তথাকথিত উন্নত পুঁজিবাদী সমাজেও নারী মাত্রই বঞ্চিত; আর দরিদ্র নারী দ্বিগুণ বঞ্চিত– বহুমাত্রিক তাদের বঞ্চনা। এ সব বহুমাত্রিক বঞ্চনা (সম্পত্তিতে অধিকারহীনতাসহ)

সম্পর্কে বলার আগে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুধাবনে এ দেশের নারীর সংখ্যাতাত্ত্বিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট নারী-জনসংখ্যা ৮ কোটি যারা ৩ কোটি ২০ লক্ষ খানায় বাস করেন, যার মধ্যে ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ নারী ২ কোটি ৬৫ লক্ষ দরিদ্র খানার অধিবাসী আর আর্থ-সামজিক শ্রেণি মইয়ের সবচেয়ে নিচে ১ কোটি ২৮ লক্ষ "চরম বঞ্চিত, চরম বহিঃস্থ ও চরম প্রান্তঃস্থ" খানায় বাস করেন ৩ কোটি ২০ লক্ষ নারী (দেখুন ছক ১১)। সুতরাং নারীর অধিকার– তা জমি সম্পত্তিতে হোক, উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদ-সম্পত্তিতে হোক, জাতীয় আয়ে হিস্যার নিরিখেই হোক, উন্নয়ন-এ অংশীদারিত্বের প্রশ্নে হোক, শ্রমের মজুরির নিরিখেই হোক – সর্বত্র খর্বিত। অথচ 'নারীকে ক্ষমতায়িত করতে হবে'– এটাই এখন সর্বজনস্বীকৃত "উন্নয়ন স্লোগান"।

ছক ১১: বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস, ২০১৫
(মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি)

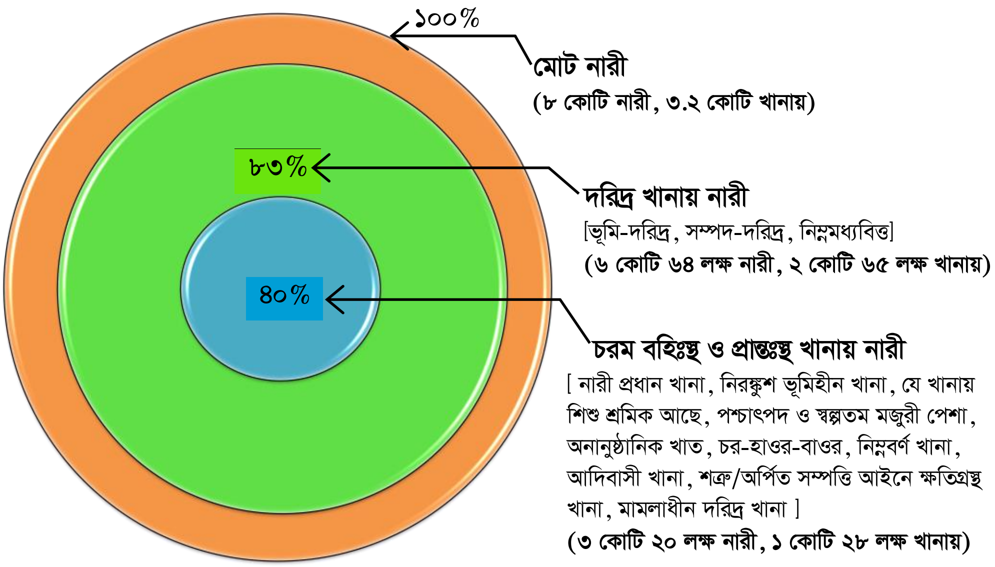

উৎস: লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত

"নারীর ক্ষমতায়ন"– অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত একথা কেউই (গুটি কয়েক উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ছাড়া) সম্ভবত প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন না। দলিল-দস্তাবেজে সরকারও যে তা স্বীকার করেন তার অন্যতম প্রমাণ হলো, "সংবিধানের প্রাধান্যসহ", "সমসুযোগ" সংক্রান্ত সকল বিষয়কে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি; ১৯৯৭-এ নারী নীতি প্রণয়ন (যদিও এ নীতি বাস্তবায়ন হয়নি); স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর অন্তর্ভুক্তির বিধান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলন; সকল পরিকল্পনা দলিলে নারীর সরব উপস্থিতি (অন্তত কাগজে); জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণায় এবং টেকসই উন্নয়ন দলিলে রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের স্বাক্ষর করা। তবে কাগুজে স্বীকৃতি আর বাস্তবে ফারাক আছে– ব্যাপক ফারাক।

নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতেই হবে। কারণ এ দেশের জন্মটাই হয়েছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সবার উন্নয়নেরই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যে আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু হলো বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো সৃষ্টি। আকাঙ্ক্ষার এ অর্থে প্রকৃত উন্নয়ন মানে শুধু মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি নয়। প্রকৃত উন্নয়ন হলো মানব উন্নয়ন (human development), আরো সঠিক অর্থে বললে বলতে হয় মানবিক উন্নয়ন (humane development)। আর জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ নারীকে বাদ দিয়ে, নারীকে

অক্ষমতায়িত রেখে এ উন্নয়ন কল্পনাতীত। কল্পনাতীত এ কারণে যে আমাদের দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রকৃত এ উন্নয়নের অর্থ হতে হবে (সাংবিধানিক চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে) নিম্নরূপ:[২৯]

১. মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণ (ensuring opportunities for a full life)– *এ দিক থেকে নারীরা পিছিয়ে আছেন – নারীদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে।*

২. (উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়) বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (inclusion of the excluded) – *নারীরা বহিঃস্থই ছিলেন বহিঃস্থই আছেন (তথাকথিত 'সচলতা' যতই বাড়ুক না কেন)।*

৩. মানুষের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ সম্প্রসারণ (ensuring full freedom that people shall enjoy) – যেখানে থাকবে– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (economic empowerment অর্থে), রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা – *এসব স্বাধীনতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী অ-স্বাধীন।*

৪. মানুষ তার নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন সে জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ (expanding choices to lead lives people value) – *এক্ষেত্রেও নারীকে অবশ্যম্ভাবীভাবেই পিছিয়ে রাখা হয়েছে।*

৫. অ-স্বাধীনতার সকল উৎস তিরোহিত করা (removal of all sources of un-freedom) – *নারীর জন্য কোথায় এ প্রক্রিয়া?*

৬. সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকারকে শ্রদ্ধা করা (respecting constitutional and justiciable rights) – *নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আদৌ মান্য করা হয় কি?*

৭. সকল ধরনের দারিদ্র্য উচ্ছেদ-নির্মূল-হ্রাস (!) করা (eradicating poverty) – *কোথায় এ প্রক্রিয়া?*

৮. বঞ্চনার ফাঁদ ভেঙে ফেলা (breaking deprivation trap) – দারিদ্র্য-উদ্ভূত বঞ্চনা, ক্ষমতাহীনতা-উদ্ভূত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা-একাকিত্ব-উদ্ভূত বঞ্চনা, শারীরিক-স্বাস্থ্যগত দুর্দশা-উদ্ভূত বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা-উদ্ভূত বঞ্চনা – *এসবের কোন্ বঞ্চনা থেকে নারী মুক্ত? অথবা এ মুক্তির লক্ষ্যে অর্থপূর্ণ প্রক্রিয়ারই বা অস্তিত্ব কোথায়?*

আসলে মানবিক উন্নয়নের উল্লিখিত মর্মবস্তু এ দেশে বাস্তব জীবনে স্বীকৃত নয়। নারীর জন্য তা আরো বেশি অস্বীকৃত। আর দরিদ্র নারীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অস্বীকৃত। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে বিশেষত নারীকে কখনও অবস্থান করানো হয়নি– সম্ভবত সচেতনভাবেই এটা করা হয়নি। পিতৃতান্ত্রিকতাসহ সামন্ত ধ্যান-ধারণা থেকে শুরু করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট অনেক কারণই এর পিছনে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এদেশে মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে যা কিছু আত্মস্থ করা ও স্বীকার করা অপরিহার্য তা আমরা করি না, কখনও করিনি। অনেক বিষয়ের মধ্যে এ প্রশ্নেও আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা অসীম। এ মর্মে হাজারো উদাহরণের কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি।

১. এ দেশে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের স্ববিরোধ লক্ষ্যণীয়। আমাদের ব্যক্তিজীবনে নারী জননী হিসেবে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র। মায়ের জন্য জীবন দিতে পারে না এমন পুরুষ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ঐ জননীই তার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে-সমাজে রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রক হবেন– এ কথা কি আমরা আসলেই ভাবি? এ কথা বাস্তবায়নে আসলেও কি আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত?

---

[২৯] বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল (২০১১), "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে"।

২. কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি উৎপাদনে নারীর অবদান যে ৫০ ভাগ– এর স্বীকৃতি কোথায়? ফসল চাষ, ধান ঝাড়াই, তুষ ছাড়ানো-শুকানো, ধান সেদ্ধ করা, খাবার পানি সংগ্রহ করা, হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল পালন, দুধ দোয়ানো, জ্বালানি সংগ্রহ, রান্না-বান্না- এসবই তো নারীই করে। নারী যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং সৃজনশীলতার সাথে এসব করেন– তা কি আমরা বুঝি? আমাদের মানসকাঠামো কি এমন নয় যে আমরা ধরেই নেই হয় যে এসব কাজ করার জন্যেই তো নারীর জন্ম?

৩. আমাদের পরিবারের মা যিনি সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সবার পরে ঘুমাতে যান অর্থাৎ পরিবারের জন্য যিনি সারা বছর দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ১৮ ঘন্টা শ্রম দেন– তার স্বীকৃতি কি এই যে তিনি পরিবারে সবার শেষে, সবার চেয়ে কম এবং উচ্ছিষ্ট খাবার জন্যেই জন্মেছেন?

৪. যে জননী উচ্ছিষ্ট খেয়ে অপুষ্টি-পুষ্টিহীনতার দুষ্ট চক্রে জীবন চালিয়ে দিতে বাধ্য হন তার এ প্রক্রিয়ার শুরু তো নারী হিসেবে জন্মগ্রহণের দিন থেকেই। প্রয়োজনীয় খাদ্য-পুষ্টির অভাব নিয়েই তার জন্ম; আর এভাবেই পেরিয়ে যায় তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন। আর মা হিসেবে তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন এবং সন্তানদের মস্তিষ্ক কোষের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে– এটাই তো স্বাভাবিক। এসব নিয়ে আমাদের সক্রিয় ভাবনাটা কোথায়?

৫. আমরা কি কখনো ভেবেছি যে এ দেশে দরিদ্র-বিত্তহীন- নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক-স্বল্পআয়ি পরিবারের প্রায় সকল পরিণত নারীর ওজন ৫০ কেজির কম– যা মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ; যা গর্ভপাত, মাতৃত্বজনিত অসুখ-বিসুখ রুগ্নতার অন্যতম কারণ এবং যা শেষাবধি নারীর জীবনের আয়ু কমিয়ে দেয়?

৬. আমাদের পরিবারের মেয়েদের শৈশব কাটে বাড়ির বয়স্ক ও ছোটদের দেখাশুনা-সেবাযত্ন করে। তাদের এ সেবা-শ্রমের শ্রদ্ধা-মূল্য অথবা অর্থ-মূল্য নিরূপণ করা হয় কি?

৭. আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের মেয়েরা কর্মস্থলে যাওয়া-আসা মিলে বছরে ২৪০ কোটি কিলোমিটার হেঁটে দেশের জন্য যে কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অন্যের হাতে তুলে দেন– এ শোষণ ও অবদানের স্বীকৃতি কোথায়? ঐ মেয়েরা তো অর্ধ-অভুক্ত– এ কথা কে ভাবেন?

৮. নারী যদি পুত্র সন্তান উপহার দিতে না পারেন সেক্ষেত্রে পুরুষ বেটা যে এক বা একাধিক বিয়ে করে ফেলেন– এ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা-উদ্ভূত কোনো ধরনের চিন্তাভাবনার প্রচার-প্রসার আছে কি?

৯. অসুস্থ হলে ছেলে সন্তানের তুলনায় মেয়ে সন্তানকে সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হয় নেয়া হয় না অথবা কম নেয়া হয় অথবা দেরিতে নেয়া হয়– এ মানসিকতার উৎস নিয়ে আমরা কখনো ভাবি কি, ভেবেছি কি?

১০. এদেশে আনুমানিক ৮০ ভাগ নারী কার্যকর প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তর সেবা থেকে বঞ্চিত। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দায়-দায়িত্ব বোধের এ দৈন্য কেন? সরকারই বা কি করেন, কি করছেন, কি ভাবছেন? সরকার মানে কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্যাজেরো জিপ, বড় বড় কথা, বড় বড় প্রকল্প উদ্বোধনে অকর্মণ্যের মত ফিতে-ফাতা কাটা, আর আখের গোছানো?

১১. নারীরা যেখানে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী সেখানে সরকারের ক্রীড়া খাতের উন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা কেন মোট ক্রীড়া বাজেটের মাত্র ১৫ ভাগ? দেশের দরিদ্র ঘরের মেয়েরা কি জানেন যে দেশে ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, শারীরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কলেজ আছে? এসব তাদের না জানানোটাই নিয়ম– বলা যায় অঘোষিত বিধি।

১২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার আলাদা বাজেট-বরাদ্দ নেই কেন? সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিঙ্গ-বৈষম্যপূর্ণ ধারণা হলো জন্মগতভাবেই ছেলেদের চেয়ে মেধা ও মননের দিক দিয়ে মেয়েরা কমজোরি এবং মেয়েরা অঙ্কে দুর্বল। সরকারি নীতি-নির্ধারকেরাও কি তাই ভাবেন?

১৩. সরকার এখন বলছেন ১০০ ভাগ নারী নির্যাতনের কেইস রিপোর্ট করা হবে। ১০০ ভাগ নির্যাতিত নারী মানে বছরে কত নারী নির্যাতিত হন সরকার কি তা জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস জানে না কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ে নথিভুক্ত নারী নির্যাতনের সংখ্যা বছরে মাত্র ১২ হাজার। আর আমার হিসেবে এ দেশে বছরে আনুমানিক ২৩ লক্ষ নারী নির্যাতিত হন যাদের জন্য আইনগত, স্বাস্থ্যগত ও কাউন্সিলিং সেবা প্রয়োজন।

১৪. আমাদের মায়েরা ৩০-৪০ বছর ধরে বসা অবস্থায় রান্না-বান্নার কাজে ব্যয় করার কারণে বাতজ্বর থেকে শুরু করে বদ্ধ রান্নাঘরের ধোঁয়া-উদ্ভূত বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগেন। ফলে তাদের জীবনে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা ক্রনিক রূপ নেয় তেমনি তাদের জীবনের আয়ু হ্রাস পায়। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ এদেশে যদি রান্নার কাজে গ্যাস সরবরাহ করে হেঁসেল ঘরে নারীকে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় নেয়া যায় তাহলে তো নারীর গড় আয়ু কমপক্ষে ৫ বছর বাড়তে পারে। আর সেই সাথে হেঁসেল-উদ্ভূত বাতজ্বরসহ ধোঁয়া-উদ্ভূত জটিল অসুখাদিও কমে যাবে। আমরা কি আমাদের মেয়েদের-মায়েদের জীবনের গড় আয়ু পাঁচ বছর বাড়ানোর বিপক্ষে?

১৫. মোট দেশজ উৎপাদন ও জাতীয় আয়ে নারীর প্রকৃত অবদান কত এ কথা কি আমরা জানি? পিতৃতান্ত্রিক সামন্তমানসিকতা-প্রবণ বাংলাদেশে (অন্যান্য অনেক দেশের মতোই) অর্থনীতিতে নারীর প্রকৃত অবদান কখনও হিসেবপত্তর করা হয়নি; সংশ্লিষ্ট সরকারি দলিল-দস্তাবেজেও এসবের স্বীকৃতি নেই। যা স্বীকৃত তা হলো মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপি-তে নারীর অবদান মাত্র ২০ ভাগ। অর্থাৎ জিডিপি সৃষ্টি করেন মূলত পুরুষ (বলা হয় জিডিপিতে পুরুষের অবদান ৮০ ভাগ)। আসলে এ হিসেবটি ভ্রান্ত এবং সম্ভবত ইচ্ছে করেই এ ভুল করা হয়। মূল কথা হলো যা কিছু 'কল্যাণ' সৃষ্টি করে (welfare producing) সবই জাতীয়/দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। যে নারী তথাকথিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ শিল্প, সেবাখাত ও কৃষিতে শ্রম বিনিয়োগ করেন তার শ্রমমূল্য জিডিপিতে হিসেব করা হয়।[৩০] কিন্তু যে নারী শত ধরনের গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডে শ্রম দেন, যে নারী গ্রামে বাড়ির উঠোনে ধান শুকানোসহ বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত কৃষিকাজে শ্রম দেন, যে নারী খানার শিশু ও প্রবীণদের যত্নআত্মি করেন– এসব সময়ের অর্থমূল্য কেন জিডিপিতে যোগ করা হয় না? বলা হয় নারীরা তো এসব কাজ করবেই; এসব কাজ করার জন্যই তো নারীর জন্ম। বলা হয়, নারীরা এসব করেন "ভালোবেসে"– এই হলো "ভালবাসার অর্থনীতি" (Economics of Love); আর 'ভালবাসার অর্থনীতির' অর্থমূল্য নিরূপণ করা ঠিক নয়। আমি উচ্চকণ্ঠে এ অযৌক্তিক বক্তব্যের বিরোধিতা করে "ভালবাসার অর্থনীতির" অর্থমূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। এ প্রয়াসের প্রধান হিসেবটি হলো 'ভালবেসে' বাংলাদেশের ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী নারীরা গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে বছরে ব্যয় করেন ১৬ হাজার ৬৪১ কোটি শ্রমঘণ্টা, যার বার্ষিক অর্থমূল্য (২০০৮ সালের মূল্যমানে) হবে আনুমানিক ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের নারীর অংশ ৭৯ ভাগ আর শহরাঞ্চলের নারীর অংশ ২১ ভাগ। আর সরকারি হিসেবের জিডিপি-র সাথে 'ভালবাসার অর্থনীতির' আর্থিক মূল্য যোগ করলে নব-হিসেবকৃত যে জিডিপি হবে তার প্রায় ৪৮ ভাগই (৭ লক্ষ ১৭ হাজার ১১২ কোটি টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ১১৪ কোটি টাকা) হবে নারীর অবদান। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের জিডিপিতে নারীর

[৩০] জিডিপিতে নারীর হিস্যার এসব হিসেবপত্তর সঠিক কিনা তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট যুক্তি আছে। যেমন একই গুণ ও মানের কাজের ক্ষেত্রে নারীরা যখন পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান তা জিডিপিতে কিভাবে হিসেব হবে? প্রচলিত পদ্ধতির হিসেবপত্তর সঠিক কিনা?

অবদান ২০ শতাংশ নয়, প্রকৃত অবদান কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ।[৩১] আর সেই সাথে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে এতকাল জিডিপিতে নারীর অবদান অবমূল্যায়ন করে সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে; পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা-উদ্ভূত ইচ্ছেকৃত এসব ভ্রান্তির কথা স্বীকার করা জরুরি।

আমার মনে হয় না এদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা নিয়ে যা কিছু উল্লেখ করলাম এর বেশি বলার আছে। তবে আমাদের দেশের বাস্তবতা এবং আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সামন্ত ধ্যান ধারণার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বিধায় "নারীর ক্ষমতায়ন" বিষয়ক একটি গবেষণা ফলাফল উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। পশ্চিমা একজন সমাজ গবেষক গবেষণা কাজটি করেছিলেন বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ঐ গবেষক বার্মায় গিয়ে দেখলেন যে নারীরা সবসময়েই পুরুষদের পিছনে পিছনে হাঁটেন। এ থেকে তিনি উপসংহারে উপনীত হলেন যে বার্মার নারীরা পশ্চাৎপদ, পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার। ঐ একই গবেষক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবারো "নারীর ক্ষমতায়ন" অবস্থা দেখার জন্য বার্মায় গিয়ে দেখলেন ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ আগে নারী চলতো-হাঁটতো পুরুষের পেছন-পেছন আর এখন পুরুষরা হাঁটছে নারীর পেছন-পেছন অর্থাৎ নারী সামনে-পুরুষ পেছনে, অনেক পেছনে। উৎফুল্ল হয়ে গবেষক লিখলেন বার্মায় "নারীর ক্ষমতায়নে" নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে– নারীরা এখন পুরুষের সামনে, অনেক সামনে। আসলে ঘটনা উল্টো। নারীরা যে আগে হাঁটছেন আর পুরুষরা নারীর পেছনে (বেশ দূরত্বে) তার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় প্রচুর ল্যান্ড মাইন পুঁতা হয়েছিল। অর্থাৎ যে আগে হাঁটবে সে আগে মরবে।

ইতোমধ্যে ছক ১১-তে যে সংখ্যাতত্ত্ব দেখানো হয়েছে তার গুরুত্ব অনেক এবং সুগভীর। কারণ আমার ধারণা এদেশে আমরা যখন নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলবো তখন প্রথমেই ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের অর্থাৎ ২ কোটি ৬৫ লক্ষ খানার (দেশে মোট খানা হবে ৩ কোটি ২০ লক্ষ) ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ নারীর জীবন নিয়ে ভাববো। এই ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন নারী কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যারও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ– মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ ভাগ মানুষ। দেশের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-বিত্তহীন এ নারীদের ৭৬ ভাগ আছেন গ্রামে আর ২৪ ভাগ শহরে। দরিদ্র-বিত্তহীন এসব নারী আছেন ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক পরিবারে; আছেন গ্রামের প্রায় সকল নারী প্রধান খানায় এবং শহরের অনেক নারী প্রধান খানায়; এরা আছেন বেকার-কর্মচ্যুত খানায়; এরা আছেন শহরের বস্তিতে; এদের অনেকেই ভাসমান মানুষ; এদের অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত; এদের মধ্যে আছেন বয়োবৃদ্ধ মানুষ-শিশু-কিশোরী-যুবতী; এদের অনেকেই আছেন হাওর-বাওর-চরে; এদের মধ্যে আছেন অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রায় সকল নারী; এদের অনেকেই আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষসহ সকল প্রান্তিক মানুষ। সুতরাং আমার মতে এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যত রূপ থাকতে পারে তা দূর করতে হলে অবশ্যই সর্বপ্রথম উল্লিখিত ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন নারীর কথা ভাবতেই হবে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের প্রধান পূর্বশর্ত। তবে তা একমাত্র পূর্বশর্ত নয়। আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জনও হবে না এবং তা টিকবেও না যদি না ক্ষমতায়নের অন্য উৎসগুলো একই সাথে কাজ না করে। আর এসবের মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সম্পদ-সম্পত্তিতে ন্যায্য হিস্যা উত্থিত ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুবিধাদি প্রাপ্তি-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি), স্বচ্ছতা-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন (empowerment of protective security)। আর এসব ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে উল্লিখিত ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তস্থ নারীকে। কোথায় সে জাতীয় পরিকল্পনা যেখানে ঐ ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তঃস্থ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সময় বেঁধে দিয়ে ক্ষমতায়িত করার কথা বলা হয়েছে? আমার জ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং শুধু তাই নয় এদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা-রচয়িতারা বিষয়টি কোনো দিনই ভাবেননি। যদি বলি আমরা কেউই তাদের এ

[৩১] হিসেবপত্তের জন্য বিস্তারিত দেখুন বারকাত, আবুল (২০১১), "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে"।

ভাবনা ভাবাতে পারিনি– একথা কি অতিকথন হবে? আর সরকারি আমলা-প্রশাসন-পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের এ ভাবনা ভাবানোও কঠিন কাজ; এক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায় ধোপদুরস্থ সরকারি কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে আদিবাসী সাওতাল নারীর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য যে "তুই সরকার যদি এতই ভালো হবি তাহলে আমার অবস্থা এত খারাপ কেন"? সেই সাথে এ কথাও সত্য যে বিদেশী দাতাদের এজেন্ডা নিয়ে ঐ ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ভাবনা কখনো কার্যকরী হতে পারে না।

মূল কথা হলো সরকার এখন যে উন্নয়ন দর্শন মাথায় রেখে পরিকল্পনা করে সেখানে এ ভাবনার অবকাশ নেই। কারণ দর্শনটি মুক্ত-বাজার অর্থনীতির নয়া-উদারবাদী দর্শন যা দরিদ্রবান্ধব নয়– যা নারী বান্ধব নয়– যা পরিবেশ-বান্ধব নয়। এ দর্শনানুযায়ী নারী হলো পণ্য (commodity) – যা কেনা-বেচার বস্তু। উন্নয়নের এ দর্শনটি এ দেশের মাটি উত্থিত নয়– বাইরে থেকে আমদানি করা। যে দর্শন আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তো নয়ই– বরঞ্চ ঐ ভিত্তির সাথে বিরোধাত্মক। কারণ ভিত্তি হলো 'জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক", ভিত্তি হলো "নারী-পুরুষের সমানাধিকার", ভিত্তি হলো "নারী-পুরুষের সম-সুযোগের অধিকার"। আর সংবিধানে বিধৃত অধিকারভিত্তিক (rights-based) যে উন্নয়ন দর্শনের কথা আছে তদনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি হবে অসাম্প্রদায়িকতা-জাতীয়তাবাদ-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি। এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা-দর্শন যেহেতু সাংবিধানিক উন্নয়ন দর্শনের বিপরীত এবং বিরোধাত্মক সেহেতু গোড়াতেই গলদ। আর গোড়ায় গলদ রেখে গাছের মাথায় পানি ঢেলে লাভ নেই। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যারা জাতীয় পরিকল্পনা বিনির্মাণ করেন/করছেন এবং যারা বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন তাদের সবার কাছে আমার কয়েকটি সনির্বন্ধ প্রশ্ন– এদেশের ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর (যারা দেশের মোট নারীর ৮৫ শতাংশ আর দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ) মধ্যে **কতজন জানেন যে**–

১. সংবিধান নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করে? [অনুচ্ছেদ ২৮(২)]

২. সংবিধানে নারী-পুরুষের সম-সুযোগ স্বীকৃত? [অনুচ্ছেদ ১৯(১)]

৩. সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক"? [অনুচ্ছেদ ৭(১)]

৪. সংবিধান মতে নারীর অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার অধিকার আছে? [অনুচ্ছেদ ১৫(ক)]

৫. "কাজ পাবার অধিকার"– সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫(খ)]

৬. "যুক্তি সঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার"– সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫(গ)]

৭. "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আওতাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য-লাভের অধিকার" – সাংবিধানিক অধিকার? [অনুচ্ছেদ ১৫(খ)]

৮. "জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"– রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব? [অনুচ্ছেদ ১৪]

৯. "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা– রাষ্ট্রের দায়িত্ব"? [অনুচ্ছেদ ১৭(গ)]

১০. "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"? [অনুচ্ছেদ ২৭]

১১. দেশে যে ২ কোটি বিঘা খাসজমি-জলা আছে তা দরিদ্র নারী-পুরুষেরই ন্যায্য হিস্যা?

এসব সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার সম্পর্কে যে ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তঃস্থ নারীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে– সম্ভবত সচেতনভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে– সে দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন কিভাবে ঘটতে পারে? কোন প্রক্রিয়ায়? এ আমার কাছে দুর্বোধ্য! এদেশে সরকারিভাবে গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন নীতি-কৌশল পঞ্চবার্ষিকী দলিলে এসব নেই।

এতকিছুর পরও আমার বিশ্বাস এদেশে দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ নারীর অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তা ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবায়নে একমাত্র পথ হলো ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা– যে প্রক্রিয়ায় প্রথমেই ঐ ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর সাংবিধানিক অধিকার ও ন্যায়-অধিকার সংশ্লিষ্ট সচেতনায়ন (conscientization) বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজটি যার তার কাজ নয়। এ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে শুধু এদেশের মুক্তিসংগ্রামের চেতনা ধারণকারী সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব– অন্য কেউ নয়, অন্য কোনোভাবে নয়।

আমি মনে করি দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তঃস্থ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন বিষয়টি ছিটেফোঁটা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের কোনো প্রকল্প গ্রহণের বিষয় নয়– বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির (long term programme not short-term project)। বিষয়টি হতে হবে এমন এক কর্মযজ্ঞের যা দরিদ্র-বিত্তহীন নারীকে প্রকৃত অর্থেই অধিকার-সচেতন করবে। অর্থাৎ বিষয়টি এক কথায় নারীর সচেতনায়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সমন্বিত শক্তিশালী ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় কর্মসূচির যা দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর সচেতনায়ন-মধ্যস্থতাকারী ক্ষমতায়ন (conscientization-mediated empowerment) নিশ্চিত করবে। বর্তমান কাঠামোতেই এ অর্জন অনেক দূর সম্ভব। এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এ লক্ষ্যের দীর্ঘ কর্মকাণ্ডে বেশ সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে দরিদ্র নারী যারা ১০ বছর ধরে অধিকার-সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার হয়েছেন তারা তাদেরই সমকক্ষীয় যারা এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি (অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাননি) তাদের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার সচেতন, ফলে মানবাধিকার ও নারী অধিকার আদায়ে অনেক বেশি সক্রিয় এবং বাস্তবে অধিকার আদায়ও করেছেন অনেক বেশি, এবং তাদের সমৃদ্ধিও (well-being অর্থে) ঘটেছে বেশি।[৩২] এ সবই নির্দেশ করে যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতেই দরিদ্র নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সার্বিক ক্ষমতায়ন অনেক দূর পর্যন্ত নিশ্চিত করা সম্ভব যদি দরিদ্র-বিত্তহীন প্রান্তঃস্থ নারীর অসীম সৃজনী ক্ষমতা স্বীকার করে তাদেরকে তাদের মত করে অধিকার-সংশ্লিষ্ট সচেতনায়ন প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করা যায়। তাহলে মুক্তবাজার অর্থনীতি দর্শন বাদ দিয়ে আমাদের সংবিধানের চেতনায় সচেতনায়ন-মধ্যস্থতাকারী এ উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিতে অসুবিধা কোথায়?

এবার আসা যাক জমি সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা, উত্তরাধিকার, ও অধিকার প্রসঙ্গে যা সামগ্রিক উন্নয়নসহ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। জমি সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর জমি সম্পত্তি প্রাপ্তির যে বেহাল অবস্থা তা থেকেই স্পষ্ট বলা যায় যে এদেশে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী-শ্রেণি নির্বিশেষে নারী প্রায় শতভাগ বঞ্চিত। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় এর প্রমাণ মেলে।[৩৩] গবেষণায় দেখা গেছে যে,

১। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মোট জমির মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ জমির কার্যকর মালিক[৩৪] নারী (যা বিভিন্ন ধর্ম ও নৃগোষ্ঠির মধ্যে ২ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ)।

[৩২] বিস্তারিত দেখুন, Barkat, Abul. et al. (2008b), Development as Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh.

[৩৩] Barkat, Abul, *et al* (2014b), Assessing Inheritance Laws and their Impact on Rural Women in Bangladesh

[৩৪] "কার্যকর মালিকানা" (effective ownership)-র সংজ্ঞা হলো মালিকের কাছে জমির দলিল আছে, জমি কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি স্বাধীন, জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিতে পারেন, এবং ঐ জমি থেকে উদ্ভূত আয় তিনি নিজ সিদ্ধান্তে ব্যয় করতে পারেন।

২। মুসলিম নারীরা গ্রামের মুসলমানদের মালিকানাধীন জমির প্রায় ১৬ শতাংশের আনুষ্ঠানিক মালিক, কিন্তু 'কার্যকর মালিকানা' হবে মাত্র ৫ শতাংশ (যার ৮৫ শতাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত)।

৩। মুসলিম নারীরা মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ জমির মালিক হবার কথা তারা তার ৪৩ শতাংশ পেয়ে থাকেন।

৪। এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম নারী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির পরিবর্তে অর্থ পেয়ে থাকেন, যে অর্থ আবার নারীর ভাগের জমির বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি ভাগ করা জমির মধ্যে সবচেয়ে অনুর্বর অংশ।

৫। হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীরা উত্তরাধিকার বিধান ('দায়ভাগ আইন') অনুযায়ীই জমি-সম্পত্তির তেমন মালিকানা পান না।

৬। আদিবাসীদের মধ্যে চাকমা ও সাঁওতাল নারীরাও জমি-সম্পত্তির তেমন মালিক নন।

৭। গারো সমাজ যেহেতু মাতৃতান্ত্রিক সেহেতু গারো সমাজে নারীরাই আনুষ্ঠানিকভাবে জমির মালিক। তবে পিতৃতান্ত্রিকতার দাপটে এখন গারো নারীরা জমি-সম্পত্তির উপর কার্যকর মালিকানা হারাচ্ছেন।

৮। হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী নির্বিশেষে নারীর জমি মালিকানা নেই বললেই চলে। তবে পার্থক্য যতটুকু দেখা যায় তাতে তাদের সকলেই কমবেশি অতিমাত্রায় অরক্ষিত অথবা ভঙ্গুর (vulnerable) (দেখুন ছক ১২)।

ছক ১২: বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ধর্ম-নৃগোষ্ঠিভিত্তিক নারীর অরক্ষিত-মাত্রা বা ভঙ্গুরতা-মাত্রার তুলনামূলক অবস্থান

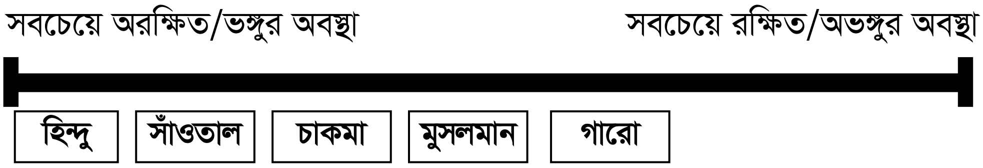

সম্পত্তির অধিকার অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন নিয়ে স্পষ্ট যা বলা যায় তা হলো:

১। সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে নারীদের জন্য বাংলাদেশে কোনো একক (uniform অর্থে) আইন নেই; উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি-সম্পদ প্রাপ্তি 'personal law'-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়; উত্তরাধিকার আইন ধর্মে-ধর্মে এবং নৃগোষ্ঠি ভেদে বিভিন্ন। তবে সব ক্ষেত্রেই নারী উত্তরাধিকার-সম্পত্তি বঞ্চিত। আর যতটুকুই পেয়ে থাকেন তার উপর নারীর তেমন কোন কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই।

২। বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইনে নারীর যতটুকু প্রাপ্তি নারী তা থেকেও বঞ্চিত হন।

৩। গ্রামের নারীরা উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে পুরুষেরা এসব ভালই অবগত।

৪। মুসলমান, হিন্দু, চাকমা, সাঁওতাল পুরুষরা প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের বিপক্ষে। আর গারো পুরুষরা প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের পক্ষে (কারণ সেক্ষেত্রে জমি-সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক মালিকানা নারীদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে চলে আসবে)।

এতক্ষণের আলোচনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্টতর যে, জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনগতভাবে সীমিত, আর বাস্তবে নেই বললেই চলে। নারীর ক্ষমতায়নে এ এক অন্যতম বাঁধা। সম্পত্তির উত্তারাধিকার আইন, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক প্রাকটিস– এ সবই নারীর প্রতি বৈষম্য চিরস্থায়ীকরণের অন্যতম মাধ্যম। এ দেশে নারীর উত্তরাধিকার আইন ধর্মভিত্তিক "পার্সোনাল ল" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত– মুসলিম ধর্মের

নারীর ক্ষেত্রে "শরিয়া আইন", আর হিন্দু ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে "দায়ভাগ আইন"। শরিয়া আইনে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সীমিত-স্বীকৃত, আর দায়ভাগ আইনে নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। বাস্তবে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আসলে কার্যকর নয়। মুসলিম আইনে সীমিত-স্বীকৃতি থাকলেও এ দেশে মুসলিম নারী সম্পত্তির মালিকানা অধিকার থেকে কার্যত বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে "গুড সিস্টার" কনসেপ্টটি পুরোপুরি কাজ করে। "গুড ব্রাদার" মূল্যবোধ অন্তত সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে কাজ করে না। একদিকে পিতৃতান্ত্রিকতা আর অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র্য– উভয়ই সম্ভবত এ অবস্থা জিইয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে। যে কারণে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারণাগুলি সংশোধনের জন্য প্রগতিশীল নারী আন্দোলনসহ সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজ এখন বেশ সোচ্চার। সুনির্দিষ্ট যে বিষয়ে সোচ্চার-সক্রিয়তার কার্যকর মাত্রা বাড়াতে হবে তা হলো– যতই স্পর্শকাতরতা থাক না কেন ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে উত্তরাধিকার প্রশ্নে জমি-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একক (uniform) আইন প্রণয়ন করা।

৩.৯ ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের আরেকটি শক্ত যুক্তি

বাংলাদেশে ভূমি-মামলার বিষয়টি যে জটিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এও সন্দেহাতীত যে জমি-জমা কিন্তু এখনও ব্যক্তির অর্থনৈতিক শক্তি, সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অন্যতম নির্ণায়ক। জমি-এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য, আর আমাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে তা অধিকমাত্রায় দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং আমাদের দেশে একখণ্ড জমি প্রাপ্তির এবং/অথবা জমি রক্ষার প্রতিযোগিতাও হবে বেশি। আবার "জমি না যম" এ প্রবাদটিও আছে। আর জমি যদি 'যম' হয় তাহলে জমি নিয়ে যে মামলা-মোকদ্দমা হবে তাও স্বাভাবিক। অথবা জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ-মনকষাকষি-মামলা-মোকদ্দমা-খুন-জখম-জালিয়াতি-বাটপারি-দস্যুতা (ভূমি-দস্যুতা, জল-দস্যুতা, বন-দস্যুতা) হয় দেখেই সম্ভবত জমিকে 'যম' বলা হয়। আবার জমি যেহেতু এক ধরনের নিরাপত্তা অথবা বীমা (ইন্সুরেন্স) সেহেতু জমি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে রুশোর মত দার্শনিক অবশ্য বলেছেন "মানুষ যেদিন একখণ্ড বাঁশের মাথায় লাল পতাকা মাটিতে গেড়ে বললো– এটা আমার– সে দিনটিই ছিল সভ্যতার শেষ দিন"। অর্থাৎ যে দিন থেকে জমি-জলার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা হলো ঐ দিনটিই ছিল সভ্যতার শেষ দিন।

ভূমি-মামলার পুরো বিষয়টি এখন পারিবারিক ও জাতীয়ভাবে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়ের মাত্রা নিম্নরূপ[৩৫]:

> ষোল কোটি মানুষের এদেশে মামলার দুপক্ষ-বাদি ও বিবাদি, তাদের পরিবারের সদস্য ও সাক্ষীসহ ভূমি-মামলার সাথে সম্পর্কিত মোট মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে এদেশে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি মানুষ ভূমি মামলায় জড়িত; কেউ কেউ আসলে একাধিক মামলায় জড়িত)। বছরে ভূমিকেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লক্ষ, যা দেশের মোট চলমান মামলার ৭৭ শতাংশ। এ মুহূর্তে যেসব ভূমি-মামলার রায় অপেক্ষমান সেসব মামলায় বাদি-বিবাদি মিলে মোট ভোগান্তি-বর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লক্ষ বছর। দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লক্ষ একর যা ক্রমপুঞ্জিভূত ভূমি মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান। ভূমি নিয়ে প্রতি বছর যে সব মামলা হচ্ছে ঐসব জমির বর্তমান বাজার মূল্য ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা। সমগ্র দেশে ভূমি মামলাক্রান্ত পরিবার (বাদি-বিবাদিসহ) সমূহ বছরে ১২ হাজার ৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান। ভূমি মামলা-সংশ্লিষ্ট মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ২৪ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১ শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় (স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি

[৩৫] বিস্তারিত দেখুন: Barkat and Roy (2004). Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage.

ইত্যাদি বাবদ), ৫০ শতাংশ ঘুষ (যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ নেন পুলিশ-থানা, ১৫ শতাংশ ভূমি অফিস, ১৪ শতাংশ কোর্টের কর্মকর্তা)। এ মুহূর্তে সারা দেশে যারা ভূমি মামলায় জড়িত তারা মামলা পরিচালনে ইতোমধ্যে ২৫ হাজার ৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন, যা (হিসেবকৃত বছরে) আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ-এর সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দের চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে ভূমি-মামলায় বাদি-বিবাদির প্রকৃত ব্যয় উল্লিখিত আর্থিক ব্যয়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশি হবে, কারণ আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসেব করা হয়নি অথবা হিসেব করা সম্ভব হয়নি তা হলো: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরনের বাহ্যিকতা-ব্যয় (externalities) যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে তার অর্থ মূল্য, ভূমিকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখম-এর ফলে বহু ধরনের যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থ মূল্য (cost of corruption) ইত্যাদি।

ভূমি-মামলায় পারিবারিক অপচয় মাত্রাহীন। গবেষণালব্ধ সাম্প্রতিক কয়েকটি তথ্যে তা স্পষ্ট: গড়ে প্রতিটি ভূমি মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হন ৪৫ জন মানুষ। গড়ে একটি ভূমি-মামলা নিষ্পত্তিতে সময় লাগে ৯.৫ বছর– কমপক্ষে ৩-৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর। ভূমি-মামলা পরিবারের সকল ধরনের দুর্দশা বাড়ায়– অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, মানসিক। মামলাক্রান্ত ১০০ শতাংশ মানুষই মামলার কারণে মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধির কথা বলেছেন; ৬০ শতাংশ বলেছেন মামলার কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথা; মামলাক্রান্ত পরিবারের ৯০ শতাংশে আয় আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে; মামলার ব্যয় মিটাতে ৬০ শতাংশ পরিবার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় কর্তনে বাধ্য হয়েছেন; খাদ্য পরিভোগে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন ৭৫ শতাংশ পরিবার; আর ৬০ শতাংশ পরিবার মামলা চালাতে গিয়ে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন। ভূমি মামলার কারণে আয় হ্রাস ও প্রয়োজনীয় ব্যয় কর্তন বিষয়টি শুধুমাত্র ভূমি মামলায় সরাসরি জড়িত (বাদি ও বিবাদি)-দের জন্যই প্রযোজ্য নয়, তা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মাত্রায় লক্ষণীয়। গড়ে মামলা প্রতি বাদি অথবা বিবাদি নির্বিশেষে প্রতিটি পক্ষের যে সম্পদ হ্রাস পেয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য হবে ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৯৯০ টাকা। বাৎসরিক সম্পদ হ্রাসের পরিমাণ, গড়ে প্রতি পক্ষের ২৩ হাজার ৯৯৯ টাকা।

সুতরাং ভূমি-মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে সামগ্রিক কৃষি সংস্কার ছাড়া বিশাল এ পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ অসম্ভব। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি মামলা। সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি-মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চিরস্থায়ীকরণে ভূমিকা রাখছে। ভূমি মামলায় পুলিশ দুপক্ষের কাছেই ঘুষ খাচ্ছে। তবে যে বেশি ঘুষ দিচ্ছে পুলিশ তার স্বার্থ দেখছে, কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করছে মামলা যেন চিরস্থায়ী হয়। এ বিষয়ে ভূমি অফিস, কোর্ট সিস্টেম, স্থানীয় সরকার, উকিল-মোক্তারসহ রেন্ট সিকিং সিস্টেমের সকল এজেন্ট– কেউ কারো চেয়ে কম নন। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃংখলা ও বিচারের সিস্টেমে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন তারা যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন। এবং তারাই কিন্তু দুর্নীতি ও সিস্টেমের অকার্যকারিতা চিরস্থায়ী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। ভূমি-মামলায় সবচেয়ে বেশি দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, মহিলা প্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ যাদের মধ্যে আছেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ ইত্যাদি।

ভূমি-মামলায় বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না, উভয়েই হারেন (losing battle for both)। কারণ মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও) যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা

হয় তার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি। ভূমি-মামলা মামলাক্রান্ত পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন-সহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল করে: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পিছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্য পরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিকস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক জাতীয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক। ভূমি-মামলা পারিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য সম্পর্কের বিনষ্টিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

মামলার বাদি-বিবাদি নন অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠির (যাদের অনেকেই এমনকি ভূমিহীন) একাংশ যারা যে কোনো কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ– মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে নিয়মিত আয়মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুতির ফলে দরিদ্রতর হয়ে পড়েন।

ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি; ভূমি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞানের অভাব (অথবা আবছা ধারণা); আইনের প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা; অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা-মীমাংসার ক্ষেত্রে অকার্যকর ও আইনের সাথে সঙ্গতিহীন বিচার; বিচারের রায় প্রভাবিত করার চেষ্টা (অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রচেষ্টা!); থানা-পুলিশ-ভূমিঅফিস-কোর্টের মানুষ-বিরুদ্ধ অবস্থান; প্রভাবশালী মানুষের (বিশেষত রাজনীতিকদের ও স্থানীয় বাটপারদের) অবৈধ হস্তক্ষেপ (অনেক ক্ষেত্রে এটাও তাদের অবৈধ আয়ের অন্যতম উৎস!); উকিল-মোক্তারের মক্কেল বিরোধী অবস্থান এবং অনৈতিক ও অপেশাদারসুলভ মানসকাঠামো (অনেক ক্ষেত্রে)– এসবই ভূমি-মামলায় অপচয় বৃদ্ধিতে এবং প্রক্রিয়া প্রলম্বনে ভূমিকা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে এদেশে ভূমি-মামলা ভাল তেমন কিছুই করে না, বিপরীতে মামলাক্রান্ত পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা বৃদ্ধি করে; মানব পুঁজি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-রাজনীতি-মনস্তাত্ত্বিক জগত ভারসাম্যহীনকরণ ও কলুষিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে; সর্বোপরি স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ (freedom mediated) প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নে বড় ধরনের বাঁধা-বিপত্তির কারণ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সম্পূর্ণ ভূমি-মামলার বিষয়টিকে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে।

৩.১০ ভূমি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আইন ও নীতিমালা: দুর্বৃত্ত-রেন্ট-সিকারদের স্বার্থ সংরক্ষণের যন্ত্র মাত্র

জমি ও জলা এদেশের মূল ও মৌলিক সম্পদ। অথচ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা– উভয়ই এখনও ঔপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল কাজ তিনটি: (১) রেকর্ড সংরক্ষণ, (২) রেজিস্ট্রেশন, (৩) সেটেলম্যান্ট। সম্পর্কহীন ও সমন্বয়হীন দুটো মন্ত্রণালয়ের তিনটে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অফিসে এসব কাজ করে– এটাই ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার অন্যতম সমস্যা। যা নিরসনে কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নেই। রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় তহসিল অফিস। যেহেতু ভূমির কেনাবেচা এবং উত্তরাধিকার সূত্র চলমান সেহেতু রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি (process of transfer of land right) জরুরি। রেজিস্ট্রেশনের কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সাবরেজিস্ট্রি অফিস। এ কাজটিও জরুরি কারণ এটা হলো "হস্তান্তরের রেকর্ড" বা "recording of transfer"। আর সেটেলম্যান্ট-এর কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেটলম্যান্ট অফিস। এ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখন যখন জনসংখ্যা ছিল কম আর চাষের আওতায় নতুন জমির হিসেব রাখা ও সংশ্লিষ্ট খাজনা আদায় প্রসঙ্গটি প্রযোজ্য ছিল (অর্থাৎ recording the expansion of cultivable acreage)– এখন এটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। মালিকানা স্বত্বের আইনি রেকর্ড (official record of ownership rights) সম্পন্ন করতে সম্পর্কহীন তিনটে সংস্থার উপস্থিতি– এটা নিজেই এক অপ্রয়োজনীয় জটিলতা। এ অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দূর করে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুসমন্বিত একক কর্তৃত্বে আনা গেলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

জমি-জলার মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা শুধু যে বেশি তাই নয়– এ প্রক্রিয়া বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে উভয়েরই নিঃস্বকরণে সহায়ক; এ প্রক্রিয়া সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে এবং সেই সাথে এদেশে সামাজিক পুঁজি বিকাশে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। ধরুন জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হলো। নিষ্পত্তির প্রধান পূর্বশর্ত হলো মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করা। একই জমির মালিকানার দাবিদার তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি মালিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে দাখিল করলেন তহসিল অফিসের কাগজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাখিল করলেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কাগজ, আর তৃতীয় ব্যক্তি পেশ করলেন সেটেলম্যান্ট অফিসের কাগজ। আসলে ঐ জমির মালিক কে? তিনজনই তো ভূমি সংক্রান্ত নির্বাহী সংস্থার (executive body) কাগজ দেখাচ্ছেন– আইনের দৃষ্টিতে তো তিনজনই মালিক। সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশের মানুষের জমি মালিকানা সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ একত্রিত করলে জমির পরিমাণ দাঁড়াবে এদেশে মোট যত জমি আছে তার চেয়ে তিনগুণ বেশি। আসলে আমরা যাকে জমি রেজিস্ট্রেশন বলি তা দলিলের রেজিস্ট্রেশন (registration of deed)– জমির মালিকানার রেজিস্ট্রেশন নয়। জমির পরচা বা নকশা (RR-record of right) মিলালে হাজারো ত্রুটি দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত কোনো মালিকের জমি তার নামে নামজারি বা জমা-খারিজ (mutation) করার জন্য দুটো অফিসে যেতে হয়: সেটেলম্যান্ট অফিসে কার জমি কোনটা তার মানচিত্র আঁকা হয় (প্রথম সেটেলম্যান্ট সার্ভেতে লেগেছিল ৬০ বছর– ১৮৮০-১৯৪০; এরপর ১৯৫০-এ State Acquisition Settlement, তারপরে রিভিশন্যাল সেটেলম্যান্ট যা এখনও চলছে, কবে শেষ হবে কেউই জানে না!); আর তহসিলদার, এসিসট্যান্ট কমিশনার (ভূমি), জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় প্রশাসক ইত্যাদি। এভাবে একই জমি বিভিন্ন ব্যবস্থায় মালিকানা বা নামজারি করার ফলে জমির মালিক হয়রানির শিকার হন। সুতরাং স্পষ্ট যে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুরো সিস্টেমটি অযোগ্য, অদক্ষ, অকার্যকর, অস্বচ্ছ, দ্বৈত-মালিকানা সৃষ্টিতে সহায়ক, জাল রেকর্ড প্রণয়নে সহায়ক, মামলা-মোকদ্দমার ভিত্তি সৃষ্টির সহায়ক, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা-বিরুদ্ধ, ভূমি-জল দস্যুবৃত্তির সহায়ক, ভূমি-জলা কেন্দ্রিক যত ধরনের দুর্নীতি ঘটানো সম্ভব তার সক্রিয় সহযোগী। আর এসব কারণেই মাঝখান দিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে ভূমি-জলা সন্ত্রাসীরা; ভূমি-জলা সংক্রান্ত দুর্নীতি ডালপালা গজিয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে; সৃষ্টি হচ্ছে ভূমি-জলা জোচ্চোর-দালাল গোষ্ঠী– এসবই ইতোমধ্যে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন অধিকহারে পুনরুৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

এ দেশে ভূমি আইনের বিবর্তন বিশ্লেষণে মানুষ-বিরোধী তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: (১) সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন জটিল ও দুর্বোধ্য– মানুষের কল্যাণে আইন প্রণয়ন হয়নি; (২) ঔপনিবেশের স্বার্থ রক্ষার আইন-কানুন এখনও বহাল আছে; এবং (৩) একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী আইন-কানুন পাওয়া যায় যা ধনী-স্বার্থ সহায়ক অথবা দরিদ্র মানুষের স্বার্থবিরোধী। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ভূমি সংশ্লিষ্ট যত আইন কানুন আছে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে সে সবের গুরুত্বের কারণে পরের অনুচ্ছেদ ৩.১১-তে এ বিষয়ে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে যদিও ৩.১ অনুচ্ছেদে বলেছি তারপর আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের দেশে ভূমি সংক্রান্ত সবচেয়ে জনকল্যাণকামী আইনটি হলো সম্ভবত "পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন" (১৯৫১), যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে "রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী সত্তা থাকবে না"। এ আইন গত অর্ধ শতকেও বাস্তবায়ন হয়নি। এ আইনে বাস্তবত মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি কারণ আগের শোষক জমিদারদের স্থানে বসানো হয়েছে শোষক জোতদারদের, ভাগচাষি ও বর্গাচাষিদের কৃষিতে মজুর শ্রমিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে; আইনে কৃষি জমির যে পুনর্বণ্টনমূলক দিক ছিলো তা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি; প্রকৃত কৃষক কৃষি জমির মালিক হয়নি; আইনে শুধুমাত্র কৃষি থেকে অধিক রাজস্ব আহরণের চেষ্টা করা হয়েছে; কৃষিতে শ্রেণি সম্পর্কের কোনো ধরনের তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সেইসাথে জমির মালিকানা সিলিং পাল্টানো হয়েছে কয়েক দফা;[৩৬] সিলিং উদ্বৃত্ত খাস জমি সবসময়েই প্রাক্কলিত হিসেবের তুলনায় পাওয়া গেছে কম এবং যা-ও পাওয়া গেছে তা স্বল্প-মাত্রায় উর্বর; সিলিং উদ্বৃত্ত জমি বিতরণের ক্ষেত্রে আইন করে পরিবারের সংজ্ঞা

[৩৬] যেমন সেনাশাসক আইয়ুব খানের আমলে ১৯৬১ সালের পূর্ব পাকিস্তান টেনান্সি এক্ট-এ কৃষি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সিলিং ৩৩ একর থেকে বাড়িয়ে করা হয় ১২৫ একর। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ১২৫ একরের বেশি জমির মালিক ছিলেন মাত্র ৪৩৯ পরিবার এবং সিলিং উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যায় মাত্র ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৪১ একর (দেখুন, Abdullah 1976, পৃ. ৮২-৮৩)।

পাল্টানো হয়েছে বহুবার; জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির আইন-কানুন যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, স্থানীয়ভাবে সমাধানের আইন কার্যকরী নয়, উচ্চ-আদালতে নিষ্পত্তির প্রয়োগ-কৌশল ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে; খাস জমিতে ভূমিহীনদের সমবায় সৃষ্টিতে আইন থাকলেও কখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি; সরকারি নীতিমালায় নাগরিক সমাজসহ কৃষক সংগঠন, বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠন ও জনকল্যাণকামী বেসরকারি সংস্থাসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা স্বীকৃত নয়।

৩.১১ ভূমি আইনঃ দরিদ্র বিরোধী আর 'রেন্ট-সিকার' দুর্বৃত্ত সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম

'ভূমি আইন' (Land laws) **কেন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ? এ প্রসঙ্গে একদিকে যেমন ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জনক স্যার উইলিয়াম পেটির (১৬২৩-১৬৮৭) বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যেখানে তিনি বলেছেন, "ভূমি হলো সম্পদের জনক আর শ্রম হলো তার জননী", আর একই সাথে স্মরণ করা যেতে পারে ফরাসি দার্শনিক জ্য-জ্যাক রুশোর (১৭২৮-১৭৭৮) বক্তব্য, "মানুষ যখন একটি বাঁশের উপর লাল পতাকা মাটিতে গেড়ে দিয়ে বলল এটা আমার– সে দিনই ছিল সভ্যতার শেষ দিন।" অর্থাৎ 'ভূমি' যেমন একদিকে সম্পদের** (wealth **অর্থে) জনক আবার ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা হলো সভ্যতার শেষকাল।**

উপরের কথা দুটো মাথায় রেখেই বলছি– বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ যেহেতু ভূমিনির্ভর সেহেতু আমাদের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অনস্বীকার্য হবে এটাই স্বাভাবিক। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; এবং একইসাথে তা কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচকও ভূমি। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোনো অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য। ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না[৩৭]– বাড়ছে ভূমির মালিকানা নিয়ে প্রতিযোগিতা। ভূমিকেন্দ্রিক সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই– বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বাড়ছে বলপূর্বক অভিবাসন, বাড়ছে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে বিশেষত দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষদের ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ী উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত নয়। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব নয় এবং তা জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত

[৩৭] এ তথ্যটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় যার অনেক কিছুই কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-এর সাথে বিরোধাত্মক। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি অনুচ্ছেদ ৩.১৩-তে।

আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে 'রেন্ট-সিকার' দুর্বৃত্ত প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিৎ যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে 'বাদ পড়া' জনগোষ্ঠীকে 'অন্তর্ভুক্ত' করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা বিগত পাঁচ বছর যাবৎ (২০১০-২০১৪) একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করি, যার শিরোনাম "বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন"।[৩৮] এই গবেষণায় আমরা প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করি। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। এই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনি টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনাও করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খণ্ডের বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ: পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন; অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী; ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী; কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন; চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী; জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন; ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী; ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন; চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন; ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন; অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী; ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কারণে এই অনুচ্ছেদে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল আইনের গুরুত্ব, আইনের সমস্যা (ভিত্তিগত ও প্রায়োগিক) এবং প্রধান সমাধান প্রস্তাবসমূহ উল্লেখ করা হলো।

পদ্ধতিতাত্ত্বিকতার নিরিখে (methodology অর্থে) প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে অধিকার-ভিত্তিক অ্যাপ্রোচে ভূমি আইনগুলোকে ০ থেকে ১০০ এর স্কেলে স্কোরিং করা হয়েছে (যেখানে '০' অর্থ সবচেয়ে দুরবস্থা এবং '১০০' অর্থ সবচেয়ে সন্তোষজনক অবস্থা)। এই স্কোরিং-এর মাধ্যমে যে কেউ একনজরে সংশ্লিষ্ট আইনের নিরিখে দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমি-অধিকার নিশ্চিত হবার বিষয়টির তুলনামূলক অবস্থা বুঝতে পারবেন। আইনের এ ধরনের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুণগত বিশ্লেষণ, আমাদের জানামতে, এর আগে আর কখনো করা হয়নি (দেখুন ছক ১৩)।

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, Barkat. et al (2014), Land Laws in Bangladesh: A Rights- based Analysis and Suggested Changes. উল্লেখযোগ্য যে অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিয় ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেন্ডার সংবেদনশীল এই ২৫০০ পৃষ্ঠার গবেষণা প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো ২২টি পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ছক ১৩: অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচের নিরিখে ভূমি সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বর্গের আইনসমূহের স্কোর

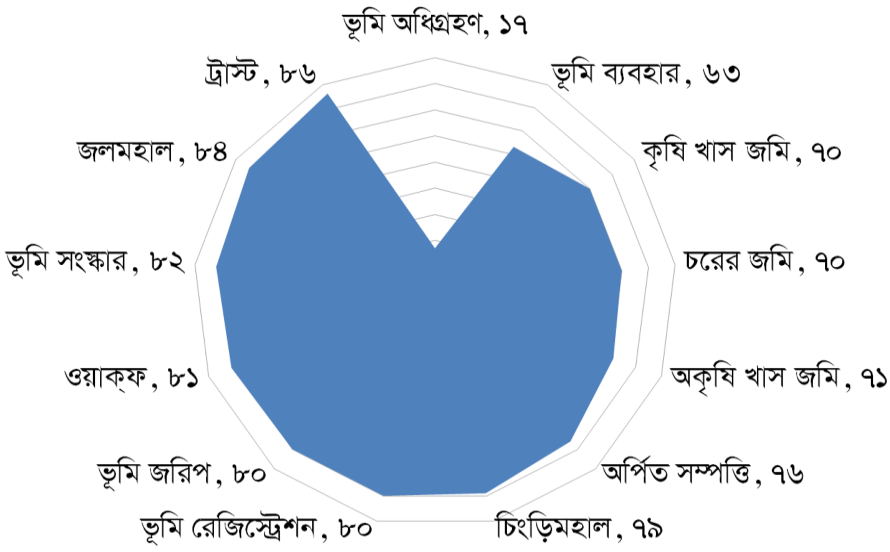

১০০= সবচেয়ে ভালো, ০= সবচেয়ে খারাপ

* বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রদত্ত পরামর্শের ভিত্তিতে স্কোরিং করা হয়েছে।

এখন আসা যাক ভূমি সংক্রান্ত বৃহৎ বর্গের আইন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনি সমস্যা, জটিলতা এবং সুরাহার প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত ২০টি বৃহৎ বর্গের বিষয়ের আইনে দরিদ্র মানুষ, প্রান্তঃস্থ মানুষ এবং নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে আইনগত মূল সমস্যা কোথায় এবং তার সম্ভাব্য সমাধানসমূহ (আইনের প্রয়োগগত দিকসহ আইনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন) নিচে উত্থাপন করছি:

(১) চরের জমি: বিলীন হওয়া চরের জমি ৩০ বছরের মধ্যে ফেরত আসলে তা আগের মালিক ফেরত পাবার কথা আইনে আছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি কোথায় থাকবেন, তাকে পুনর্বাসন করা হবে কি হবে না– সে বিষয়ে কোন বিধান প্রচলিত আইনে নেই। নতুন জেগে ওঠা চরের দখল নিয়ে তা জনগণকে নোটিশের মাধ্যমে জানাবার বিধান থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসন তা পালন করে না। নতুন জেগে ওঠা চরের জমি সরেজমিন পরিদর্শন করে (দিয়ারা) জরিপ করবার বিধান রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবে তা করা হয় না। মৌসুমী চর সম্পর্কে আইনে সুস্পষ্ট বিধান নেই। জেগে ওঠা চরের জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যত কোনো কমিটি নেই। কোনো ব্যক্তি জমি পেতে ব্যর্থ হলে উক্ত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপিলের কোনো বিধান আইন নেই। এমতাবস্থায় আমরা প্রধান যেসব সুপারিশ করেছি তা হলো: চর এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি। এ বিষয়ে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া নীতি প্রণয়ন করেছি; চরের জমি বিতরণের ক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের প্রাধান্য দেওয়ার প্রস্তাব করেছি; ভূমি বন্দোবস্তের পর কারও আপত্তি থাকলে আপত্তি নিষ্পত্তির দিকনির্দেশনা থাকার প্রস্তাব করেছি; চরের জমি ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং কমিটির কার্যাবলি বিষয়ে প্রস্তাব করেছি।

(২) জলমহাল বিষয়ক: দেশে সর্বমোট জলমহালের সংখ্যা ২৬ হাজার ২৭৫; দেশের সর্বমোট জলমহালের আয়তন ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৫৬ একর; মিঠাপানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই জলমহাল শুধু জলজ জীববৈচিত্র্যের ধারক-বাহক হিসেবেই কাজ করে না– একটি বিশাল জনগোষ্ঠির

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবনজীবিকাও একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। জলমহাল সংশ্লিষ্ট মূল সমস্যা নিম্নরূপ: জলমহালের ইজারা বন্দোবস্তের নির্ধারিত অর্থমূল্য প্রদান দরিদ্র মৎস্যজীবী মানুষের সাধ্যের বাইরে। ফলত, ধনীরাই জলমহাল ইজারা পেয়ে যায়; জলমহাল ইজারা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকায় এবং ওয়েবসাইটে প্রচার করা হলেও গরিব মৎস্যজীবীর কাছে তা পৌঁছায় না; জলমহালের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতির (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মাধ্যমে বিত্তবানরা (যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়) অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় যা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বঞ্চিত করে: যিনি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই মৎস্যজীবী। কিন্তু প্রভাবশালী মহল মিথ্যা পরিচয়ে জলমহালের দখল নেয়। ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা বহিস্থই থেকে যায়; ইজারা বন্দোবস্তের মেয়াদ থাকে কম। ফলে, মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নের কথা না ভেবে কম সময়ে লাভ নিশ্চিত করার জন্য যথেচ্ছা মৎস্য নিধন করা হয়। এসব বিবেচনা থেকে জলমহাল সংশ্লিষ্ট আইনের পরিবর্তন-পরিমার্জন নিয়ে আমরা যা সুপারিশ করেছি তার মূল কথা হলো: জলমহালের ইজারার অর্থমূল্য দরিদ্র প্রকৃত মৎস্যজীবীর সাধ্যের মধ্যে রাখতে হবে; ইজারার মেয়াদ বাড়াতে হবে; প্রচলিত সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতি রহিত করতে হবে; একমাত্র প্রকৃত মৎস্যজীবীই যেন জলমহালের ব্যবহারের অধিকার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে; প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করতে হবে।

(৩) চিংড়িমহাল: বাংলাদেশের ১ লক্ষ ৪৬ হাজার হেক্টর জমি চিংড়ি চাষের আওতাধীন। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী জমির ৫৩ শতাংশ চিংড়ি চাষের কারণে লবণাক্ততা সমস্যায় আক্রান্ত; চিংড়ি চাষের সাথে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়িমহালের প্রধানতম সমস্যাদি হলো: প্রভাবশালী মহল চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষুদ্র জমি মালিকদের ভূমি 'হারি' নামক চুক্তির মাধ্যমে নিয়ে নেয়। ভূমি মালিক এ জন্য প্রতি একরে বছরে পায় ৪ থেকে ৬ হাজার টাকা। অথচ, প্রকৃতপক্ষে প্রতি একরে আয় হয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এ পদ্ধতিতে বঞ্চিত হয় ক্ষুদ্র জমি মালিক। অনেক সময় 'হারি'তে দেওয়া জমি প্রকৃত মালিকের কাছে আর ফেরত যায় না; প্রচলিত নীতিমালায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি; বর্তমান নীতিমালায় চিংড়ি চাষের পরিবেশগত দিকটি বিবেচনায় আনা হয়নি; নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভূমি মালিক কর্তৃক একতরফা বর্গা চুক্তির অবসান ঘটানো হলে বর্গা চাষিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনো বিধান প্রচলিত নীতিতে নেই; প্রচলিত নীতিতে বলা হয়েছে চিংড়ি চাষের জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে হলে দরখাস্তকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে যা বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এসব বিবেচনা থেকে চিংড়িমহালের সংস্কারে আমাদের প্রস্তাবনা হলো নিম্নরূপ: প্রচলিত নীতিতে চিংড়ি চাষিদের স্বচ্ছলতার শর্তটি বাদ দিয়ে গরিব চাষিদের নিয়ে সমবায় সমিতি করার বিধান রাখতে হবে; চিংড়ি চাষের জন্য ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই সমিতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; মোট চিংড়িমহালের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র-প্রান্তিক-নারীদের ইজারা দেওয়ার বিধান রাখতে হবে; প্রচলিত নীতি সংশোধন করে চিংড়িমহাল সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সকল কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) পাথরমহাল: বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে বাংলাদেশের পাথরমহাল বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত (সিলেট, সুনামগঞ্জ, বান্দরবান, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, শেরপুর এবং পঞ্চগড়) এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তথা পাকা রাস্তা এবং সেতু নির্মাণে পাথরের বিশেষ চাহিদা রয়েছে; আর প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উত্তোলন করা হয় বলে পাথরমহাল ব্যবস্থাপনার সাথে পরিবেশের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পাথরমহালের আইনগত অন্যতম সমস্যাদি হলো: ২০১২ সালে বিধিমালা তৈরি করার পূর্বে উচ্চ আদালতে

দায়ের করা কিছু মামলা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রভাবশালীদের দায়ের করা এসব মামলায় স্থগিতাদেশ পেয়ে তারা প্রাপ্ত ইজারাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করেছে, ফলে সরকার রাজস্ববঞ্চিত হচ্ছে; পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালাসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন যা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে; আইনে উন্মুক্ত দরপত্রের বিধান থাকলেও বিবেচনাধীন মামলার কারণে তা কার্যকর করা যাচ্ছে না; বিজ্ঞানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পাথর ও খনিজ উত্তোলনের বিষয়ে আইনে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই; কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করলে আইনে শাস্তির কোনো বিধান নেই। এমতাবস্থায় পাথরমহালের আইন পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জনে আমাদের প্রধান সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: বর্তমান আইন ও বিধিমালায় ত্রুটি থাকায় এবং পাথরমহাল সম্পর্কিত স্বতন্ত্র আইন ও বিধিমালা না থাকায় এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন (যা আমরা খসড়া করেছি); কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পাথর উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ বা তাদের সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৮ (আট) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড যা কোনক্রমেই ৬০ (ষাট) হাজার টাকার কম হবে না বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন– প্রস্তাব করা হয়েছে; বিধিমালায় পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত নির্দেশমালার প্রস্তাব করা হয়েছে; সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের যৌথ উদ্যোগে ইজারা প্রদান, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করার সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে; প্রস্তাবিত জেলা পাথরমহাল কমিটিতে সমিতির পক্ষে দুই জন প্রতিনিধির মধ্যে একজন নারী প্রতিনিধি থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৫) বালুমহাল: বাংলাদেশে ছোটবড় মিলিয়ে মোট বালুমহালের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। বালু উত্তোলন এবং বিক্রির সাথে অনেক শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে বালুমহালের সম্পর্ক নিবিড়। বালুমহাল নিয়ে যে সব সমস্যা উদঘাটন করা গেছে তার মধ্যে অন্যতম: জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও প্রচলিত বিধিতে টেকনিক্যাল/কারিগরি কমিটির কথা বলা হয়নি; জাতীয় এবং জেলা কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই; বর্তমান বিধিমালায় বালু উত্তোলনের কোন সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি ফলে নির্বিচারে বালু উত্তোলন হচ্ছে; অপরিকল্পিত এবং অননুমোদিত বালু উত্তোলন পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি; অনুমোদনবিহীন বালু উত্তোলন হলেও প্রশাসন নীরব থাকছে। এমতাবস্থায় বালুমহালের আইনি পরিবর্তন নিয়ে আমরা যেসব সুপারিশ করেছি তা হলো: বালুমহাল সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিটিতে সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত একজন নারী সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা; জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নারী কাউন্সিলর ও সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা; সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিয়ে একটি টেকনিক্যাল/কারিগরি কমিটি গঠন করা; বালু উত্তোলনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার বিধানটি বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা; বিধিমালা সংশোধন করে বালু উত্তোলনের সময় নির্ধারণ করে দেয়া; বালু খননের ফলে সৃষ্ট ভূমিক্ষয়, নদীভাঙ্গন ও অন্যান্য দুর্যোগ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

(৬) চা বাগানের ভূমি: চা বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৬৩টি চা বাগান রয়েছে যার আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৮৭ হাজার হেক্টর। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ চা শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিকই আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এতকিছুর পরেও উল্লেখ্য যে, চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমাদের আলাদা কোনো আইন নেই; ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সার্কুলার এবং ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় চা বাগানের জন্য ভূমি ইজারা দেওয়া হয়। চা বাগান

সংশ্লিষ্ট অন্যতম সমস্যাদি হলো: চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। বর্তমানে চা বাগানের ইজারার মূল্য একর প্রতি মাত্র ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে যা অতি নগণ্য। অনেক ক্ষেত্রেই চা বাগানের জন্য ইজারা নিয়ে অন্য উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার করা হচ্ছে। চা বাগানের ভূমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য কোনো নির্ধারিত কমিটি নেই। চা বাগানের জন্য ইজারা নিয়ে অবৈধভাবে সাব-ইজারা দেয়া হচ্ছে। চা বাগানের ভূমি উন্নয়ন করের হারও নির্দিষ্ট নয়। এসব কিছু বিবেচনায় এনে অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচে আইনগত যেসব সুপারিশ করা যেতে পারে তা হলো নিম্নরূপ: চা বাগানের ভূমি সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি (এ বিষয়ে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া নীতি প্রণয়ন করেছি); চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে আলাদা কমিটি গঠন প্রয়োজন; ইজারার মেয়াদ নবায়ন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা কমিটির কাছে ন্যাস্ত করা সঙ্গত; ইজারা মূল্য একর প্রতি ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে বাস্তবতার নিরিখে নির্ধারণ করা উচিত; চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

(৭) কৃষি খাস জমি: বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৫.৩৪ শতাংশ খাসজমি; খাসজমির অন্তর্ভুক্ত হলো পয়স্তি জমি, অধিগ্রহণ উদ্বৃত্ত জমি, মালিকানাবিহীন জমি ও সিলিং উদ্বৃত্ত জমি; দেশের প্রচলিত আইনে এসব খাস জমি দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার কথা; দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি খাসজমির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষি খাস জমি সংশ্লিষ্ট প্রচলিত মূল আইন (কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭)-এর প্রধান সমস্যাদি নিম্নরূপ: কৃষি খাস জমির যে সংজ্ঞা আছে তাতে মহানগর এলাকার কৃষি খাস জমিকেও অকৃষি খাস জমি হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে; চিংড়ি চাষ এবং লবণ চাষের জন্য যে জমি ব্যবহার করা হয় তা কৃষি খাস জমির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; প্রচলিত নীতিমালায় কোনো বিধবা মহিলাকে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত পেতে হলে তার সক্ষম পুত্র থাকতে হবে যা নারীর মৌলিক অধিকারবিরোধী; খাস জমি বন্দোবস্তের কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি; বন্দোবস্ত কার্যক্রমে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে কোনো কমিটি গঠনের বিধান নেই; খাসজমি হস্তান্তরের উপর কোনো আইনগত বিধি-নিষেধ নেই। এসব কিছু বিবেচনায় এনে কৃষি-ভূমি সংস্কার দারিদ্র্য-বান্ধব করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে যেসব পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন সুপারিশ করা হয়েছে তার অন্যতম হলো: কৃষি খাস জমির সংজ্ঞায় সংশোধন প্রস্তাব করে বলা হয়েছে, কৃষি খাস জমি বলতে অকৃষি খাস জমি ব্যতীত সকল খাস জমিকে বোঝাবে। এছাড়া চিংড়ি এবং লবণ চাষের জমিকে কৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত একজন নারী সংসদ সদস্যকে জাতীয় কমিটিতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। জমি চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে পারে এমন বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাকে অবশ্যই ভূমিহীন পরিবারের তালিকায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সক্ষম পুত্র থাকার শর্ত বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় কমিটিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উত্তরাধিকারের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনোভাবে কৃষি খাসজমি হস্তান্তরের বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অগ্রাধিকার তালিকায় শারীরিক বা অন্যবিধ প্রতিবন্ধিদের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে (প্রয়োজনে সমবায় ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে)।

(৮) অকৃষি খাস জমি: কৃষি-ভূমি সংস্কারে অকৃষি খাস জমির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, বাংলাদেশে মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লক্ষ একর। এই খাস জমির সঠিক বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাপূরণে অবদান রাখা রাষ্ট্র

পরিচালনার মূলনীতির অংশ। অকৃষি খাস জমি সংশ্লিষ্ট প্রচলিত মূল আইনে (অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫) প্রধান কয়েকটি সমস্যা হলো নিম্নরূপ: অগ্রাধিকারভিত্তিতে অকৃষি খাসজমি বিতরণের কোনো তালিকা নেই। অকৃষি খাস জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক কর্মী, এবং বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কোনো মানদণ্ড নেই। অকৃষি খাস জমির প্রকৃত পরিমাণ এবং রেকর্ডের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রেকর্ডের চেয়ে জমির পরিমাণ বেশি। অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের সরকারি নীতিমালায় অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য ১৬ বর্গের মানুষ অথবা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ভূমিহীন কৃষক, জলাহীন জলজীবী এবং শহরের দরিদ্র মানুষের কোনো কথা নেই (দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৫); বাস্তবে অকৃষি খাস জমি ভূমিদস্যুরা বরাদ্দ পেয়ে যায়। অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ়ভাবে নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি। পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে ভূমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি। সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় অনুপস্থিত। সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি। এসব সমস্যাদি বিবেচনায় এনে অকৃষি খাস জমির আইন পরিবর্তন-পরিমার্জনে যেসব সুপারিশ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো: অকৃষি খাস জমি বিতরণের জন্য জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। অবৈধ দখলকৃত অকৃষি খাস জমি উদ্ধারের বাস্তবসম্মত আইনগত বিধান থাকা জরুরি। অকৃষি খাস জমি চিহ্নিতকরণ, বিতরণের জন্য দরখাস্ত আহবান, পর্যালোচনা, তালিকা প্রস্তুত, দখল, অর্পণ ইত্যাদি দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা কমিটির হাতে ন্যস্ত করা উচিত। উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জেলা কমিটিতে আপিল করতে পারবেন– এই বিধান থাকা প্রয়োজন। বন্দোবস্ত প্রদানের পর কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে বন্দোবস্ত বাতিল করার বিধান থাকা দরকার। পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে অকৃষি খাস জমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার জন্য সংশোধিত নীতিমালার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৯) অর্পিত সম্পত্তি: এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ৩.৩ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছ। তবে আইনগত পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন-এর প্রয়োজনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ জরুরি। আগেই বলেছি বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ একর। প্রায় ৬০ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত। অর্পিত সম্পত্তির সাথে অনিচ্ছাকৃত দেশত্যাগ, ভূমি বেদখল, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙ্গনসহ বহুবিধ জটিল সমস্যা জড়িত। এসবসহ যেসব আইনি সমস্যা নিরূপণ করা গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর নিরিখে বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত আইনে ইজারার মাধ্যমে সহঅংশীদারকে মালিকের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৯৩ এর সাথে সাংঘর্ষিক। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২৮ এ অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে এবং প্রকৃত মালিক দখলচ্যুত হলে তার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপনে এই ধারাটি বড় বাঁধা। অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশে যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করা হয় না। ভূমির মালিকের নাম, মৌজা নং, খতিয়ান নং, এবং প্লট নং অনেক ক্ষেত্রেই ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়। এসব বিবেচনায় আইনি পরিবর্তন-সংযোজন-বিয়োজনে আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি হলো নিম্নরূপ: প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৯ (খ)-তে গণ্যমান্য দুই জন ব্যক্তির পরিবর্তে আইনজ্ঞ এবং বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন দুই জনকে জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত; অর্পিত সম্পত্তি আইনের ধারা ২ (ড)-এর সাথে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৯৩-এর যে বিরোধ তা দূর

করা জরুরি; মালিকানার সংজ্ঞায় যে কোনো উপায়ে সম্পত্তির দখলদারকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে প্রস্তাবিত আইনে আমরা শুধু আইনগত উপায়ে সম্পত্তির দখলদারকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছি (বিষয়সমূহ আরো বিবেচনা করা প্রয়োজন)।

(১০) পরিত্যক্ত সম্পত্তিঃ মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানিদের রেখে যাওয়া আবাসিক, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প এলাকা ও অন্যান্য ভূমি পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে অনেক মামলা উচ্চ আদালতে চলমান। এসব মামলার নিষ্পত্তি করে উক্ত সম্পক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ সম্পত্তি সম্পর্কে প্রচলিত মূল দুটি আইন হলো বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি বন্দোবস্ত) আদেশ, ১৯৭২, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালা। পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রধান সমস্যা হলোঃ বর্তমান বাজার দর বিবেচনা না করেই সম্পত্তির মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়। সম্পত্তির তফসিল এবং বিজ্ঞাপন যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় না। দরপত্রের নোটিশ প্রকাশের পর কিছু স্বার্থান্বেষি ব্যক্তি আদালতে স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা দায়ের করে এবং এক পর্যায়ে সফল হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, যেমন-পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি– গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানা– শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিত্যক্ত কৃষি জমি– কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রয়েছে। উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বড় জটিলতা। এসব সমস্যাদি বিবেচনায় এনে আইনগত যে সব পরিবর্তনের কথা বলেছি তা হলোঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঠিক তালিকা প্রস্তুত করে, তা প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন (এ বিষয়ে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া নীতি প্রণয়ন করেছি)। প্রকাশনার ৯০ দিনের মধ্যে বিক্রয় সম্পন্ন করার প্রস্তাব করেছি। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যার অন্যতম দায়িত্ব হবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিক্রয় ত্বরান্বিত করা। প্রস্তাবিত নীতিতে বাজার দর নির্ধারণ করবে ঐ কমিটি।

(১১) ভূমি অধিগ্রহণ: বিষয়টি জটিল। জনস্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হয়। ব্রিজ-কালভার্ট, সেতু, উড়াল সেতু, ইপিজেড, বন্দর, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎস্থাপনাসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে হয়। ভূমি অধিগ্রহণে মূল আইন হলোঃ অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্‌মুভেবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২; এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালা। ভূমি অধিগ্রহণের অনেক সমস্যার মধ্যে অন্যতম নিম্নরূপঃ নোটিশ প্রদানের বিধান থাকলেও তা ঠিকমত পৌঁছায় না; সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পত্তির অবস্থান, আশপাশের স্থাপনা, সম্ভাব্য আয়, জমির উর্বরতা, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয় না; পুনর্বাসনের কোনো বিধান নেই। 'জনস্বার্থ' প্রত্যয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। ফলে অনেক সময় অসৎ উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ হয়ে থাকে। আইনটির শেষাংশে দায়মুক্তির বিধান রয়েছে যা অযৌক্তিক। আইনের আওতায় সম্পাদিত সব কাজ 'সরল বিশ্বাসে' করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এর আওতায় সম্পন্ন কোনো কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা, তদন্ত এবং আইনগত বিচার প্রযোজ্য হবে না। এখানে আইনে ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। 'সরল বিশ্বাসের' সংজ্ঞা আইনটিতে নেই। অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকের কাগজপত্তর অনেক সময় ঠিক থাকে না যেমন মালিকানা দলিল বাবার নামে অথবা নাম খারিজ করা নেই ইত্যাদি, এসবকিছু বিবেচনায় এনে যুক্তিসিদ্ধ সুপারিশ প্রস্তাব হলোঃ সংশ্লিষ্ট এলাকার হাট-বাজারে মাইকিং করে, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে লিফলেট দিয়ে এবং রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে নোটিশ প্রকাশ করা জরুরি; সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য এডিসি রেভিনিউকে প্রধান করে কমিটি করা দরকার; প্রস্তাবিত আইনে 'জনস্বার্থ' প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ভূমি অধিগ্রহণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়মুক্তি সম্পর্কিত বিধানটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে; ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে "সরল বিশ্বাস" এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; এবং অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া আইন প্রণয়ন করেছি।

(১২) ভূমি প্রশাসন: বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, একটি সুদক্ষ ভূমি প্রশাসন জনগণের সম্পত্তির মালিকানা এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করে; যথাযথ ভূমি রেকর্ড–কর আরোপ এবং তা আদায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে; সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; খাস জমির হিসাবরক্ষণ করে। ভূমি প্রশাসন দেশের প্রতিটি জেলা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ভূমি প্রশাসন সম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনসমূহ হলো: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০; প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৪; ভূমি আপিল বোর্ড আইন, ১৯৮৯; ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯; রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮, এবং ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ২০০৩। ভূমি প্রশাসন-এর সমস্যা অনেক, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: ভূমি রেকর্ডের ক্ষেত্রে অনেক বেশি রেজিস্টার (রেজিস্টার I, রেজিস্টার II, রেজিস্টার III....) রাখা হয় যা নিয়মিত আপডেট করা হয় না, করা সম্ভবও হয় না। মিউটেশনের (জমা-খারিজ) জন্য ৪৫ দিন সময় নির্ধারণ করা থাকলেও তা বাস্তবে মানা হয় না। ভূমি রেকর্ডের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো সীমিত। ভূমির জমা-খারিজ (মিউটেশন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারাধীন। কিন্তু ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই দ্বৈততা সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জটিলতর করে। ভূমি অফিসের কর্মচারীরাই অনেক সময় ভূয়া দলিল তৈরিতে সহায়তা করে। এসব সমস্যা এবং ভূমি প্রশাসন গণমুখীকরণের লক্ষ্যে আইনি সুপারিশ দেয়া হয়েছে। ভূমি প্রশাসন একটি বৃহত্তর ধারণা। অন্যান্য আইনের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাদাভাবেই আলোকপাত করা হয়েছে বিধায় কয়েকটিমাত্র সুপারিশ এখানে উল্লেখ করা হলো: একটা ইউনিফর্ম "ভূমি রেজিস্টার" তৈরি করে ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাকে সহজতর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জমা-খারিজ (মিউটেশন) প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য জমা-খারিজ এবং রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা একক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা এবং একটি অফিসের অধীনে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি (কম্পিউটারসহ) ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা হালনাগাদ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসবের পাশাপাশি এ প্রস্তাবও করছি যে জনগণকে তহসিল অফিসে না পাঠিয়ে কাজ হয় কিনা তা নিয়ে পাইলটভিত্তিক এ্যাকশন রিসার্চ করা (যেমন তহসিল অফিসে না যেয়ে নাম খারিজ বা মিউটেশন করা সম্ভব)।

(১৩) ভূমি সংস্কার: বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার খুব প্রয়োজন নেই। তারপরও কয়েকটি উল্লেখ করছি; যেগুলো হলো: একজন ব্যক্তি কী পরিমাণ ভূমির মালিক হতে পারবে তা নির্ধারণ করে ভূমি সংস্কার আইন। ভূমির মালিকানার সাথেই মানুষের সার্বিক জীবিকা জড়িত। ভূমি সংস্কারের অন্যতম একটি বিষয় বর্গা চাষ। দেশের জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্গা অথবা চুক্তিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। উল্লেখ্য যে, ভূমি সংস্কার সংশ্লিষ্ট অনেক আইনের অন্যতম দুটি হলো: ল্যান্ড রিফর্ম অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪; এবং ল্যান্ড রিফর্ম রুলস, ১৯৮৪। এ আইনে মূল সমস্যাদি হলো: ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সামরিক শাসন চলাকালীন সময়ে প্রণীত হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। প্রচলিত আইনে কৃষি ও অকৃষি ভূমির সিলিং নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ২০০৪ এর ইংরেজি অনুবাদে বলা হয়েছে যে "পরিবার যদি ৬০ স্টান্ডার্ড বিঘার ওপরে মালিক থাকে" (দেখুন: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪)। প্রশ্ন হলো 'পরিবার' কি 'খানা' (household)? 'পরিবার' (family) ও 'খানা' (household) তো এক কথা নয়। সংজ্ঞার এ দ্ব্যর্থতা আদৌ সহজ-সরল-নিরীহ কোনো বিষয় নয়। এ থেকে সহজে বলা যায় যে অধ্যাদেশটি সিরিয়াস কোনো কিছু নয়– সামরিক শাসনের আওতায় "পপুলিস্ট' শ্লোগান মাত্র যা সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের জনপ্রিয়তা

বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন ছিলো। এ আইনে বেনামি চুক্তি নিষিদ্ধ করা হলেও তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। বর্গাদার মারা গেলে যদিও উত্তরাধিকারীকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রয়েছে কিন্তু বাস্তবে তা মান্য করা হয় না। আইনগত বিধান থাকলেও বর্গা চাষের জন্য লিখিত চুক্তি করা হয় না। উৎপাদিত ফসল বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মালিক অবৈধ সুবিধা নেয়। সর্বোপরি কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির অদক্ষতা ভূমি সংস্কারে একটি বড় বাধা। এসব সমস্যা বিবেচনায় এনে আইনি সমাধান হিসেবে সুপারিশ হলো: আমরা ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশের পরিবর্তে নতুন একটি ভূমি সংস্কার আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ণ করেছি। কৃষি জমির সিলিং ৪০ বিঘা এবং অকৃষি জমির সিলিং ২০ বিঘা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে অকৃষি জমির জন্য কোনো সিলিং নির্ধারণ করা নেই। বেনামি চুক্তি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে উচ্চহারে জরিমানা প্রস্তাব করা হয়েছে। উপজেলা ভূমি সংস্কার অফিসার (ইউএলআরও) এবং ভূমি সংস্কার পরিদর্শক (এলআরআই) নামে ২টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্গাদার মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী বিষয়টি ভূমি সংস্কার পরিদর্শককে (এলআরআই) জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। লিখিত বর্গা চুক্তির একটি কপি ভূমি সংস্কার পরিদর্শক (এলআরআই)-কে সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উৎপাদিত ফসল বণ্টনের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। রেকর্ডবিহীন লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং লেনদেন করলে পক্ষদ্বয়কে শাস্তি প্রদানের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১৪) ভূমি ব্যবহার (land use): বিষয়টি কয়েকটি কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ। গত ১ দশক (২০০৩-২০১৩) যাবৎ প্রতিদিন গড়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের ৬৬১ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত।[৩৯] কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাওয়ায় গত চার দশকে প্রতিবছর ৪৪ হাজার ২৫৫ জন প্রান্তিক চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এভাবে কৃষিজমি হ্রাস পেতে থাকলে ভবিষ্যতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভূমি ব্যবহার সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইনের (জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১) মূল সমস্যাদি নিম্নরূপ: এ নীতিতে ভূমি ব্যবহারভিত্তিক জোন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিস্তারিত পদ্ধতি আলোচনা করা হয় নি। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্র হিসেবে যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়টি অনুপস্থিত। প্রচলিত নীতিতে অধিগ্রহণকৃত ভূমি মূল মালিকের কাছে ফেরত দেবার কোনো বিধান নেই। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রয়োজন ছিল যা করা হয়নি। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয় নি। ভূমি ব্যবহারের গুরুত্ব এবং প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় এনে আমরা এ সম্পর্কে যে সব আইনি সুপারিশ করেছি তার অন্যতম হলো নিম্নরূপ: ২০০১ সালে প্রণীত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অসম্পূর্ণতা/অস্পষ্টতা থাকায় কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। সেই কারণে আমরা কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত নতুন একটি আইনের খসড়া প্রণয়ণ করেছি। ভূমি ব্যবহারভিত্তিক জোন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিস্তারিত পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা প্রস্তাব করেছি। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্র হিসেবে যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ভূমি মূল মালিকের কাছে যেন ফেরত যেতে পারে সেই বিষয়ে অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্মুভোবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ এর ১৭ ধারায় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী, জাতীয় পর্যায়ের কোনো এনজিও-এর প্রধান এবং জাতীয় পর্যায়ের নারী সংগঠনের চেয়ারম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির কার্যপরিধি আমরা প্রস্তাব করেছি।

---

[৩৯] বিস্তারিত দেখুন, Barkat.A, G.M. Suhrwardy, and A. Osman (2015). Increasing Commercialisation of Agricultural Land and Contract Farming in Bangladesh.

(১৫) ওয়াক্ফ: বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংখ্যা ১৩ হাজার ৮২৭ (পাবলিক: ১১,৫৬০; প্রাইভেট: ২,২৬০; মসজিদ: ৯,৪২৯) যার মোট আয়তন ৬ লক্ষ ৬ হাজার ১০৭ একর। এর বাইরেও অনেক ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে যা রেকর্ড করা হয়নি। আইনের দুর্বলতার কারণে যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যহত হয়। ওয়াক্ফ সম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনসমূহ হলো: ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২; এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩। এসব আইনের অন্যতম সমস্যা: মূলত প্রায়োগিক। প্রায়োগিক এসব সমস্যাই এগুলো সঠিক বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রচলিত আইনের ১৯ নং ধারায় ওয়াক্ফ কমিটি গঠনের কথা থাকলেও গত ২ বছর ধরে এ বিষয়ে কোনো কমিটি পরিপূর্ণভাবে কাজ করছে না। ওয়াক্ফ কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। ওয়াক্ফ সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের বিধান থাকলেও এখনো অনেক সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। অনেকে বিষয়টি জানেও না। তাছাড়া এ নিয়ে কোনো সময়ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। অডিটর নিয়োগের পদ্ধতি স্পষ্ট নয়। এসব বিবেচনায় আইনি পরিবর্তনে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ: প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ওয়াক্ফ প্রশাসক এবং মুতাওয়াল্লীর কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়াক্ফ উপদেষ্টা ও জেলা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিটিতে একজন স্বনামধন্য মুসলিম নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ওয়াক্ফ সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কমিটির কিছু দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ট্রাইব্যুনালের কর্মপরিধি কী হবে তার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১৬) ট্রাস্ট: ট্রাস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে ট্রাস্ট সম্পত্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ট্রাস্ট সম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইন হলো ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২, এবং চ্যারিটাবল এন্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট এক্ট, ১৯২০। ট্রাস্ট আইনে প্রধান কয়েকটি সমস্যা হলো: আইনে ট্রাস্ট শব্দটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা নেই। আইনে ট্রাস্ট সম্পত্তি নিয়মিত অডিটের বাধ্যবাধকতা নেই। ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসে প্রয়োজনীয় জনবল নেই। সকল রেজিস্ট্রিকৃত ট্রাস্টের কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ নেই। প্রচলিত আইনে চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কমিটির কথা আইনে নেই। ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই। ট্রাস্ট আইনে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ: আমরা একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করেছি যার প্রধান ট্রাস্ট কমিশনার থাকবেন যিনি উপসচিব বা জেলা জজ্ পদমর্যাদার নিচে হবেন না। ট্রাস্টের সংজ্ঞাসহ অন্যান্য নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছি। ট্রাস্টের নিয়মিত অডিটের জন্য প্রস্তাব করেছি। ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসের জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি। ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশনের সকল তথ্যের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করেছি। ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছি। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) কমিটির সুপারিশ ও সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ট্রাস্ট সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ট্রাস্ট অফিস পরিদর্শন এবং পরিদর্শন সম্পর্কিত সকল তথ্য কমিটিকে প্রেরণ করবেন– এ প্রস্তাব করেছি। চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সংজ্ঞা দিয়েছি।

(১৭) দেবোত্তর সম্পত্তি: ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৫ শতাংশ হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কাজের অন্যতম পদ্ধতি হলো দেবোত্তর সম্পত্তি। দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক। দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইন হলো ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (ধারা ৬, ৬ক, ১০ক, ৫৪), ১৯২০ সালের চ্যারিটাবল এন্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট এক্ট এবং ১৯৫৬ সালের মেমো নং-১০২৯১। দেবোত্তর সম্পত্তির অন্যতম প্রধান সমস্যা

হিসেবে উদঘাটিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ কত– এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান নেই। অব্যবস্থাপনা এবং আইনের দুর্বলতার সুযোগে অনেক জায়গায় দেখা গেছে দেবোত্তর সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত মামলার পরিমাণও বাড়ছে। সেবায়েত/কমিটির অযোগ্যতা এবং তাদের সততার অভাব। অননুমোদিত হস্তান্তর। অদক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার। দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আধুনিক ও সৃজনশীল পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এসব বিবেচনায় দেবোত্তর সম্পত্তি আইন সংশ্লিষ্ট আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ: দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের খসড়া প্রণয়ণ করেছি। খসড়া আইনে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগ এবং আইন বিভাগের একজন করে অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন এ্যাডভোকেটকে এই বোর্ডের সদস্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খসড়া আইনে যে জেলা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে তাতে দেওয়ানি এবং হিন্দু আইনে অভিজ্ঞ আইনজীবীকে নিয়োগের ক্ষমতা জেলা বার এসোসিয়েশনের সভাপতিকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১৮) ভূমি জরিপ: বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, ভূমি জরিপ ও ভূমির মালিক/দখলদার সম্পর্কিত কাগজপত্র প্রণয়ন ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মাঠ পর্যায়ে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমির স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা হয়। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ায় ভূমির ওপর চাপ অত্যধিক বিধায় কাজটি জটিল এবং স্পর্শকাতর। ভূমি জরিপ সম্পর্কিত মূল আইনসমূহ হলো ভূমি জরিপ আইন ১৮৭৫, প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫, এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০। এ আইনে প্রধান কয়েকটি সমস্যা হলো: জরিপ ব্যবস্থা দুয়ের অধিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয় যা জটিলতা সৃষ্টি করে। ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে ৯ থেকে ১১টি ধাপ শেষ করে তারপর খতিয়ান তৈরি করা হয়। এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। দেখা গেছে একটা ধাপ শেষ হওয়ার ১০ বছর পরও আরেকটি ধাপ শুরু হচ্ছে না। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যত অনুপস্থিত। অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করে জরিপ পরিচালিত হয়। ফলে পরবর্তীতে জবাবদিহিতার সময় দেখা গেছে তাদের উপস্থিত করা যাচ্ছে না। জরিপ কাজে ধীরগতি এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ না হওয়ার অন্যতম কারণ জেলা পর্যায়ে জরিপ অধিদপ্তরের স্থায়ী কার্যক্রম না থাকা । এসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে কৃষি-ভূমি সংস্কার ত্বরান্বয়নে আমরা ভূমি জরিপ সম্পর্কিত সবধরনের আইন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করেছি; ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভূমি জরিপের ধাপগুলো কমিয়ে আনার প্রস্তাব করেছি; জেলা পর্যায়ে ভূমি জরিপের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেছি। জেলা পর্যায়ে ভূমি জরিপ কাজ তদারকির জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জরিপ) পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছি।

(১৯) ভূমি রেজিস্ট্রেশন: ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে ভূমি রেজিস্ট্রেশন একটি অপরিহার্য প্রামাণিক দলিল। এ খাত থেকে সরকার বেশ রাজস্ব আয় করে থাকে। তবে, এ খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা এখনকার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার মূলে রয়েছে ভূমি নিয়ে বিরোধ। ভূমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতাই ভূমি নিয়ে বিরোধের অন্যতম কারণ। ভূমি রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট মূল আইন হলো রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮। এ আইনে সমস্যা নিম্নরূপ: রেজিস্ট্রেশন অফিসে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যত অনুপস্থিত; রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কার্যকারিতার সময় নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে; প্রচলিত বালাম ব্যবস্থার কারণে রেজিস্ট্রেশনে প্রচুর সময় লাগে; দলিল সম্পাদনকারীর সরবরাহকৃত তথ্যে বাবার নামের সাথে মায়ের নাম রাখার বিষয়টি এখনো ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক না; রেজিস্ট্রেশন অফিসের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ভূয়া দলিল অথবা দলিল জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুস্পষ্ট বিধান নেই। এসব জটিলাদি

বিবেচনায় ভূমি রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা নিম্নরূপ: রেজিস্ট্রেশন অফিসে কার্যকর ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; রেজিস্ট্রিকৃত দলিল যেদিন সম্পাদন করা হবে সেদিন থেকে তা কার্যকর করতে হবে; দলিল সম্পাদনকারীর সরবরাহকৃত তথ্যে মায়ের নাম এবং বাবার নাম রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে; প্রচলিত বালাম ব্যবস্থা পরিহার করতে হবে; রেজিস্ট্রেশন অফিসের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ভূয়া দলিল অথবা দলিল জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে চাকরি থেকে বরখাস্তকরণসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান চালু করতে হবে।

(২০) আদিবাসীদের ভূমি আইন (বন আইনসহ): ভূমি এবং বনের সাথে আদিবাসীদের জীবনজীবিকা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আদিবাসীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আগেই বলেছি যে সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে ২৭টি "নৃগোষ্ঠির" (সরাসরিভাবে এরা 'আদিবাসী' মানুষ হিসেবে স্বীকৃত নয়) ২৫ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ১.৭%) বসবাস করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এদেশে কমপক্ষে ৪৯টি বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছেন যাদের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ৩.৪ শতাংশ (৩.৪ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে)। আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনসমূহ হলো ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (ধারা ৯৭); ভূমি খতিয়ান অধ্যাদেশ, ১৯৮৪; ১৯০০ সালের রেগুলেশন; ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ; বন আইন, ১৯২৭; এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১। আদিবাসীদের ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (আইনসহ)-র প্রধান কয়েকটি সমস্যা নিম্নরূপ: বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারায় সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সুরক্ষার কথা থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকর নয়। বল প্রয়োগ, জাল দলিল, বাঙালিকে আদিবাসী হিসেবে উপস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত বিরোধ নিরসনের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা (কোর্ট, ট্রাইব্যুনাল, কমিশন) নেই। ১৯০০ সালের রেগুলেশনে দলিল রেজিস্ট্রেশনের যে বিধান রয়েছে তাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি অনুপস্থিত। রেজিস্ট্রেশন ফর্মে প্রার্থীর মা এবং বাবার নাম লেখার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা নেই। ১৯০০ সালের রেগুলেশনে ১৯৮৯ সালের জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারার বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ১৯৫৮ সালের রেগুলেশনে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পুনর্বাসনের বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই। এই আইনের আওতায় প্রদত্ত অধিগ্রহণের নোটিশ যথাযথভাবে ভুক্তভোগীদের নিকট পৌঁছায় না। এই আইনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিষয়াদি অপর্যাপ্ত। আইনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য 'জনস্বার্থ' (public purpose) বিষয়টির ব্যাখ্যা থাকা জরুরি যা ১৯৫৮ সালের রেগুলেশনে অনুপস্থিত। ১৯৮৪ সালের ভূমি খতিয়ান অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভূমি খতিয়ান তৈরির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করার কোনো বিধান নেই। ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে ছয় মাসের মধ্যে বিধি প্রণয়নের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভূমি কমিশনে আবেদনের সুবিধার্থে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করার বিধান থাকলেও এখন পর্যন্ত রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবনে কোনো শাখা খোলা হয়নি। ভূমি কমিশনের মিটিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এখনো অনেক জটিলতা রয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি অনুপস্থিত। ১৯২৭ সালের বন আইনে বনের কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। সংরক্ষিত বন ঘোষণার নোটিশ যথাযথভাবে ভুক্তভোগীদের নিকট পৌঁছায় না। ১৯৮২ সালের আতিয়া বন সংরক্ষণ আইনে সংরক্ষিত বন ঘোষণায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণের কোনো অধিকার দেয়া হয়নি। এসব সমস্যা বিবেচনায় আইনগত বিষয়ে আমাদের অন্যতম সুপারিশ-প্রস্তাব হলো: জেলা ও দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক নিয়ে আদিবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে যা সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করবে; বল প্রয়োগ, জাল দলিল,

বাঙালিকে আদিবাসী হিসেবে উপস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় তদন্ত এবং সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের হাতে ন্যাস্ত থাকবে; প্রস্তাবিত সংশোধনীতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ সালের ধারা-৯৭ এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান পরিবর্তন করে নতুন করে ১ (এক) মাস কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখতে হবে; প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে তিনি হাইকোর্টে আপিল করতে পারবেন। ১৯০০ সালের রেগুলেশনে দলিল রেজিস্ট্রেশনের যে বিধান রয়েছে তাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত প্রত্যেকটি আইনে "উপজাতি" শব্দটির পরিবর্তে "আদিবাসী" প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব ছাড়াও আদিবাসীদের ভূমি-বন সংশ্লিষ্ট আইনে আরো যেসব পরিবর্তন-প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে প্রার্থীর মা এবং বাবার নাম লেখার বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে; ১৯০০ সালের রেগুলেশনে ১৯৮৯ সালের জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারার বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। যে সব ভূমি বিরোধের বিষয় ভূমি কমিশনের এখতিয়ারে সে সব বিষয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) আওতায় নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদকে ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে ১৯৮৯ সালের জেলা পরিষদ আইন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংশোধন করতে হবে। আদিবাসীদের জন্য ১৯৫৮ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত রেগুলেশনের পরিবর্তে নতুনভাবে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন ও বিধিমালা, ২০১৪ এবং পুনর্বাসন (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৫ প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। অধিগ্রহণের নোটিশ যথাযথভাবে ভুক্তভোগীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের দেয়ালে ঝুলিয়ে, গণমাধ্যমে প্রচার করে, স্থানীয় হাট-বাজারে ঢোল বাজিয়ে, মাইকিং করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য এডিসি রেভিনিউকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের ভূমি খতিয়ান অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভূমি খতিয়ান তৈরির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনার বিধান থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি কমিশনে আবেদনের সুবিধার্থে রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবনে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি আইনে প্রস্তাব আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৭ সালের বন আইনে বনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই আইনের আওতায় ঐতিহাসিকভাবে বনে বসবাসকারীদের "প্রথাগত বনবাসী" স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের আতিয়া বন সংরক্ষণ আইনে সংরক্ষিত বন ঘোষণায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ পদমর্যাদার কোনো বিচারককে সালিশকারী হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতির নিরিখে সংশ্লিষ্ট আইনগত যে সব প্রস্তাব করা হলো সে সম্পর্কে আপাতত শেষ কথা হতে পারে এরকম:

(১) বাংলাদেশের ভূমি আইন সংশ্লিষ্ট যেসব আইনি সংস্কার (পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন) প্রস্তাব করা হলো তা রাষ্ট্র এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হোক।

(২) আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠিসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সঠিক এবং নৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ব্যতিত এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

(৩) রাজনৈতিক সদিচ্ছার মত গণমানুষের সম্পৃক্ততাও আইন বাস্তবায়নে সমান জরুরি।

(৪) আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে চাই আদিবাসী মানুষের কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন কর্তৃক সমগ্র কর্মকাণ্ডের নিবিড় পরিবীক্ষণ।

৩.১২ কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট সমবায়: বাস্তবে অনুপস্থিত কিন্তু ভাবনা জরুরি

বাংলাদেশে গ্রামের মানুষের যৌথ উৎপাদনের কল্যাণকামী সংগঠন অর্থাৎ গণমুখী গ্রামীণ সমবায় বলে তেমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অথচ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হিসেবে গণমুখী গ্রামীণ সমবায় নিয়ে ভাবনাটা জরুরি। কেন? বাংলাদেশে ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকেরা দরিদ্র। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক যত রূপ আছে সবই তাদের জন্য প্রযোজ্য। এসব দরিদ্র কৃষকেরা প্রায় সব মাপকাঠিতেই বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত। সরকারি দারিদ্র্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট তথ্য যাই বলুক না কেন দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকের মোট সংখ্যা আসলে কমছে না, তা বাড়ছে। ইতিমধ্যে সারণি ৪-এ প্রদত্ত আমার হিসেবে ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে গ্রামীণ ১২ কোটি ১৬ লক্ষ জনসংখ্যার (দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ) মধ্যে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষ (অর্থাৎ যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ এবং মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ)। গ্রামীণ ভূমিহীন-প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান: ১৯৮৪ সনে এ সংখ্যা ছিল ৬ কোটি আর ২০১২ সালে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ। অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রচলিত অর্থে 'উন্নয়ন'-এর অনেক মানদণ্ডে দেশে বেশ কিছু 'উন্নতি' হলেও গ্রামীণ ভূমিহীন-প্রান্তিক দরিদ্র জনমানুষের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া লক্ষণীয় তা হলো দরিদ্রায়ন থেকে নিঃস্বায়ন, আর নিঃস্বায়ন থেকে ভিক্ষুকায়ন (from poverty to impoverisation to beggarisation)। যে প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান রূপ হলো গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়া, যাকে এক কথায় বলা চলে "গলাধাক্কা অভিবাসন" (rural to urban forced migration)। এই গলাধাক্কা অভিবাসনের ফলে দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয়েই শহরে আসছেন, আর যেহেতু পাশাপাশি তেমন শিল্পায়ন হচ্ছে না তাই তারা স্বল্প মজুরির অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন – অর্থাৎ সম্ভবত গ্রামীণ অভিবাসিত দরিদ্র মানুষ শহরে এসে আরো দরিদ্র হচ্ছেন। গ্রামীণ দারিদ্র্যের এ চিত্র আসলে দরিদ্র-বিরোধী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নেরই প্রতিফল। এ অবস্থা থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হতে পারে গণমুখী গ্রামীণ সমবায় গঠন (এ প্রসঙ্গে পরে আসছি)।

উপরে যা বললাম তা হলো মুদ্রার একপিঠ। মুদ্রার অন্য পিঠ হলো বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তিগত রূপান্তর ঘটেছে। কৃষিতে ভূমিহীনতা বাড়া, জমি-জলা-জঙ্গল জবরদখল বাড়া, আর কৃষির সাথে শিল্প খাতের বিনিময় হার কৃষির বিপক্ষে থাকলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনে আমরা এখন পৃথিবীর ১০তম সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশ (আমাদের বর্তমান খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বছরে মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টন)। এসবে কৃষির উন্নতি (খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণের নিরিখে) হলেও কৃষকের তেমন কোনো লাভ হবে না।[৪০] 'সবুজ বিপ্লব' আর 'সাদা বিপ্লব' হয়েছে/হচ্ছে। যেমন: (ক) গত ৫০ বছরে আবাদি জমি ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর থেকে কমতে কমতে এখন এসে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ একরে অথচ একই সময়ে মোট চাল উৎপাদন বেড়েছে বছরে ৮০ লক্ষ টন থেকে এখন ৩ কোটি ২০ লক্ষ টনে - এসব **সবুজ বিপ্লবের** প্রতিফলন। (খ) পাশাপাশি হয়েছে **সাদা বিপ্লব**। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বছরে তরল দুধের উৎপাদন ছিল ৫ লক্ষ টনের মত যা এখন ২৫ লক্ষ টন; একই সময়ে বছরে ডিমের উৎপাদন বেড়েছে ১৩০ কোটি থেকে প্রায় ৬০০ কোটিতে আর মাছের উৎপাদন বেড়েছে বছরে ৮ লক্ষ টন থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টন (যার ৮০ শতাংশই অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও পুকুরে)। (গ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বেড়েছে ফলে খামারের কাঠামোতে পরিবর্তন

[৪০] মন্ডল এম. এ. সাত্তার (২০১২). "বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর: সম্ভাবনার শেষ নেই", পৃ. ৬।

হয়েছে: খামারের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আবাদি জমি হ্রাস পেয়েছে; প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে; জমির খণ্ডায়ন ও বিভাজন বেড়েছে আবার পাশাপাশি কৃষি জমির মালিকানা কিছু মানুষের হাতে পুঞ্জিভুত হয়েছে; কৃষিজ উৎপাদন উপকরণের দাম বাড়ার ফলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ছিটকে পড়ছে; ভূমিহীন খানার সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে যাদের বড় অংশ এখন কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ অকৃষি খাতে নিয়োজিত (বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে অকৃষি কর্মকাণ্ডের বাজার বিস্তৃত হয়েছে); কেনা শ্রমের উপর নির্ভরশীল কৃষকের অবস্থা খারাপ হয়েছে; সনাতনী ভাগচাষ-এর বদলে এসেছে 'বিপ্রতীপ বর্গা', বেড়েছে বছর চুক্তিতে বা নগদ অর্থে বর্গা প্রথার প্রচলন এবং বেড়েছে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় অর্থকরী ফসল-ফল-মাছ চাষ; এসবের পাশাপশি কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহারও বেড়েছে (যেমন যন্ত্রচালিত লাঙ্গল, সেচের যন্ত্রপাতি, উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার, শস্য বহুমুখীকরণ কর্মকাণ্ড ইত্যাদি) যা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে; আর পাশাপাশি নতুন বিষয় হিসেবে এসেছে "গৃহাঙ্গনে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা" যা হতে পারে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে আয় বাড়নোর সহায়ক পদ্ধতি। এসবই মুদ্রার অন্য পিঠ। মনে রাখা জরুরি যে ২০২১ সাল নাগাদ (অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ) আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ আরো কমে যাবে, কৃষি খামারের সংখ্যা হবে ২ কোটি আর গড় খামারের আয়তন হবে ১ একর, কিন্তু বাড়ছে খাদ্য চাহিদা – চাল-গমসহ মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-ফলমূলসহ পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা।[৪১] আমার মতে এসব চাহিদা মেটানোর জন্য একদিকে যেমন প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে তেমনি অন্যদিকে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ গণমুখী সমবায় গঠনের বিকল্প নেই।

কিন্তু আমাদের কৃষিতে প্রযুক্তি-ব্যবহার চাহিদা ও বিনিয়োগ চাহিদা বাড়ানোর যুক্তি থাকলেও কাঠামোগত কারণেই এ বৃদ্ধির সীমানা আছে। আর এ সীমানা যা দিয়ে নির্ধারিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো কৃষির সাথে শিল্প খাতের বিনিময় হার। ব্যাপারটি এরকম: কৃষি পণ্যের বিনিময় হার শিল্প পণ্যের তুলনায় সবসময়ই কৃষির প্রতিকূল। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ বাজারব্যবস্থায় মূল্যের রাজনীতি অথবা মূল্যের রাজনৈতিক বিধি ("Political Pricing") কাজ করে। রাজনৈতিক এ মূল্যবিধি নির্ধারণ করে বাজার নয়– বাজারের সবল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বলের উপর এ বিধি চাপিয়ে দেয়। এটাকে বলে "থুসোডাইডেস নীতি" যে বিধির কথা এডাম স্মিথ ও উইলিয়াম পেটির মত ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদেরাও উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি সহজে এরকম: আমাদের দেশে ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকেও ১ মন ধান বিক্রি করে ১ বস্তা ইউরিয়া সার কেনা যেতো (সেখানেও কৃষি-বিরুদ্ধ মূল্যবিধি কাজ করত) আর এখন ২০১৬ সালে ১ বস্তা ইউরিয়া সার কিনতে কৃষককে ২ মন ধান বেচতে হচ্ছে। ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ১ ড্রাম ডিজেল কিনতে সেচযন্ত্রের মালিককে ৮ মন ধান বেচতে হতো আর এখন ২০১৬ সালে ১ ড্রাম ডিজেল কিনতে বেচতে হয় ২৯ মন ধান। ১৯৯০ সালের দিকে ১৬০ মন ধান বেচে ১টি পাওয়ার টিলার কেনা যেতো আর এখন ২০১৬ সালে ঐ পাওয়া টিলারটি কিনতে কৃষককে বেচতে হয় ২০০ মন ধান। শিল্প পণ্যের তুলনায় কৃষি পণ্যের বিনিময় হারের ঐ ধরনের ক্রমউর্ধ্বগতিসম্পন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হয়তোবা আরো বেশকিছু সময় (সামনের কয়েক বছর) কৃষি উৎপাদন বাড়বে কিন্তু তাতে করে একদিকে যেমন কৃষকের কোনো লাভ হবে না আর অন্যদিকে কৃষিতে উৎপাদিকাশক্তির ইচ্ছে নিরপেক্ষ বৃদ্ধির স্বার্থে একসময় বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কটিই ভেঙ্গে পড়বে।

কৃষি পণ্যের বাজার মূল্য সংশ্লিষ্ট সমগ্র বিষয়টির গুঢ় অর্থ অনুধাবনে আরো একটি চলমান বিষয় উল্লেখ জরুরি। উৎপাদন খরচের চেয়ে ধানের বাজার দর অনেক কম হওয়ায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা এখন মহাসড়কে ধান ফেলে প্রতিবাদ করছে (ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৭ মে ২০১৬ ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর মহাসড়কে; দেখুন, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৬)। ধান উৎপাদনে মনপ্রতি ব্যয় কমপক্ষে ৭০০ টাকা (যে হিসেবে কৃষক তার নিজের শ্রম ও পরিবারের সদস্যদের শ্রম হিসেব করেন না) আর বিক্রয় মূল্য (বাজার দর) মনপ্রতি ৪৫০ টাকা। অর্থাৎ ধান চাষে কৃষকের মনপ্রতি ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২৫০ টাকা। এ অবস্থায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের কৃষক উপেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "এবার ধান বেচায়ে খরচ উঠিবে না। ধান আবাদ করিয়া হামার অবস্থা শেষ হয়ে গেইছে। ধারদেনা করিয়া আবাদ করছ। ধারদেনা শোধ করিবার লাগি বাধ্য হয়া কম দামে ধান বিক্রি করিবা লাগছু।" আর একই উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক গণেশ রায় কতদূর হতাশ-নিরাশ যখন বলেন

[৪১] মন্ডল এম. এ. সাত্তার (২০১২). "বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর: সম্ভাবনার শেষ নেই", পৃ. ২-৬।

"দাম না পেয়ে আমরা যখন ধান আবাদ ছাড়ি দিব, তখন সবাই বুঝবে" (দেখুন, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৬, পৃ. ২)।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন হচ্ছে এবং আমাদের যে অসীম সুপ্ত সম্ভাবনা আর পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে নিরন্তর মন্দাবস্থা ও সংকট দেখা যাচ্ছে তাতে আমি নিশ্চিত যে উন্নয়নের জন্য প্রচলিত-সনাতনি ভাবনা ছেড়ে আমাদের নতুন ভাবনা ভাবতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে এজন্যও যে বৈশ্বিক অর্থনীতি স্থির নয় নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং ইতিহাস হামাগুড়ি দিয়ে চলে না তা লাফ দেয় (History does not crawl, it jumps)। এ কথা স্পষ্ট বুঝতে হবে যে বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে এখন চলছে উল্লম্ফন, ঘটছে ভৌগলিক স্থানান্তর– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপ থেকে এ ভরকেন্দ্র স্থানান্তরিত হচ্ছে এশিয়ার দিকে (চীন, ভারত হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত)। এ ভরকেন্দ্র যাচ্ছে সে দিকে যেখানে জনসংখ্যা তুলনামূলক বেশি। আর তাইই ভাবনার বিষয় হবে অন্যদের তুলনামূলক অসুবিধাগুলো (comparative disadvantages) কি কি আর পাশপাশি ওসবে আমাদের তুলনামূলক সুবিধাগুলো (comparative advantages) কি কি যা নিয়ে আমরা সামনে এগুতে পারি। আমাদের এখন ভাবতেই হবে সম্পদের নতুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার কথা– যেখানে সম্পদ বলতে বুঝি: (১) মানব সম্পদ (শ্রম সম্পদসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত মানুষ), (২) প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ মাটির উপরের ও মাটির নিচের সম্পদ, পানির মধ্যের ও পানির নিচের সম্পদ (যেমন বঙ্গোপসাগর), এবং (৩) আকাশ-বাতাস-মহাকাশ সম্পদ। মনে রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে, আর ক্রমবর্ধমান মানব সমাজ খাদ্য-খাবার-এর চাহিদা বাড়াবে– অনেকগুণ, কিন্তু সরবরাহের ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হচ্ছে– প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট অনেক কারণে। আর এসবে নিঃসন্দেহে অন্যদের তুলনায় আমাদের নিরঙ্কুশ সুবিধার ক্ষেত্র হলো বৃহত্তর অর্থের কৃষি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং মানবসম্পদ। আমরা যদি চাই তাহলে অবশ্যই পারি কৃষিকে সুসংহত করে নিজেদের খাদ্য-পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে কৃষি-পণ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে অনুপ্রবেশ করতে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাথে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সম্মিলন ঘটাতে হবে যেখানে গণমুখী সমবায় হতে পারে অন্যতম অনুষঙ্গ।

আগেই বলেছি সমবায় বলতে আমি বুঝি মানুষের যৌথ উৎপাদনের কল্যাণকামী সংগঠন। গণমুখী সমবায় একদিকে যেমন হতে পারে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ আর অন্যদিকে তা হতে পারে দারিদ্র্য দূর করার সংগঠিত শক্তিশালী বাহক। সমবায় হতে পারে বিভিন্ন ধরনের, যেমন কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক উৎপাদনী সমবায়, ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক সমবায়, বিপণন (বাজারজাতকরণ) সমবায়, উৎপাদনী-উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় সমবায়, ভোক্তা সমবায়, সমজাতীয় পেশাভিত্তিক সমবায় (কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতি ইত্যাদি), নারী সমবায়। আবার কৃষিভিত্তিক সমবায় হতে পারে শস্য-কৃষিজ সমবায়, মৎস্যজীবী সমবায়, বনায়ন সংশ্লিষ্ট সমবায়। সব সমবায়-এর মূল লক্ষ্য সম্পদের উৎপাদন-পুনরুৎপাদন-বিনিময় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমবায়ীদের কল্যাণে যৌথভাবে সংগঠিত ও পরিচালন করা।

বাংলাদেশে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের যে হাল অবস্থা আর সেইসাথে সার্বিক উন্নয়ন প্রবণতা যা তা থেকে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হিসেবে ঐ সকল কৃষক গঠন করতে পারেন কৃষিভিত্তিক উৎপাদনী সমবায়, বিপণন সমবায়, উৎপাদন উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সমবায়, ভোক্তা সমবায়, নারী সমবায় এমনকি কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায়-শিল্প। কৃষিভিত্তিক ও কৃষিকেন্দ্রিক এ সব সমবায় গঠনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী। যেমন এ ধরনের সমবায় গঠনের ফলে সরাসরি যে সব অভিঘাত পাওয়া সম্ভব তার মধ্যে অন্যতম হলো: শ্রমের ফলপ্রদতা/কার্যকারিতা (efficiency) বৃদ্ধি; শ্রমের উৎপাদনশীলতা (productivity) বৃদ্ধি; মোট উৎপাদন বৃদ্ধি; বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ সুপ্রশস্তকরণ; দরিদ্র মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি-সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজির গুণ-মান বৃদ্ধি; দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তাদের প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ যা হতে পারে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তৃতির মাধ্যমে সার্বিক অর্থনীতি টেকসইকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং একইসাথে বিশ্ববাজারের ওঠা-নামা সংশ্লিষ্ট ও নির্ভরশীলতা থেকে স্বদেশি অর্থনীতিক সচল রাখা; খণ্ডিতকরণ প্রক্রিয়া থেকে কৃষি জমি রক্ষা এবং একই সাথে গুটিকয়েক মানুষের হাত থেকে কৃষি জমিসহ জলাভূমির পুঞ্জিভূতকরণ রোধ; বৃহত্তর কল্যাণে ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন সম্ভাবনা বৃদ্ধি; এবং সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞান-

প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ভিত্তি সুপ্রশস্ত করার ফলে দরিদ্র মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম (সফল সমবায়ী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে) যখন তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মত সামাজিক উৎপাদন খাতের দায়-দায়িত্ব নিজেরাই বহন করতে সক্ষম হবেন।[৪২]

উৎপাদন অথবা বিপণন (বাজারজাতকরণ) অথবা ভোক্তা সমবায় কোন নতুন ধারণা নয়। এ দেশে সমবায়ের ইতিহাস প্রায় ৫০০ বছর। সরকারের খাতায় রেজিষ্ট্রিকৃত বিভিন্ন ধরনের সমবায়ের সংখ্যা হবে লক্ষাধিক (যেমন কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬৯ হাজার)। তবে ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের সমবায় গঠন করে টেকসইভাবে দারিদ্র ঘুচিয়েছে এবং জীবন মান-এ যথেষ্ট পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে – এ ধরনের উদাহরণ দেশে নেই বললেই চলে। কেন? আমার মনে হয় সমবায় নিয়ে নতুন ভাবনা ভাববার জন্য এখন প্রশ্ন করার সময় এসেছে– গলদটা কোথায়? এ প্রশ্নের সম্ভাব্য একটা উত্তর পাওয়া যায় ১৯৭২ সালে ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ, যেখানে তিনি বলেছিলেন "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে **গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে** অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ... কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক– গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভূঁয়া সমবায় কোনো মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন– কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।"

কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট সমবায় নিয়ে বক্তব্য-বিশ্লেষণ আপাতত শেষ করা যেতে পারে এ কথা বলে যে যেহেতু আমাদের সংবিধান মালিকানার নীতি বিষয়ে ১৩নং অনুচ্ছেদে বলছে গুরুত্বক্রম অনুসারে রাষ্ট্রে মালিকানা ব্যবস্থা হবে প্রথমত রাস্ট্রীয় মালিকানা, **দ্বিতীয়ত সমবায়ী মালিকানা**, তৃতীয়ত ব্যক্তিগত মালিকানা; যেহেতু ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য নিরসনসহ দেশের সমগ্রক উন্নয়নে তাদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমবায়ের আছে অসীম সুপ্ত সম্ভাবনা; আর যেহেতু আমরা জাতিগতভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির সময়ে আমরা এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবো যা হবে অসাম্প্রদায়িক-প্রগতিশীল-উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র এবং একই সাথে স্বল্প বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের দেশ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের সমাজ (রূপকল্প ২০২১)– সেহেতু আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস দরিদ্র মানুষের সমবায় হওয়া উচিত এসব বিনির্মাণে অন্যতম ভিত্তি-শক্তি। আর তাইই যদি হয় সেক্ষেত্রে আমার সরাসরি প্রশ্ন– দেশের দুই কোটি বিঘা খাস জমি-জলার একাংশে ৫ কোটি দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক গ্রামীণ মানুষের উৎপাদনী সমবায়, উৎপাদনী উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় সমবায়, এবং সংশ্লিষ্ট বিপণন (বাজারজাতকরণ) সমবায় প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে বাঁধা কোথায়? আমার মনে হয় ভাবনাটা অন্তত শুরু করা জরুরি।

[৪২] বারকাত, আবুল (২০১২গ). "গণমুখী সমবায় আন্দোলন: কৃষকের দারিদ্র্য মুক্তির অন্যতম পথ"।

৩.১৩। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

অনেকেই মনে করেন 'বিজ্ঞান প্রযুক্তি' শ্রেণি নিরপেক্ষ (class neutral) বিষয়। আর এ কারণেই মনে করেন যে 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের' মত শ্রেণি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে এও মনে করেন যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নততর ব্যবহার করতে পারলে রাজনৈতিক অর্থের কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে মনে করেন কৃষিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারে খাদ্য-শস্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হলে মানুষের খাদ্যাভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আর থাকবে না এবং সে কারণে মনে করেন কৃষিতে জমি-জলার মালিকানাজনিত বণ্টন ন্যায্যতার প্রসঙ্গটি অকেজো-অকার্যকর-যুক্তিহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষির দ্রুত প্রবৃদ্ধি, কৃষিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, এবং কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ালেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ নিয়ে গুরুতর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপনের আগে শুধুমাত্র স্মরণ করে দিতে চাই যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনবান দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা অর্থনীতিবিদ রস্টোর ভাষায় উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে "High mass consumption society"। ঐ যুক্তরাষ্ট্রে কেন এত বৈষম্য-অসমতা-'রেন্ট-সিকার'দের দৌরাত্ম যখন এই ২০১৩ সালেও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজকে "The Price of Inequality" শিরোনামের গ্রন্থ রচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সাবধান করতে হয় যে এভাবে এগিয়ে গেলে "সামাজিক সংঘর্ষ"; "শ্রেণি সংঘর্ষ" অনিবার্য (যা সামলানো দুঃসাধ্য হতে পারে)?

একথা অনস্বীকার্য এবং স্বাভাবিকও বটে যে কৃষিজ উৎপাদনের ধারা-ধরন-পদ্ধতি-বৈচিত্র্য (pattern, type, method, diversity) এবং উৎপাদিত খাদ্য শস্যের পরিমাণগত দিক থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষিতে 'বিপ্লব' হয়েছে– হয়েছে 'সবুজ বিপ্লব' (ফসল), 'সাদা বিপ্লব' (ডিম, দুধ), 'রূপালি বিপ্লব' (মাছ); আর সামনে আছে আরো 'রঙিন-রঙিন বিপ্লব'। এ কথা সত্য যে কৃষিতে অনেক বিপ্লব হয়েছে, সামনে আরো রঙ-বেরঙ-এর বিপ্লব হবে। আর সেইসাথে এ কথাও সত্য যে কৃষিতে যত রঙ-এর বিপ্লবই হোক না কেন কোনো রঙ টিকবে না যদি প্রত্যক্ষ উৎপাদক (অর্থাৎ সরাসরি কৃষক) জমির মালিকানা না পান এবং একই সাথে যদি তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মোট কৃষি জমি কমলেও বেড়েছে নিট কৃষি জমি। যেমন, এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উদ্ভূত উচ্চ ফলনশীল ফসল আসার আগে (১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে) এক বিঘা জমিতে বছরে যখন এক ফসল হতো তখন ঐ জমির মোট ও নিট আয়তন (gross cultivated area and net cultivated area) ছিল একই সমান– অর্থাৎ ১ বিঘা। কিন্তু ১৯৬০ এর মাঝামাঝি সময় থেকে যখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উদ্ভূত উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ শুরু হলো এবং ১ বিঘা জমিতে বছরে ২ বার ধান চাষ করা সম্ভব হলো তখন কিন্তু ঐ ১ বিঘা জমির মোট আয়তন (gross area) ১ বিঘায় থেকে গেল কিন্তু নিট আয়তন হয়ে গেল ২ বিঘা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তো অদূর ভবিষ্যতে সে পর্যন্তও পৌঁছাবে– যা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই– যখন সুউচ্চ অট্টালিকা যেমন ২০ তলা হয় তেমনি ঐ ১ বিঘা কৃষি জমি ২০ তলা বিশিষ্ট কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হবে; যে জমির বিভিন্ন তলায় বিভিন্ন ফসল হবে এবং প্রত্যেক তলায় বছরে ৩টি করে ফসল হবে। তখন ঐ একই মোট আয়তনের ১ বিঘা জমির নিট আয়তন হয়ে যাবে ৬০ বিঘা, আর মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩০ গুণ বেশি (আরো বেশি উচ্চফলনশীল জাত আবিষ্কার করলে তা এখনকার তুলনায় ১০০ গুণ বেশি হতে পারে!)। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের মূল আধেয় মালিকানা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে তাতে করে কি সমাজে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস পাবে? তাতে করে কি বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে? তাতে করে কি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবন-সমৃদ্ধি প্রকৃত অর্থেই বাড়বে? এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নামে কৃষিতে যে 'টার্মিনেটর টেকনোলজি' আসছে তার আশু ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল নিয়ে কি অর্থনীতি শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা ভাবছেন? আরো আছে। কৃষিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এখন ব্যাপকহারে "জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড" (GMF) উৎপাদন করছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক-বিস্তৃত-বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ উদ্ভূত 'টার্মিনেটর টেকনোলজি' ও 'জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড'– এসবের বিস্তৃতির ফলে মানুষসহ প্রাণিকুলের স্বাস্থ্যগত-শরীরগত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশসহ সমগ্র প্রকৃতির উপর বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়-সম্ভাবনার কথা সম্পর্কে অর্থনীতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের ধারণা কী? আমার ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে অর্থনীতি

শাস্ত্রের পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে "আপনারা প্রযুক্তির দাস হবেন না-কি প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণের দাস বানাবেন" (?)– আর সিদ্ধান্তটা নিতে হবে এখনই। আমার ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্রের অধিকাংশ পণ্ডিতই এ বিষয়ে ফলপ্রসূ কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না কারণ তারা মেনেই নিয়েছেন যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিই যখন সকল রোগের নিরাময় তখন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে মালিকানার প্রশ্ন উত্থাপনের আর প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয় সব খাত- ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ-বিষয়টি প্রাকৃতিক নিয়মেই অনিবার্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সময়ের সাথে সাথে উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর (যেমন কৃষি জমি, জলা, জঙ্গল ইত্যাদি) প্রকৃত উৎপাদকের মালিকানা প্রসঙ্গটি প্রসঙ্গহীন হয়ে যাচ্ছে, বরঞ্চ উল্টো– মালিকানা প্রসঙ্গটি উত্তরোত্তর আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উল্লিখিত বিষয়টির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ জরুরি। মানব সভ্যতার বিকাশের ঐতিহাসিক মূল কথাটি এরকম: সমাজ বিকাশে উৎপাদিকা শক্তি (অর্থাৎ productive forces) সাথে উৎপাদন সম্পর্ক (production relations) আন্তসম্পর্কিত এবং আন্তনির্ভরশীল; ঐতিহাসিকভাবেই বিশ্বে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ বিকাশের মূল কথা হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাঁধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে বিদায় নিতে হবে— এটাই সিস্টেমের 'মৃত্যুঘণ্টা', এটাই সমাজ বিপ্লবের সূচনালগ্ন। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোনো অনড়-স্থির (static, stationary status) বিষয় নয় তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (ever changing, dynamic) বিষয়; প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে; প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তির (productive force) দ্বান্দ্বিক সমাহার; উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হলো উৎপাদনের উপায়ের (যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর মালিকানার ধরন (যা হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সর্বজনীন ইত্যাদি); আর উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হলো শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার; আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হলো (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি– মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়; বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর; আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[৪৩]

উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাথে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উল্লিখিত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৃষি-ভূমি সংস্কার নিয়ে যারা বলেন তাদের অনেকেই এমন মত পোষণ করেন যে কৃষির উন্নয়নে অথবা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে দুটো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিক আছে। প্রথম দিক হলো প্রযুক্তিগত (technological) আর দ্বিতীয় দিক হলো কাঠামোগত অথবা প্রাতিষ্ঠানিক (structural বা institutional)। প্রযুক্তি ও কাঠামো বিচ্ছিন্ন করে তারা (Jannuzi and Peach 1979, Minhas 1974, Dandekar and Rath 1971) বলতে চান যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার হলো কাঠামোগত (অথবা প্রাতিষ্ঠানিক) বিষয়, আর কাঠামোগত এ পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদিকা শক্তির (যার অন্যতম উপাদান হলো "প্রযুক্তি") বিকাশ সাধন করে না। তাদের এ ধারণাটি ভ্রান্ত অন্ততপক্ষে এ জন্যে যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এক প্রাকৃতিক বিধি এবং নিরন্তর, এবং উৎপাদন সম্পর্কের যে কাঠামো উৎপাদিকা শক্তির এই নিরন্তর বিকাশে বাঁধার কারণ হয়, তখন ঐ উৎপাদন সম্পর্কটাই পাল্টে যায়। আসলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ককে এমনভাবে পাল্টে দেয় যাতে কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির (অর্থাৎ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ শ্রম দক্ষতা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনের উপায়সমূহ) উত্তরোত্তর বিকাশ নিশ্চিত হয়। সুতরাং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রতিফল হতে পারে। সুতরাং উন্নয়নে (কৃষির অথবা সমগ্র অর্থনীতির) প্রযুক্তি ও কাঠামো বিচ্ছিন্ন করে দেখার যুক্তিগত তেমন কোনো ভিত্তি নেই।

[৪৩] সমাজ প্রগতির এসব বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন: বারকাত, আবুল (১৯৮৫), বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ. ১৫-২১।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সাথে কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিকাশের কোনো সংঘাততো নেইই বরঞ্চ উল্টোটা সত্য। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারকে অধিকতর কার্যকর, অধিকতর ফলপ্রদ, অধিকতর সমতাভিমুখী, অধিকতর সামাজিকীকরণের রূপ দিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন প্রয়োগ অপরিহার্য। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের দোহাই দিয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ– সম্ভবত বেশিরভাগ– কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের শ্রেণিগত দিকটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন অথবা বিষয়টি আমলযোগ্য নয় বলে বাতিল ঘোষণা করেন। খুব প্রাসঙ্গিক বিধায় এ নিয়ে কিছু বলা জরুরি।

কোনো 'অর্থনীতিবিদই'– শ্রেণি নিরপেক্ষ সত্তা নন। যে কারণে অর্থনীতিবিদদের "অর্থনীতিবিদ শ্রেণি" বললে অত্যুক্তি হবে না (তবে তারা রাগ করতে পারেন!)– এরা 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'-র একাংশ। এদের অধিকাংশই ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে বিচরণে অপারগ। "অর্থনীতিবিদ শ্রেণির এসব 'ভাবুক' যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে বিচরণে অপারগ তাদের উদ্দেশ্যে বলা সমীচীন যে তাদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতি শাস্ত্রেই অন্তর্নিহিত; দোষ তারা অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট উদ্ভূত– প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্রার মতে বিষয়টি এরকম, "উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব, জ্বালানি সংকট, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংকট, দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত, এবং অনুরূপ সবকিছু– এসবই একই সংকটের বিভিন্নমুখী চেহারা। সংকটটি মূলত উপলব্ধির সংকট"[৪৪]।

এখানে উল্লেখ্য যে পুরো গত শতক আর এ শতকের এখন পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানীরা (যারা মানুষের স্বভাব-আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে ভাবেন, যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাস শাস্ত্র) সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণে মূলত কার্টেজিয় ধারণাকাঠামো (cartesian framework) ব্যবহার করেছেন যে ধারণা কাঠামো অনুযায়ী দার্শনিক দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব (যেখানে বলা হতো বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর; মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন; দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা; "আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের ঊর্ধ্বে") থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' (*res congnitans*) নিয়ে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' (*res extensa*) নিয়ে। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ বলছেন– প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন কার্টেজিয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে "ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" (অর্থাৎ যে বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়) গ্রহণ করা।[৪৫] দেকার্ত ও কার্টেজিয় ধারণা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব কথাবার্তা দর্শন শাস্ত্রীয় বিধায় অর্থনীতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ নিউটনের পদার্থবিদ্যা-বলবিদ্যা আর কার্টেজিয় প্যারাডাইম– এ দুয়ের সমন্বয়ে সামজিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা এতকাল স্ব-শাস্ত্রীয় যেসব বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মডেল বিনির্মাণ করে চলেছেন সেসবই প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে যোগসূত্রহীন শাস্ত্র হিসেবে। বর্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল জ্ঞান-শাখার মতই 'খণ্ডিত' ও 'লঘুকৃত' অ্যাপ্রোচ (fragmented and reductionist approach) দ্বারা পরিচালিত। এসব কারণেই প্রচলিত অর্থনীতিবিদেরা অর্থাৎ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' "বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অর্থনীতি শাস্ত্র সামূহিক/সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল ও সোশাল সিস্টেমের ক্ষুদ্র একটি দিক মাত্র যেখানে জীবন্ত ঐ সিস্টেমে মানুষ একে অন্যের সাথে এবং প্রকৃতির সম্পদের সাথে প্রতিনিয়ত সম্পর্কিত, যে প্রকৃতির বেশির ভাগই প্রাণ-বিশিষ্ট সত্তা। সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে তারা এ সামূহিক-আন্তসম্পর্কিত গঠন-কাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে যোগসূত্রহীন ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগে চর্চা করে, এভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক শক্তির মৌল বিষয়াদি অবজ্ঞা করেন আর অর্থনীতিবিদেরা তাদের মডেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ... অন্য আরও একটা অতীব গুরুত্ববহ বিষয় যা অর্থনীতিবিদেরা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা করেন তা হলো– অর্থনীতির গতিময় (dynamic) বিবর্তন। ... জীবনের বিষয়াদি খণ্ডিতকরণের এবং

[৪৪] ফ্রিটজফ কাপ্রা, (১৯৮৮), The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture, পৃ. ১৫

[৪৫] ফ্রিটজফ কাপ্রা, ঐ, পৃ. ১৬

পৃথক কামরাভুক্ত করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার গাণিতিক সমাধানে অর্থনীতিবিদদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।... মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত করা হয় না– এ দিক থেকে অর্থনীতিবিদরা এতকাল পর্বতসম ব্যর্থ চর্চা করেছেন"।[৪৬] অর্থনীতিবিদ 'শ্রেণির' এসব মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে কথার ফুলঝুরির শেষ নেই। তবে এক্ষেত্রে একটি চাণক্য শ্লোক প্রণিধানযোগ্য হতে পারে– "বৃক্ষহীন দেশে ভেরেন্ডা গাছও বৃক্ষ বলে পরিগণিত হয়"।

[৪৬] ফ্রিটজফ কাপ্রা, ঐ, পৃ. ১৮৮-১৯১

অধ্যায় ৪

বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গ: সম্ভাবনা, প্রভাব-অভিঘাত ও পদ্ধতিতত্ত্বীয় বিষয়াদিসহ হালনাগদ হিসবেপত্তর

৪.১ বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারে কে কি পেতে পারেন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব-অভিঘাত: পদ্ধতিতত্ত্বীয় বিষয়াদিসহ হালনাগাদ কিছু হিসেবপত্তর

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অসম্ভব্যতা অথবা অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলা এখন আমাদের দেশে বেশ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রশ্নে শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি বাতিল ঘোষণা করে তথাকথিত "ইনস্টুমেন্টাল অর্থনীতিবাদি শ্রেণিনিরপেক্ষ" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাটা এখন অনেকেই আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে মনে করেন। আমাদের অনেকেই খাস জমি-জলা (চিহ্নিত, অচিহ্নিত), সিলিং-উদ্বৃত্ত জমি-জলা, অকৃষি জমিতে মালিকানার সিলিং নির্ধারণ করা, অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের ভাগ-বর্গা চুক্তিতে দেয়া জমি-জলা বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গভাবে না বুঝে অথবা আংশিক বুঝে বিতরণমূলক বা বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের (distributive land reform) অসম্ভব্যতার অথবা ফলপ্রদহীনতার কথা বলেন। এককথায় নাকচ করে দেন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা। বিষয়ের গুরুত্বের কারণে গ্রন্থের শেষের দিকে এসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরুরি কিছু কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

এতক্ষণ যা বললাম সেসব প্রশ্নের উত্তর পদ্ধতিগতভাবে দুভাগে বিভক্ত করে উত্থাপন সমীচীন মনে করি। প্রথমত, বণ্টনযোগ্য জমি (কৃষি ও অকৃষি) ও জলা কাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে অথবা করা সমীচীন? দ্বিতীয়ত, বণ্টনযোগ্য কৃষি জমি, অকৃষি জমি এবং জলার পরিমাণ কত? বিষয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে বণ্টনযোগ্য জমি-জলা কাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে অথবা করা সমীচীন এবং কেন– বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বেশ সহজ-সরল-সাধারণ বলে মনে হলেও বাস্তবত এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ আছে এবং বিতর্ক হচ্ছেও। আর বণ্টনযোগ্য জমি-জলার সম্ভাব্য পরিমাণ নিয়ে সম্ভবতঃ এখনও পর্যন্ত কেউই বাস্তবসম্মত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং যুক্তির নিরিখে গ্রহণযোগ্য হিসেবপত্তর উত্থাপন করতে সক্ষম হননি। অবশ্য অনেকেই বিষয়টি অতি সরলীকৃত করে বিভিন্ন বিপরীতমুখী উপসংহারে উপনীত হয়েছেন।

পুনঃবণ্টনযোগ্য (বা একই কথা 'বণ্টনযোগ্য') কৃষি জমি ও জলা গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন করাটাই যেকোনো বিচারে যুক্তিসঙ্গত। আর পুনঃবণ্টনযোগ্য শহরের অকৃষি জমি শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধানত আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বণ্টন করতে হবে– এ নিয়ে বিতর্ক থাকার ভযুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই। আমার মতে বণ্টনযোগ্য এসব জমি-জলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে চিহ্নিত কৃষি খাস জমি, অচিহ্নিত কৃষি খাস জমি (যা সময়মত চিহ্নিত করতে হবে), চিহ্নিত খাস জলা, অচিহ্নিত খাস জলা (যা সময়মত চিহ্নিত করতে হবে), চিহ্নিত অকৃষি খাস জমি, অচিহ্নিত অকৃষি খাস জমি (যা সময়মত চিহ্নিত করতে হবে), সিলিংউদ্বৃত্ত কৃষি জমি, সিলিংউদ্বৃত্ত অকৃষি জমি-জলা, অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের সে জমি যা তারা ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন চুক্তিতে চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেন।

আরো অগ্রসর আগে অকৃষি জমি নিয়ে দুটো বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, আমাদের দেশে কৃষি জমির মালিকানার সিলিং আছে কিন্তু অকৃষি জমির সর্বোচ্চ মালিকানার কোনো সিলিং নেই– এ সিলিং নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, খাস-অখাস নির্বিশেষে অকৃষি জমির (প্রধানত শহরের জমি) বাজার মূল্য গ্রামীণ জমির তুলনায় গড়ে ১০০ গুণ বেশি; আর ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনার মেট্রোপলিটন এলাকার সাথে তুলনা করলে তা হবে হাজার গুণ বেশি। শহুরে খাস জমি এখন পুরোটাই আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত 'রেন্ট-সিকার'

গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এ দখলি স্বত্ব বজায় রাখতে এবং দখল বাড়াতে দুর্বৃত্তরা রীতিমত সশস্ত্র মাস্তান পুষছে, যে মাস্তানি এখন আর শুধু জমিকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে সীমিত নয়। ঢাকা শহরের প্রায় ৪০০০-এর উপরে বস্তির নাম এখন ব্যক্তির নামে; ঢাকার ভিতরে আর চারপাশে কয়েক লক্ষ একর নীচু-খাস জলা-জমি এখন বেআইনি ভরাট চলছে। এসব খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে এ বিষয় এড়িয়ে গেলে অন্যায় হবে; হবে তা অনৈতিক।

উচ্চমূল্য ও ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে শহুরে খাস জমি-জলা নিয়ে হেন তেলেসমাতি নেই যা করা হয় না। আর এর সাথে জড়িতরা সবাই প্রচণ্ড প্রভাবশালী; এমনকি সরকারের উচ্চমহলের ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ তেলেসমাতির অংশীদার– বিষয়টি নতুন নয়। এসব নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক "ধরা পড়েছে টাস্ক ফোর্সের হাতেঃ খাস জমি এড়িয়ে ব্যক্তি মালিকানার ভূমিতে লালবাগে বাজার নির্মাণে কারচুপি" শিরোনামে আজ থেকে ৮ বছর আগেও লিখেছে *"দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারি খাস জমি এড়িয়ে ব্যক্তি মালিকানা জমিতে লালবাগ পাইকারি কাঁচাবাজার নির্মাণের কারচুপি টাস্কফোর্সের হাতে ধরা পড়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ভূমি মন্ত্রণালয় ও ডিসি অফিসের কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে টাস্কফোর্স। জানা গেছে, নগরীতে চারটি নতুন পাইকারি কাঁচা বাজার নির্মাণের সরকারি সিদ্ধান্তের একটি হচ্ছে লালবাগ পাইকারি কাঁচাবাজার। এ কাঁচাবাজার নির্মাণে জমি চেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। ডিসিসির আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসি অফিসকে এ দায়িত্ব দেয় ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি মন্ত্রণালয়কে এ বছরের ২৮ মে দেয়া জবাবে ডিসি অফিস জানিয়ে দেয়, প্রস্তাবিত ৩০০১ দাগের ৭ দশমিক ৭০ একর জায়গাটি খাস জমিতে পড়ে না। ...পরবর্তীতে টাস্কফোর্স তদন্ত শুরু করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসতে থাকে। টাস্কফোর্স সূত্র জানায়, প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রস্তাবিত ৭ দশমিক ৭০ একর জায়গাটি খাস জমি। এ জমিটি খাস খতিয়ানে 'খাস জমি' হিসাবে উল্লেখ রয়েছে। ভূমি মন্ত্রাণালয় বরাবর 'ওই জায়গাটি খাস জমি নয়' বলে ডিসি অফিসের পাঠানো চিঠিটি সঠিক নয়" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৭)*। এ অবস্থার পরিবর্তন তো হয়ই নি বরঞ্চ বাস্তব অবস্থা আরো সংগঠিতভাবে দুর্বৃত্তায়িত-দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে।

এখন এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া জরুরি যে (১) আমাদের দেশে বণ্টন-সম্ভাব্য জমি-জলা আছে কিনা যা দিয়ে জমি-জলা ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক ও জলাজীবীদের মধ্যে পুনঃবণ্টনের মাধ্যমে উৎপাদন-উদ্দিষ্ট কার্যকর সাইজের ভূমি-জলা পাওয়া যাবে? আর যদি তা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে করণীয় কি হবে? (২) বণ্টনযোগ্য কৃষি জমি-অকৃষি জমি-জলা কাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে অথবা কাদের মধ্যে বণ্টন করা উচিত? **যেহেতু** এসব বিষয় নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক হয় আবার কখনও অতি-তর্ক এবং কখনও কখনও তর্ক করার প্রাক-উদ্দেশ্যই হলো সম্পূর্ণ বিষয়টি বাতিলযোগ্য বলে গণ্য করা অথবা ঐ লক্ষ্যেই পরিচালিত **সেহেতু** উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের সম্ভাব্য এবং নির্ভরযোগ্য উত্তরসহ পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি-জলা সংস্কারের যৌক্তিক সম্ভাব্যতা এবং সম্ভাব্য প্রভাব-অভিঘাত নিয়ে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করা জরুরি।

বৃহত্তর অর্থের কৃষি সংস্কার (agrarian reform অর্থে) এবং তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভূমি সংস্কার ও জলা সংস্কারের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি। কৃষি সংস্কারের মৌলিক যুক্তিভিত্তি হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে আছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের যুক্তি, আছে সামাজিক যুক্তি, আছে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক যুক্তি, আছে কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের প্রাকৃতিক সূত্রের সাথে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গতি বিধানের যুক্তি, আছে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের মুক্তির যুক্তি, আছে প্রত্যক্ষ কৃষকসহ জমি-জলা-জঙ্গলে শ্রমদানকারী সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ন্যায়বিধানিক যুক্তি, আছে মূল্যবোধীয় যুক্তি, আছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের যুক্তি, এবং সবশেষে আছে দেশের সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের যুক্তি।

কৃষি সংস্কার যেহেতু বড় মাপের এক 'কনসেপ্ট' এবং যেহেতু ভূমিসংস্কার বিশেষ করে জমি-জলা পুনঃবণ্টনমূলক সংস্কার (redistributive land reform) কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা নিয়ে আমাদের দেশে (সম্ভবত পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই এমনকি সেসব দেশে যেখানে জমি-জলার তুলনায় মানুষ অপেক্ষাকৃত কম) অনেক কার্যকর-প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং কার্যকর-সম্ভাব্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয় সেহেতু একটা যুক্তির কথা স্পষ্ট বলা দরকার– তাহলো বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব যাই হোক না কেন, মাথাপিছু জমির পরিমাণ যাই হোক না কেন আমার হিসেবে আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে জমি (কৃষিজ ও অকৃষিজ) ও জলা আছে যা ভূমিহীন-

প্রান্তিক কৃষক ও জলাহীন দরিদ্র-প্রান্তিক জলাজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব (এ নিয়ে পরে বিশ্লেষণ করব এবং সংশ্লিষ্ট এসব হিসেবপত্তর সারণি ১০ এ উত্থাপন করেছি)। আমার মতে এসব নিয়ে কোনো কূটতর্কে অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন নেই। যে প্রশ্নটি যৌক্তিক প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপিত হতে পারে তা হলো ঐসব জমি-জলা-জঙ্গল কাদের মধ্যে অর্থাৎ কোন শ্রেণি বা বর্গের ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন হবে এবং কোন শর্তে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার কৃষি এবং/অথবা যৌথ মালিকানার সমবায়ী কৃষি এবং/অথবা রাষ্ট্রিয় মালিকানায় রাষ্ট্রিয় খামার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে– তা বণ্টন হবে? এসব সিদ্ধান্ত এ মুহূর্তে আমার নেবার কথা নয়। এসব সিদ্ধান্ত নেবেন সময়মত তারা যারা বণ্টন-পুনঃবণ্টনমূলক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কথা ভাববেন এবং ঐ ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে উদ্যোগী হবেন। এবং ইতিহাস পাঠে আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে কৃষি-জমি-জলা সংস্কার এমন এক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যা আদৌ কোনো গায়ে-মাথায় হাত বুলানোর বিষয় নয়– বিপরীতে ঐ কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রযন্ত্র ও দরিদ্র-জনশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করা হয়।

আসা যাক পেছন দিক থেকে। অর্থাৎ কাদের মধ্যে ভূমি-জলা বণ্টন করতে হবে– এ প্রসঙ্গে। এখানে সরাসরি উত্তর হলো 'ভূমিহীন'দের মধ্যে অর্থাৎ গ্রামের ক্ষেত্রে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং জলাজীবীদের মধ্যে, আর শহরের ক্ষেত্রে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত-স্বল্পআয়ী মানুষের প্রধানত আবাসন সমস্যা চিরস্থায়ীভাবে সমাধানের লক্ষ্যে। আপাতত গ্রামের কথাই বলি। 'ভূমিহীন' কারা? ভূমিহীনদের খানার সংখ্যা কত? কৃষি-শুমারিতে দেখা যায় সরকার গ্রামীণ ভূমিহীনদের ৪টি শ্রেণি বা বর্গে বিভাজন করেন: ভূমিহীন শ্রেণি-১, ভূমিহীন শ্রেণি-২, ভূমিহীন শ্রেণি-৩, এবং ভূমিহীন শ্রেণি-৪ (দেখুন, Government of Bangladesh 1999, Agriculture Census 1996)। ভূমিহীন শ্রেণি-১ এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেসব খানা (household) যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো চাষের জমি তো নেইই এমনকি বসতভিটাও নেই; ভূমিহীন শ্রেণি-২ হলো সেসব খানা যাদের নিজস্ব মালিকানায় বসতভিটা আছে কিন্তু কোনো চাষের জমি নেই; ভূমিহীন শ্রেণি-৩ হলো সেসব খানা যাদের নিজ মালিকানায় বসতভিটা আছে এবং সেইসাথে আছে ৫০ ডেসিমেল (অর্থাৎ ১.৫ বিঘা) পর্যন্ত চাষের জমি; আর ভূমিহীন-৪ কে 'ভূমিহীন' বলা হচ্ছে না বলা হচ্ছে 'প্রায় ভূমিহীন' (near landless)-এসব হলো সেসব খানা যাদের নিজ মালিকানায় বসতভিটা তো আছেই সেই সাথে আছে ৫০ ডেসিমেল থেকে ১০০ ডেসিমেল (১.৫ থেকে ৩ বিঘা) পর্যন্ত চাষের জমি। বিভিন্ন শ্রেণির বা বর্গের 'ভূমিহীন' খানার সংখ্যা কত যাদের মধ্যে জমি-জলা বণ্টন করতে হবে– এ প্রসঙ্গে পরে আসছি আর তার আগে বলে রাখি যে 'ভূমিহীন শ্রেণি-৪'-কে আমি জমি-জলার পুনঃবণ্টনমূলক সংস্কারের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী মনে করি না। তবে বৃহত্তর কৃষি সংস্কারের আওতায় তারা যৌথকৃষি অথবা সমবায়ী কৃষিসহ বিভিন্ন ধরনের সমবায়ী কর্মকাণ্ড করতে পারেন; এ বিষয়েও কৃষি-ভূমিসংস্কার যারা করবেন তারাই যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বাংলাদেশে গ্রামের ভূমিহীন আর শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-স্বল্পবিত্ত মানুষদের মধ্যে বণ্টন-পুনঃবণ্টনের জন্য কি পরিমাণে জমি-জলা-আছে? এ নিয়ে সরকারের কাছেও হিসেবপত্তর নেই অথবা থাকলেও তা প্রকাশিত নয়, আর সংশ্লিষ্ট গবেষক ও একটিভিস্টরা এসব হিসেবপত্তর নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মোটামুটি মনগড়া তথ্য দেন। অনেক ধরনের যৌক্তিক কারণেই আমাদের দেশের বণ্টন-পুনঃবণ্টযোগ্য জমি-জলার পরিমাণ-সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তরটি উত্থাপন দরকার। সে চেষ্টাই এ অনুচ্ছেদে করেছি। পূর্ণাঙ্গ হিসেব উত্থাপনের আগে বণ্টন-পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলা কোথায় আছে– বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার। প্রথমত, চিহ্নিত (identified) খাস জমি-জলা পুরোটাই আছে তবে খাস জমি-জলার বেশ বড় অংশ সমাজের পরজীবী 'রেন্ট-সিকার' গোষ্ঠী বেদখল করে আছেন; এসব জমি-জলার আর একাংশ মামলাধীন। দ্বিতীয়ত, আছে অচিহ্নিত (un-identified) খাস জমি-জলা যার মোট আনুমানিক পরিমাণ হবে দেশে মোট চিহ্নিত খাস জমি-জলার ৬২ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ১০-এর নিচে প্রদত্ত পদ্ধতিগত নোট দেখুন)। তৃতীয়ত, সিলিংউদ্বৃত্ত কৃষি জমি। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে কৃষি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সিলিং আইন দ্বারা নির্ধারিত (তা পালিত হোক অথবা না হোক)। কিন্তু অকৃষি জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং আইন দ্বারা নির্ধারিত নয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে আমাদের দেশে এখন অকৃষি জমির বাজার মূল্য সমপরিমাণ কৃষি জমির বাজার মূল্যের তুলনায় গড়ে কমপক্ষে ১০০ গুণ বেশি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই কৃষি জমির তুলনায় অকৃষি জমি অনেকগুণ বেশি দুষ্প্রাপ্য আর সে কারণেই অকৃষি জমির জন্য প্রতিযোগিতা, অস্বচ্ছতা, মামলা-মোকদ্দমা, জালিয়াতি-বাটপাড়ি তুলনামূলক অনেক বেশি।

আবার এসবের পাশাপাশি যেহেতু অকৃষি জমির মালিকানা সিলিং নেই সেহেতু কৃষি জমিকে বিভিন্ন কায়দায় অকৃষি জমি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করার প্রয়াসও এখন ৩০-৪০ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি। অকৃষি জমির মালিকানা-সিলিং বিষয়টি অন্তত এ কারণেও সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে যে ৪০ বছর আগের তুলনা্য় (যখন দেশের ৫-৬% মানুষ নগরে বাস করতেন) তথাকথিত নগরায়ন ('urbanization') যা আসলে 'বস্তিয়ায়ন' (slumarization)-এর কারণে দেশের ২৫-২৬ শতাংশ মানুষ শহরে-নগরে বাস করেন (যা ক্রমবর্ধমান) যা আসলে কৃষি থেকে– গ্রামাঞ্চল থেকে গলাধাক্কার কারণে গ্রাম থেকে– উচ্ছেদকৃত শহরে অভিবাসিত মানুষের কমপক্ষে ৭০ শতাংশ এখন শহুরে ভাসমান এবং/অথবা বস্তিবাসী অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত দরিদ্র মানুষ যাদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

উপরে যা বললাম তার ভিত্তিতে আমি এও জানি ও বুঝি যে যখন জমি-জলার পুনর্বণ্টনমূলক কৃষি সংস্কারের প্রশ্ন বাস্তবিকই আরো বেশি করে সামনে আসবে তখন অকৃষি জমি নিয়ে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি কথাবার্তা হবে এবং এসব পুনর্বণ্টনের বিপক্ষেও অনেক যুক্তি দাঁড় করানো হবে (যেসব দেশে পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার হয়েছে তার মধ্যে অনেক দেশেই এ বিষয় লক্ষ্য করা যায়)। চতুর্থত, বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারে আরো যে বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে তা হলো– জমি-জলায় অনুপস্থিত মালিকদের (absentee owners of land-waterbodies) বিষয়, বিশেষত যেসব অনুপস্থিত মালিক যারা তাদের জমি-জলা ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ বিভিন্ন ধরনের অলিখিত-চুক্তিতে অন্যদের দেন (যাদের বেশিরভাগই দরিদ্র, বিত্তহীন, স্বল্পবিত্ত মানুষ)। অনুপস্থিত-ভূস্বামীরা যারা তাদের মালিকদের জমি-জলা চুক্তিতে অন্যদের দেন তারা কোনোভাবেই তাদের জমি-জলায় বিনিয়োগে আগ্রহী নন; তাদের মালিকানাধীন জমি-জলা উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্যের কৃষির বিপক্ষে একমুখী বিকর্ষণমূলক চলাচল হয়। তাদের জমি-জলা যেসব প্রকৃত কৃষক ভাগচাষ বা বর্গাচাষ বা বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে চাষ করেন অথবা উৎপাদন-নিমিত্তে ব্যবহার করেন তারাও বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে অনুপস্থিত মালিকের ঐসব জমি-জলায় বিনিয়োগ এবং/অথবা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আগ্রহী নন অথবা তাদের আগ্রহী হবার কারণ নেই এবং/অথবা তাদের বিনিয়োগ-আগ্রহী হবার সক্ষমতা নেই। দেখা গেছে যে যে-সব ভূমিহীন অথবা প্রান্তিক উৎপাদক কৃষিজীবী অথবা জলাজীবী কৃষি অথবা জলায় শ্রম দেন তাদের নিজস্ব স্বল্প-মালিকানাধীন জমি-জলায় শ্রমের ফলপ্রদতা (efficiency of labor) এবং উৎপাদনশীলতা (productivity) চুক্তিবদ্ধ জমি-জলার (যা অনুপস্থিত ভূ-স্বামীর মালিকানাধীন) তুলনায় বেশ বেশি। এ অবস্থা তো সাধারণভাবে সেটাই নির্দেশ করে যে ভূমিহীন-জলাহীন দরিদ্র উৎপাদক কৃষিজীবী-জলাজীবীদের চুক্তিবদ্ধ জমি-জলার তুলনায় তাদের নিজ মালিকানাধীন জমি-জলায় (তার পরিমাণ যত স্বল্পই হোক না কেন) তাদের নিজস্ব শ্রম ও পরিবারের সদস্যদের শ্রমসহ অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ অপেক্ষাকৃত বেশি দেন অথবা দিতে প্রস্তুত যা নিজ মালিকানাধীন জমি-জলায় বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে তাদের সক্ষমতা যাই থাক না কেনো আগ্রহ নির্দেশ করে। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারে অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের চুক্তিতে দেয়া জমি-জলা নিয়ে ভাবতে হবে।

এখন আসা যাক স্পর্শকাতর এ প্রসঙ্গে যে আমাদের দেশে জমি-জলার পরিমাণ কত এবং তা কাদের মধ্যে পুনঃবণ্টিত হবে অথবা হওয়া উচিত? বিভিন্নমুখী বিতর্কের কারণে এ প্রসঙ্গ অবতারণা করার আগে বলে রাখি যে আমি যখন কৃষি সংস্কার (agrarian reform)-এর কথা বলছি তখন কিন্তু আমি প্রধানত কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা অথবা একই কথা কৃষিতে প্রচলিত শ্রেণিসম্পর্ক পরিবর্তনের কথা বলছি, যে পরিবর্তন কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিমিত্ত বিনিয়োগ চাহিদার সরবরাহ এবং কৃষিতে প্রযুক্তির বিকাশ নিশ্চিত করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে পুনঃবণ্টনযোগ্য ভূমি-জলা সংস্কার উল্লিখিত কৃষি সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অংগ মাত্র (land reform is an integral part of agrarian reform)।

আমার মতে বাংলাদেশে পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলার হিসেবপত্তর উত্থাপনের আগে পদ্ধতিগতভাবে সঠিক হবে এ নিয়ে বলা যে ঐসব জমি-জলা কে পাবেন অথবা কাদের পাওয়া উচিত? নিঃসন্দেহে তা পাওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলের কৃষিকাজে নিয়োজিত ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের এবং জল-জলায় মালিকাধীন জল-জীবীদের, এবং শহরের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নিদেনপক্ষে আবাসন সমস্যার দূরীকরণার্থে শহুরে দরিদ্র মানুষদের– ভাসমান, বস্তিবাসী এবং নিম্ন আয়ের মানুষের। এখন প্রশ্ন এরা কারা? আমাদের দেশে গ্রামীণ ভূমিহীন বলতে সরকারিভাবে

চার শ্রেণির বা চার বর্গের (বা categories) মানুষ বোঝানো হয়ে থাকে। সরকারিভাবে ভূমিহীন এসব মানুষদের যে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় তাদের বিবরণ একটু আগে উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য যে ১৯৯৬ সালের বাংলাদেশ কৃষিশুমারি অনুযায়ী (দেখুন, Government of Bangladesh 1999) আমাদের দেশে মোট গ্রামীণ খানার সংখ্যা ১ কোটি ৭৮ লক্ষ (১,৭৮,২৮,১৮২) যার মধ্যে ভূমিহীন শ্রেণি ১-এর খানা সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২৯ (মোট খানার ০.৯১ শতাংশ), ভূমিহীন শ্রেণি-২ এর খানা সংখ্যা ৫০ লক্ষ (৫০,০৩,০৪২; মোট খানার ২৮.০৬ শতাংশ), ভূমিহীন শ্রেণি-৩-এর খানা সংখ্যা প্রায় ৫২ লক্ষ (৫১,৯১,৯৭৯; মোট খানার ২৯.১২ শতাংশ), আর ভূমিহীন শ্রেণি-৪-এর খানা সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ (২৪,৯৪,৬০৬; মোট খানার ১৩.৯৯ শতাংশ), আর বাদবাকী হলো অভূমিহীন শ্রেণিভুক্ত খানা যাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ (৪৯,৭৬,৩২৬; মোট খানার ২৭.৯১ শতাংশ)। গ্রামীণ খানার ভূমিহীনতার এ চিত্র উত্থাপনের পরে এ কথা বলা সমীচীন যে জমি-জলায় মালিকানার নিরিখে মালিকানা-মই এর সবচে নিচে যাদের অবস্থান এবং যারা সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলায় তাদের হিস্যা প্রাধান্য পাওয়া যুক্তিসঙ্গত। আর এ বিবেচনায় আমার মতে পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলায় ন্যায্য হিস্যা হতে পারে কমপক্ষে ভূমিহীন শ্রেণি-১ ও ২-এর খানা যেসব খানার মোট সংখ্যা (১৯৯৬ সনের কৃষি শুমারি অনুযায়ী) হবে প্রায় ৫২ লক্ষ (৫১,৬৫,২৭১ খানা; মোট গ্রামীণ খানার ২৮.৯৭ শতাংশ) আর বেশির দিকে ভূমিহীন শ্রেণি ১,২ ও ৩ এর সমাহার যাদের মোট খানা সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪ লক্ষ (১,০৩,৫৭,২৫০ খানা; মোট গ্রামীণ খানার ৫৮.০৯ শতাংশ)। অর্থাৎ বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারে বণ্টন-পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলায় মালিক হতে পারেন গ্রামের ৫২ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪ লক্ষ ভূমিহীন খানা (যারা মোট গ্রামীণ খানার ২৯ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশ)। এখানে বলা প্রয়োজন যে গ্রামীণ ভূমিহীন খানার যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো তা ১৯৯৬ সনের কৃষিশুমারির ভিত্তিতে হিসেবকৃত। এর পরে ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর সময় পার হয়েছে এবং এ সময়ে (১৯৯৬-২০১৫) নিঃসন্দেহে গ্রামীণ ভূমিহীন খানার (শ্রেণি-১, শ্রেণি-২, শ্রেণি-৩) সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে। যদি ধরেও নেই যে গত ২০ বছরে (১৯৯৬-২০১৫) যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে গ্রামীণ ভূমিহীন খানার সংখ্যা ঠিক একই হারে বেড়েছে তাতে সম্ভবত কোনো অত্যুক্তি হবে না। আমার হিসেবে আমাদের দেশে ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৮.৭৬ শতাংশ: ১৯৯৬ সালে ১১ কোটি ৫৩ লক্ষ থেকে ২০১৫ সালে ১৬ কোটি; আর ১৯৮৪ থেকে ২০১২ বিগত এই ৩০ বছরে গ্রামীণ দরিদ্রদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে ৬২.৮৩ শতাংশ: ১৯৮৪ সনে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ২০১২ সনে ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ মানুষ (সারণি ৩ দেখুন)। ১৯ বছরে (১৯৯৬-২০১৫) মোট জনসংখ্যার ৩৮.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি আর ২৯ বছরে (১৯৮৪-২০১২) গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যার ৬২.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি– এ দুই হিসেব যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উল্লিখিত হার অথবা ২৯ বছরে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে গ্রামীণ ভূমিহীন খানার হিসেব প্রক্ষেপণ করলে ১৯৯৬ সনের ভূমিহীন শ্রেণি-১ ও শ্রেণি-২ এর ৫২ লক্ষ খানার সংখ্যা ২০১৫ সালে হবে প্রায় ৭২ লক্ষ (৭১,৬৭,৩৩০ খানা), আর ভূমিহীন শ্রেণি ১,২ ও ৩-এর সমন্বিত ১৯৯৬ সনের ১ কোটি ৪ লক্ষ খানার সংখ্যা ২০১৫ সালে হবে প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ (১,৪৩,৭১,৭২০ খানা)।[৪৭] এখানে বলা জরুরি যে, উল্লিখিত প্রক্ষেপণে আমি ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যার ৩৮.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি ব্যবহার করেছি। পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলা কোন শ্রেণির খানা পাবেন (অথবা পাবেন না) এবং কি শর্তে পাবেন সেসব খুঁটিনাটি বিষয়াদি সংস্কার কর্মকাণ্ড যারা পরিচালন করবেন তারা সংস্কারকালীন সময়ে ভূমিহীনদের সাথে যৌথভাবে ঠিক করবেন। এখানে আমার উদ্দেশ্য এ কথা বলে রাখা যে বণ্টন-পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি-জলা পাবেন বিভিন্ন বর্গের/শ্রেণির ভূমিহীন মানুষ যারা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে

[৪৭] অন্যান্য হিসেবপত্তের সুবিধার জন্য এখানে জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা সমীচীন হবে: ২০১৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ১৬ কোটি; (সর্বশেষ আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী খানার গড় সাইজ ৪.৪ ধরলে ২০১৫ সালে দেশে মোট খানার সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ (২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী ২০১১ সালে দেশে মোট খানার সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১৭ লক্ষ; দেখুন, Government of Bangladesh 2012); এ হিসেবে উল্লিখিত ৭২ লক্ষ ভূমিহীন খানা হবে দেশের মোট খানার ১৯.৮৩ শতাংশ আর ১ কোটি ৪৪ লক্ষ খানা হবে দেশের মোট খানার ৪০ শতাংশ খানা। আমার হিসেবে ২০১৫ সনে দেশে গ্রামীণ খানার সংখ্যা হবে ২ কোটি ৯০ লক্ষ। সে হিসেবে উল্লিখিত ৭২ লক্ষ ভূমিহীন খানা হবে মোট গ্রামীণ খানার প্রায় ২৫ শতাংশ আর গ্রামীণ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ভূমিহীন খানা হবে মোট গ্রামীণ খানার প্রায় ৫০ শতাংশ।

প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এইসাথে একথাও বলে রাখি যে এসব হলো গ্রামের জমি-জলা নিয়ে কথা; আর শহরের বণ্টন-পুনঃবণ্টনযোগ্য জমি (অকৃষি জমি) পাবেন প্রধানত আবাসন সমস্যা দূরকরণার্থে শহরের দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষ যাদের মধ্যে আছেন ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী এবং স্বল্পআয়ী মানুষ।

এতক্ষণ যেসব বিষয়ের অবতারণা করলাম তা বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের আওতায় যে সব জমি-জলা বণ্টন হতে হবে এবং যাদের মধ্যে বণ্টন হতে হবে– এসব হিসেবপত্তর করার পদ্ধতিতত্ত্বীয় বিষয়াদি (methodological issues)। এখন যুক্তিযুক্ত হবে বাংলাদেশে বণ্টন-পুনঃবণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের সম্ভাব্য ফলাফল সংশ্লিষ্ট আমার আনুমানিক হিসেবপত্তর উত্থাপন করা। এখানে বলা দরকার যে, বিষয়ের গুরুত্বের কারণে এইসব হিসেবপত্তর যতদূর সম্ভব হালনাগাদ করে গত বছরের জন্য (২০১৫ সন) প্রযোজ্য করার চেষ্টা করেছি। সংশ্লিষ্ট এসব হিসেবপত্তর সারণি ১০-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দেশে এখন (এই ২০১৬ সালে) যদি বণ্টন-পুনঃবণ্টনমূলক ভূমিসংস্কার কাজ সমাধা করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা সংস্কারের জন্য সম্ভাব্য কি পরিমাণ জমি-জলা পাবো এবং তা কোথা থেকে পাবো; ঐসব জমি-জলা বিভিন্ন শ্রেণি বা বর্গের ভূমিহীন (category of landless) মানুষের মধ্যে সমবণ্টিত হলে কে (অর্থাৎ কোন ভূমিহীন শ্রেণির খানা) কি পরিমাণে (খানা প্রতি গড়) জমি-জলা পাবেন; এবং শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির ভূমিহীন খানা প্রতি জোতের গড় আয়তন কত হবে [অর্থাৎ যা বণ্টনে প্রাপ্ত জমি-জলার সাথে নিজস্ব মালিকানার জমি-জলার (যদি থাকে) যোগফল]– এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট আমার হালনাগাদ হিসেবপত্তর (২০১৫ সালের জন্য প্রযোজ্য) কিছু প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণসহ নিচে উপস্থাপন করছি:

১. ভূমিসংস্কারের জন্য মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ বিঘা বণ্টনযোগ্য জমি-জলা পাওয়া যাবে। এইসব বণ্টনযোগ্য জমি-জলা যেখান থেকে পাওয়া যাবে তার মধ্যে আছে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৫ হাজার বিঘা খাস জমি-জলা (মোট বণ্টনযোগ্য জমি-জলার প্রায় ৭৫ শতাংশ), ৩২ লক্ষ ৭৬ হাজার বিঘা সিলিং উদ্বৃত্ত জমি (মোট বণ্টনযোগ্য জমি-জলার ১৫ শতাংশ), ২১ লক্ষ ৮১ হাজার বিঘা অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের চুক্তিতে দেয়া চাষের জমি (মোট বণ্টনযোগ্য জমি-জলার ১০ শতাংশ)।

সারণি ১০: বাংলাদেশে পুনঃবণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের সম্ভাব্য ফলাফলের হিসেবপত্তর, ২০১৫

	নির্দেশকসমূহ	হিসেব/পরিসংখ্যান
১।	খানার সংখ্যা (২০১৫ সাল)	
	১.ক মোট	৩,৬৩,০০,০০০
	১.খ গ্রামীণ	২,৯০,০০,০০০
২।	চিহ্নিত খাস জমি ও জলা (২০০১ সাল)	
	২.ক চিহ্নিত কৃষি খাস জমি (বিঘা)	২৪,০৯,৯২৭
	২.খ চিহ্নিত অকৃষি খাস জমি (বিঘা)	৫০,৫৯,০৬২
	২.গ চিহ্নিত জলা (বিঘা	২৪,৯১,০৬৮
	২.ঘ মোট চিহ্নিত খাস জমি ও জলা (বিঘা)	৯৯,৬০,০৫৭
৩।	অচিহ্নিত খাস জমি ও জলা (২০১৫ সাল; বিঘা)	৬১,৭৫,২৩৫
৪।	মোট খাস জমি ও জলা (২০১৫ সাল; ২+৩: বিঘা)	১,৬১,৩৫,২৯২
৫।	সিলিং উদ্বৃত্ত কৃষি জমি (১৯৯৬ সাল; বিঘায়) (এখানে জমির মালিকানা সিলিং ধরা হয়েছে ৭.৫ একর)	৩২,৭৬,০০০
৬।	অনুপস্থিত ভূ-স্বামীর চুক্তিতে দেয়া চাষের জমি (চুক্তির আওতায় আছে ভাগ, বর্গা, একসনা, ফসলওয়ারি, অর্থচুক্তি, ফসলচুক্তি ইত্যাদি)	২১,৮১,০০০
৭।	মোট খাস (চিহ্নিত+অচিহ্নিত) জমি-জলা+মোট সিলিং উদ্বৃত্ত জমি+অনুপস্থিত ভূ-স্বামীর চুক্তিতে দেয়া জমি (বিঘা)	২,১৫,৯২,২৯২
৮।	গ্রামাঞ্চলে খানার সংখ্যা (২০১৫ সাল)	
	৮.১ ভূমিহীন শ্রেণি-১ (যেসব খানার নিজ মালিকানাধীন বসতভিটা নেই)	২,২৫,১০৯
	৮.২ ভূমিহীন শ্রেণি-২ (যেসব খানার নিজ মালিকানাধীন বসতভিটা আছে কিন্তু চাষের জমি নেই)	৬৯,৪২,২২১
	৮.৩ ভূমিহীন শ্রেণি-৩ (যেসব খানার নিজ মালিকানাধীন বসতভিটা আছে এবং ৫০ ডেসিমেল অথবা ১.৫ বিঘা পর্যন্ত আবাদি জমি আছে)	৭২,০৪,৩৯০
	৮.৪ ভূমিহীন শ্রেণি (১+২)	৭১,৬৭,৩৩০
	৮.৫ ভূমিহীন শ্রেণি (১+২+৩)	১,৪৩,৭১,৭২০

বিভিন্ন শ্রেণি/বর্গের গ্রামীণ ভূমিহীন খানার মধ্যে পুনঃবণ্টনযোগ্য বিভিন্ন ধরনের জমি-জলা সমবণ্টন হলে গড়ে কোন শ্রেণি/বর্গের খানা কত বিঘা পাবেন? (২০১৫ সালের জন্য হিসেবকৃত)

		ভূমিহীন শ্রেণি-১	ভূমিহীন শ্রেণি-২	ভূমিহীন শ্রেণি-৩
৯।	চিহ্নিত কৃষি খাস জমি	১০.৭	০.৩৪	০.১৭
১০।	চিহ্নিত অকৃষি খাস জমি	২২.৫	০.৭১	০.৩৫
১১।	চিহ্নিত খাস জলা	১১.১	০.৩৫	০.১৭
১২।	চিহ্নিত খাস জমি ও জলা (৯+১০+১১)	৪৪.৩	১.৪০	০.৬৯
১৩।	অচিহ্নিত খাস জমি ও জলা	২৭.৪	০.৮৬	০.৪৩
১৪।	মোট খাস জমি ও জলা (চিহ্নিত+অচিহ্নিত; (১২+১৩)	৭১.৭	২.২৬	১.১২
১৫।	সিলিং উদ্বৃত্ত কৃষি জমি	১৪.৬	০.৪৬	০.২৩
১৬।	মোট খাস জমি-জলা ও সিলিং উদ্বৃত্ত কৃষি জমি (১৪+১৫)	৮.৬২	২.৭২	১.৩৫
১৭।	অনুপস্থিত ভূ-স্বামীর চুক্তিতে দেয়া জমি	৯.৭	০.৩০	০.১৬
১৮।	পুনঃবণ্টনের ফলে প্রাপ্ত মোট জমি ও জলা (১৬+১৭)	৯৫.৯	৩.০২	১.৫১
১৯।	নিজ মালিকানাধীন জমি	০.০	০.০	০.৪৮
২০।	পুনঃবণ্টনের ফলে প্রাপ্ত মোট জমি-জলা ও নিজস্ব মালিকানাধীন জমি-জলা (১৮+১৯)	৯৫.৯	৩.০২	১.৯৯

উৎস ও হিসেবপত্তের পদ্ধতিগত দিকসমূহ: লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত। হিসেবে যেসব তথ্য-উৎস ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে আছে Barkat, Zaman and Rahman (2001), 2011 Population and Housing Census (Govt. of Bangladesh 2012), Census of Agriculture 1996 (Govt. of Bangladesh 1999)। সিলিং উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ এবং অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের যে জমি ভাগ-বর্গা চুক্তিতে চাষ হয় সে পরিমাণের হিসেব নেয়া হয়েছে Saha (2007)-র গবেষণা থেকে। অচিহ্নিত খাস জমি ও জলার আনুমানিক পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে লেখক কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৫ সালের "দ্রুত জরিপ"-এর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ জরিপের ভিত্তিতে দেখা গেছে সমগ্র দেশে অচিহ্নিত খাস জমি-জলার আনুমানিক পরিমাণ হবে মোট চিহ্নিত খাস জমি-জলার ৬২ শতাংশের সমপরিমাণ।

২. বণ্টনযোগ্য যে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৫ হাজার বিঘা খাস জমি-জলা পাওয়া যাবে তার মধ্যে আছে ৯৯ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা চিহ্নিত খাস জমি-জলা (মোট খাস জমি-জলার ৬২ শতাংশ) আর ৬১ লক্ষ ৭৫ হাজার বিঘা **অচিহ্নিত** খাস জমি-জলা (মোট খাস জমি-জলার ৩৮ শতাংশ)।

৩. বণ্টনযোগ্য যে ৯৯ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা চিহ্নিত খাস জমি-জলা পাওয়া যাবে তার মধ্যে আছে ২৪ লক্ষ ১০ হাজার বিঘা চিহ্নিত কৃষি খাস জমি (যা মোট চিহ্নিত খাস জমি-জলার ২৪ শতাংশ), ৫০ লক্ষ ৫৯ হাজার বিঘা চিহ্নিত অকৃষি জমি (যা মোট চিহ্নিত খাস জমি-জলার ৫১ শতাংশ) এবং ২৪ লক্ষ ৯১ হাজার বিঘা চিহ্নিত খাস জলা (যা মোট চিহ্নিত খাস জমি-জলার ২৫ শতাংশ)।

৪. সমগ্র দেশে এখন (২০১৫ সালে) মোট খানার (household) সংখ্যা ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ যার মধ্যে গ্রামীণ খানার সংখ্যা ২ কোটি ৯০ লক্ষ (দেশের মোট খানার ৮০ শতাংশ গ্রামীণ খানা)। প্রস্তাবিত ভূমিসংস্কারের আওতায় দেশের মোট ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭২ হাজার গ্রামীণ খানার মধ্যে বণ্টনযোগ্য জমি-জলা পাবেন আনুমানিক ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭২ হাজার বিভিন্ন শ্রেণির/বর্গের "ভূমিহীন" খানা যারা দেশের মোট খানার ৪০ শতাংশ আর মোট গ্রামীণ খানার ৫০ শতাংশ।

৫. ভূমিসংস্কারের আওতায় গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণির/বর্গের যে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার ভূমিহীন খানা জমি-জলা পাবেন তাদের মধ্যে থাকবে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ভূমিহীন শ্রেণি-১ খানা (এখন যাদের নিজমালিকানায় কোনো চাষের জমি তো নেইই এমনকি নিজমালিকানায় বসতভিটাও নেই), ৬৯ লক্ষ ৪২ হাজার ভূমিহীন শ্রেণি-২ খানা (এখন যাদের নিজমালিকানায় বসতভিটা আছে কিন্তু নিজমালিকানায় কোনো চাষের জমি নেই), আর ৭২ লক্ষ ৫ হাজার ভূমিহীন শ্রেণি-৩ খানা (এখন যাদের নিজমালিকানায় বসতভিটা আছে এবং সেই সাথে আছে নিজমালিকানায় মাত্র ৫০ ডেসিমেল অথবা ১.৫ বিঘা পর্যন্ত চাষের জমি)।

৬. ভূমিসংস্কার পরবর্তী অর্থাৎ বণ্টন-উদ্দিষ্ট মোট জমি-জলা সমবণ্টন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শ্রেণি/বর্গের ভূমিহীন খানার জোতের গড় আকার (average firm size) হতে পারে নিম্নরূপ: ভূমিহীন শ্রেণি-১ খানার ৯৫.৯ বিঘা (যদি সংস্কারের উদ্দেশ্যে বণ্টিতব্য জমি-জলার সবটুকুই তাদের দেয়া হয়), ভূমিহীন শ্রেণি ১ ও ২ খানার গড় ৩.০২ বিঘা (যদি সংস্কারের উদ্দেশ্যে বণ্টিতব্য জমি-জলার সবটুকু এই দুই শ্রেণির ভূমিহীন খানার মধ্যে সমবণ্টন হয়), আর ভূমিহীন শ্রেণি ১,২ ও ৩ খানার গড় হবে ১.৯৯ বিঘা (যদি সংস্কারের উদ্দেশ্যে বণ্টিতব্য জমি-জলার সবটুকু এই তিন শ্রেণির ভূমিহীন খানার মধ্যে সমবণ্টন হয়)। অর্থাৎ বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের ফলে এখনকার ভূমিহীন খানার জোতের গড় আয়তন তত্ত্বগতভাবে হতে পারে ভূমিহীন শ্রেণি ১,২ ও ৩-এর প্রায় ২ বিঘা থেকে (যার মধ্যে ১.৫১ বিঘা পুনর্বণ্টনে প্রাপ্ত আর ০.৪৮ বিঘা এখনকার নিজমালিকানার জমি) ভূমিহীন-১ শ্রেণির খানা প্রতি প্রায় ৯৬ বিঘা পর্যন্ত (বণ্টনযোগ্য সব জমি-জলা যদি এদের মধ্যে বণ্টন করা হয়)। এখানে বলে রাখা উচিত যে যেহেতু বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারে আমার প্রস্তাব হলো ভূমিহীন শ্রেণি-১, শ্রেণি-২ ও শ্রেণি-৩-এর খানাদের মধ্যে জমি-জলা বণ্টন করা সেহেতু ভূমিসংস্কার পরবর্তী খানার জোতের গড় সাইজ হবে আনুমানিক ২ বিঘা। জোতের এই গড় সাইজ অর্থনীতির হিসেবে ফলপ্রদ কিনা– এ প্রশ্ন একদিক থেকে অযৌক্তিক নয় আবার অন্যদিক থেকে যুক্তিহীন। কারণ যাদের অবস্থান বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের বিপক্ষে তারা তো বলেন যে দেশে জমি-জলা এতই স্বল্প যে তা দিয়ে অর্থনৈতিক ফলপ্রদ কোনো জোত গড়া সম্ভব নয়। আমার প্রশ্ন– বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কার করে খানা প্রতি ২ বিঘার সমপরিমাণ জোত গড়া সম্ভব– তারা এটা মানেন কিনা? যদি না মানেন তাহলে প্রশ্ন– খানা প্রতি ২ বিঘা জোতের সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করে ফসলের বহুমুখীকরণ, প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সমবায় বা যৌথ ব্যবস্থাপনার খামারসহ যৌথ-

বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুললে– এসবের 'synergistic effect' বা যৌথ প্রভাব কেমন হতে পারে? আমি নিশ্চিত এসব বাস্তবায়িত হলে কৃষির কাঙ্ক্ষিত সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রগতি হবে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ভিত ভেঙ্গে যাবে, এবং সমগ্রক জাতীয় উন্নয়ন-প্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

৭. সমগ্রক কৃষিসংস্কারের আওতায় আমার প্রস্তাবিত বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কার শুধুমাত্র আমাদের গ্রামের মানুষের জন্যই নিয়োজিত হবে তা নয়। নগরের দরিদ্র-বিত্তহীন-স্বল্পবিত্ত-স্বল্পআয়ী মানুষদের অন্যতম প্রধান সমস্যা আবাসন সমস্যা দূরীকরণার্থে প্রয়োজন হবে অকৃষি খাস জমির ক্ষুদ্র অংশ। যে অকৃষি খাস জমিও নগর দরিদ্রদের আবাসন নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হবে। আর একই সাথে শহর-নগর এলাকায় প্রাপ্য সিলিং উদ্বৃত্ত অকৃষি জমি (অকৃষি জমির জন্য সিলিং নির্ধারণ করতে হবে) দিয়ে শহর-নগরবাসী দরিদ্র মানুষের (যাদের মধ্যে আছেন ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী, স্বল্প আয়ি মানুষের সেটেলম্যান্ট) দারিদ্র্য স্থায়ীভাবে দূর করা সম্ভব এবং তাদের জীবনমান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিকশিত করা সম্ভব এবং তা স্বল্প সময়েই সম্ভব। সমগ্র বিষয়টি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার।

এতক্ষণ আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের আওতায় কোন বর্গের ভূমিহীন কৃষিজীবী ও জলাজীবীরা কি পরিমাণে-কোন জমি-জলা পেতে পারেন এবং তাদের জোতের গড় আয়তন কেমন হতে পারে– এসব নিয়ে পদ্ধতিগত বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় কিছু হিসেবপত্তর। এখন যুক্তগতভাবেই দেখানো প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের সম্ভাব্য প্রভাব-অভিঘাত কি হতে পারে? এ প্রশ্নের সহজ-সরল সদুত্তর দেয়া বেশ সাহসের ব্যাপার। কারণ একদিকে যেমন বিভিন্ন ধরনের জমি-জলার মান-গুণ এক নয় অন্যদিকে বণ্টনতব্য মোট জমি-জলার মান-গুণ জমি-জলা সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। সেইসাথে এ মুহূর্তে আমরা এও জানি না যে বণ্টনে প্রাপ্ত জমি-জলায় কৃষিজীবী-জলাজীবীদের ব্যবহার প্যাটার্ন কেমন হবে। এসব নিয়ে তারা ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়ায়ই সিদ্ধান্ত নেবেন। অর্থাৎ এ মুহূর্তে এ কথা মেনে নেয়া সমীচীন হবে যে ভূমিসংস্কারের আওতাধীন জমি-জলায় কোথায়-কখন-কি ফসল লাগানো হবে, কোন জলায় কোন মাছ কি পরিমাণে উৎপাদন হবে, উৎপাদন উপকরণ (যেমন বীজ, সার, সেচ ফসল ও মাছ উৎপাদন নিমিত্ত ওষুধপত্তর) কোথা থেকে কি শর্তে সংগৃহিত হবে, কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, বিনিয়োগ কাঠামো কি হবে এবং কেমন করে হবে, সমন্বিত কৃষি খামার কোথায় এবং কিভাবে হবে, যৌথ উদ্যোগের (সমবায়ী) কর্মকাণ্ড কোথায় হবে, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা কি হবে– এসবই ভূমিসংস্কার উদ্দিষ্ট কৃষিজীবী ও জলজীবীরা রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মী ও বিজ্ঞানীদের সাথে যৌথ পরামর্শে সময়মত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের প্রভাব-অভিঘাত অর্থাৎ এর ফলে উৎপাদন অবস্থা নিদেনপক্ষে কেমন হতে পারে এবং একইসাথে ভূমিসংস্কারের ফলে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনে সম্ভাব্য মৌলিক কি পরিবর্তন হতে পারে– এ সম্পর্কে আনুমানিক ধারণা দেয়া যেতে পারে।

আমার প্রস্তাবিত বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারের আওতায় মোট প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ ভূমিহীন কৃষি-খানায় (ভূমিহীন শ্রেণি-১, ভূমিহীন শ্রেণি-২, ভূমিহীন শ্রেণি-৩) মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩৮ হাজার বিঘা আবাদি জমি বণ্টন করা হবে এবং আনুমানিক ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ভূমিহীন জলাজীবী খানায় আনুমানিক ৪৮ লক্ষ ৫৪ হাজার বিঘা জলা বণ্টন করা হবে (দেখুন সারণি ১১)। আমার হিসেবে ভূমিসংস্কারের আওতায় বণ্টনকৃত ঐসব জমি ও জলা থেকে বছরে কমপক্ষে যা এবং যে পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব তার হিসেবপত্তর হতে পারে এরকম (বছরে কমপক্ষে): ৮০ লক্ষ ৫৯ হাজার টন ধান, ৩৭ লক্ষ ১৯ হাজার টন মসুর ডাল, ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টন পাট, মোট ৩০ লক্ষ ৫২ টন মাছ (যার মধ্যে ১২,৫৮,৪১৪ টন সিলভার কার্প, ৮,৯৮,৮৬৭ টন করে কাতল ও রুই), ২ কোটি ৮৭ লক্ষ গরু ও সমপরিমাণ ছাগল, ১২ কোটি ১১ লক্ষ হাঁস, এবং ২৮ কোটি ৭৪ লক্ষ মুরগি (এসব হিসেবের পদ্ধতিসহ হিসেব ফল দেখুন সারণি ১১)।

উল্লিখিত হিসেবপত্তর থেকে বলা দরকার যে বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের ফলে বণ্টিতব্য জমি-জলায় এমন কি বর্তমান ফলন কাঠামোর নিচুস্তর ধরে নিলেও কমপক্ষে যা উৎপাদন হবে তা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি।

আর ঐসব জমি জলায় যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারে মোট উৎপাদন সম্ভাবনা যে আমার উল্লিখিত হিসেবকে ২-৩ গুণ ছাড়িয়ে যাবে– এ নিয়ে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই (এ কথা আমি জেনেশুনে বলছি)। আর মৌলিক পরিবর্তন যেসব ক্ষেত্রে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো (১) গ্রামাঞ্চলে জমি-জলার উপর মালিকানা কাঠামোর এমন রূপান্তর ঘটবে যখন জমি-জলা উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা উদ্ভবের শর্তটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, (২) গ্রামের এখনকার ভূমিহীন মানুষদের জীবনযাত্রা-জীবনমান উত্তরোত্তর উন্নততর হবে এবং তারা আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন।

সারণি ১১: বণ্টনমূলক ভূমিসংস্কারের ফলে বণ্টনকৃত জমি-জলায় সম্ভাব্য সর্বনিম্ন বার্ষিক উৎপাদন (কোন ধরনের বাড়তি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার না করে এবং বাড়তি বিনিয়োগ না করে)

উৎপাদিত দ্রব্য	বণ্টনকৃত মোট ১,৬৭,৩৮,৪০৪ বিঘা কৃষি জমিতে বছরে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ উৎপাদন হবে (টন)	বণ্টনকৃত মোট ৪৮,৫৩,৮৮৪ বিঘা জলায় বছরে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ উৎপাদন হবে (টন)	মোট ১,৪৩,৭১,৭২০টি ভূমিহীন খানা যারা বণ্টনকৃত জমি-জলা পাবেন (কৃষি জমি পাবেন ১,১০,৮৫,০৩৮টি খানা আর জলা পাবেন ৩২,১৪,৪৯৩টি খানা) তাদের বছরে সর্বনিম্ন উৎপাদন
কৃষিজ দ্রব্য			
ধান (বিঘাপ্রতি ১৩ মণ)	৮০,৫৯,২৩৪	-	৮০,৫৯,২৩৪
মসুর ডাল (বিঘাপ্রতি ৬ মণ)	৩৭,১৯,৬৪৬	-	৩৭,১৯,৬৪৬
পাট (বিঘাপ্রতি ৮ মণ)	৪৯,৫৯,৫২৮	-	৪৯,৫৯,৫২৮
মাছ			
সিলভার কার্প (বিঘাপ্রতি ৭ মণ)	-	১২,৫৮,৪১৪	১২,৫৮,৪১৪
কাতল (বিঘাপ্রতি ৫ মণ)	-	৮,৯৮,৮৬৭	৮,৯৮,৮৬৭
রুই (বিঘাপ্রতি ৫ মণ)	-	৮,৯৮,৯৬৭	৮,৯৮,৮৬৭
	মোট =	৩০,৫২,১৪৯	
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি			
গরু (খানাপ্রতি ২টা)	২,২১,৭০,০৭৬	৬৫,৭৩,৩৬৪	২,৮৭,৪৩,৪৪০
ছাগল (খানাপ্রতি ২টা)	২,২১,৭০,০৭৬	৬৫,৭৩,৩৬৪	২,৮৭,৪৩,৪৪০
মুরগি (খানাপ্রতি ২০টা)	২২,১৭,০০,৭৬০	৬,৫৭,৩৩,৬৪০	৫৮,৭৪,৩৪,৪০০
হাঁস (কৃষি খানায় খানাপতি ৫টি ও জলা-খানায় খানাপ্রতি ২০টি)	৫,৫৪,২৫,১৯০	৬,৫৭,৩৩,৬৪০	১২,১১,৫৮,৮৩০

উৎস: লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত

এ পর্বে আমার মূল কথাটি আপাতত এভাবেও শেষ করা যায়:

১। আমার উত্থাপিত হিসেবপত্তরকে অনেকেই "অসম্ভব প্রস্তাবনা" অথবা "অবাস্তব প্রস্তাবনা" অথবা "অবান্তর প্রস্তাবনা" (absurd proposition) বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমার সহজ প্রশ্ন– গণিতশাস্ত্রের দোষ কি? আর গণিতশাস্ত্রের কোনো দোষ না থাকলে ঐ শাস্ত্রের অন্তর্গত পাটিগণিত শাস্ত্রেরও কোনো দোষ থাকতে পারে না। সারণি ১০ ও ১১ -তে আমি যা করেছি তার সবকিছুই তো নির্মোহ হিসেবের কথা। আমি জানি "রাজনীতি" শাস্ত্র "গণিত" শাস্ত্রের পথ ধরে চলে না। আর একথাও ঠিক যে "রাজনৈতিক পাটিগণিত" (political arithmetic) শাস্ত্রও "প্রকৃতি বিজ্ঞান" (natural science) নয়। এখানেই সম্ভবত "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্রের (political economy) নিরিখে উল্লিখিত সব হিসেবপত্তর বিচার-বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা।

২। আমি মনে করি দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ বণ্টনযোগ্য জমি-জলা রয়েছে তা দিয়েই একটি বণ্টনমূলক "ভূমি সংস্কার" সম্ভব। আর অতীতে যেহেতু কোনো সরকারের আমলেই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সত্যিকার আন্তরিক ও উদ্যোগী প্রয়াস নেয়া হয়নি, তাই যারা ভূমি সংস্কারের সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন— আমার বিবেচনায় হয় তারা না জেনে-শুনে করছেন, না হয় নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করছেন। ভয়-ভীতি অথবা অন্য কোনো কারণ থাকলে কৃষি-ভূমি সংস্কারের পক্ষে কথা না বলা অন্যায় হবে না, তবে বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন হবে বুদ্ধিবৃত্তিক মহাঅপরাধ।

৪.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: সুপারিশগুচ্ছ

এতক্ষণ জনকল্যাণকামী একটি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির গবেষণা-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপনে চেষ্টা করেছি। বিষয়টি 'রেন্ট-সিকার' নিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে আমাদের দেশে সবচেয়ে অমীমাংসিত বিষয়। বিষয়টি জটিল ও পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে জনকল্যাণকামী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দেশের সকলের বিবেচনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। বাস্তবায়নযোগ্যতার নিরিখে প্রস্তাবসমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিক করার কাজটি জরুরি। জনগণের সম্পৃক্ততায় এ কাজটি করতে পারে একটি জাতীয় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কমিশন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত সুপারিশ আপনা-আপনি বাস্তবায়িত হবে এমনটি আমি মনে করি না[৪৮]। জমি-জলা বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই অবগত। সে কারণেই বিশ্বাস করি যে বিষয়টির সুরাহা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সদিচ্ছা, স্বীকৃতি, যোগ্যতা এবং দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগঠিত কর্মকাণ্ডের উপরেই নির্ভর করছে। প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আমি পাঁচটি বৃহৎ বর্গে বিভক্ত করেছি (অবশ্যই এসবই পরস্পর সম্পর্কিত):

(ক) খাস জমি ও জলা সংক্রান্ত,

(খ) শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত,

(গ) আদিবাসী মানুষদের জমি-জলা-বনভূমি সম্পর্কিত,

(ঘ) ভূমি-মামলা সংক্রান্ত, এবং

(ঙ) আইন-কানুন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা সংক্রান্ত।

[৪৮] এমনটি মনে না করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এ দেশে 'দুঃখী' মানুষের জীবন 'সমাজ প্রধান'দের কাছে বাঁধা। বিষয়টির স্পষ্ট বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান লিখেছেন *"এদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ অনুন্নত, এবং বিশেষ করে এদেশের গ্রামীণ আর্থ-সমাজ ব্যবস্থায় আজো সামন্ততন্ত্রের মূল চরিত্র", অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে দুঃখী মানুষদের পেট্রনক্লায়েন্ট সম্পর্ক, রয়ে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সার্বিকভাবে 'মালিক'রাই প্রভুত্ব করছেন, হয় জমি-জলা নয়তো জমির পানি নয়তো চাষ-প্রযুক্তি বা অন্যান্য প্রযুক্তি নয়তো বাজার নয়তো মহাজনী অর্থের ওপর বা এই সমস্তের একাধিক বিষয়ে মালিকানা বা প্রভুত্ব কিংবা একক অথবা গোষ্ঠীগত আধিপত্যের জোরে। এবং এই ক্ষমতার জোরে গ্রামাঞ্চলের বিত্তহীন দুঃখী মানুষদের সিংহভাগ তাদের জীবিকা ও জীবনের জন্য, এমনকি এই সমাজের নারীকুল তাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও, এই 'মালিক'দের কৃপার ওপরে নির্ভরশীল"* (বিস্তারিত দেখুন, মোঃ আনিসুর রহমান, ২০০৮, পৃ. ১০)।

খাস জমি-জলা সংক্রান্ত সুপারিশ

১. ভূমি বিষয়ক সংসদীয় কমিটি (এখন থেকে ১০ বছর আগে ২০০৫ সালে) যে ৫০ লাখ একর খাস জমির (কৃষি, অকৃষি ও জলাভূমি) কথা বলেছেন তা অবিলম্বে চিহ্নিত করে জনগণকে অবহিত করা।

২. সকল খাস জমি ও জলা (চিহ্নিত-অচিহ্নিত, কৃষি-অকৃষি-জলা অবিলম্বে দেশের দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করা। এ বণ্টনে অগ্রাধিকারে দেয়া– গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন শ্রেণি-১, ভূমিহীন শ্রেণি-২, ভূমিহীন শ্রেণি-৩ এবং শহরাঞ্চলে দরিদ্র বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-স্বল্পআয়ী মানুষ।

৩. প্রাপ্য সমস্ত অকৃষি শহুরে খাস জমি শহরের গরিব জনগণের মধ্যে বণ্টন করা। বস্তি থেকে নগর দরিদ্রদের উচ্ছেদ বন্ধ এবং সহজ শর্তে খাস জমিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৪. দলিত, বেদে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ সবধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা।

৫. উপকূলীয় অঞ্চলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত খাস জমি অবিলম্বে ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেয়া।

৬. প্রকৃত পেশাদার জেলে সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাস জলাভূমিসমূহ বণ্টন করা।

৭. খাস জমি চিহ্নিতকরণের সমস্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচার মাধ্যমসমূহে (রেডিও, টিভি ও বাংলা দৈনিকসহ) প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

৮. চরের সকল জমি দিয়ারা জরিপ পূর্বক খাস খতিয়ানভুক্ত করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা।

৯. খাস জমির বিভ্রান্তিকর শ্রেণিবিভাজন বন্ধ করা (যেমন কৃষি জমিকে জলাভূমি হিসেবে দেখানো)।

১০. বণ্টনকৃত ও বণ্টনযোগ্য সমস্ত খাস জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করা।

১১. খাস জমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে কৃষক সংগঠন, ক্ষেত মজুর, নারী সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসমূহ ও স্কুল-শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

১২. এসব কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া।

১৩. খাস জমি চিহ্নিতকরণ, বাছাই, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ত স্থানীয় সরকারের ফলপ্রদ সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা।

১৪. কৃষক ও ভূমিহীনদের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক উপস্থিতির ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে একটি খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও জেলা পর্যায়ে একটি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন কমিটি গঠন করা। খাস জমি উদ্ভূত যে কোনো ধরনের বিবাদ অনুসন্ধান/তদন্ত করা এবং মালিকানা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা এই কমিটিকে প্রদান করা।

১৫. খাস জমির চিহ্নিতকরণ, বাছাইকরণ, বণ্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গরিব জনসাধারণ ও তাদের সবধরনের প্রতিষ্ঠান/সংগঠনসমূহের সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬. খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য বাংলায় লিখিত ফরম গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা ।

১৭. কৃষি খাস জমি বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

১৮. ভূমিহীনরা যেন তাদের মাঝে বণ্টনকৃত জমি-জলা রক্ষা করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনি-উপকরণ (ইনপুট) সরবরাহ করা ও আইনি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা।

১৯. জমির দখলি স্বত্বের সমস্যা ও ফসলের ওপর কর্তৃত্বের সমস্যা নিরসনে আইনগত সহায়তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সংস্থার সহায়তা (যেমন আইনগত পরামর্শ) ব্যবস্থা জোরদার করা।

২০. উৎপাদনমুখী উপকরণ ও কৃষিজ-ইনপুট কেনার ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধার প্রসার ঘটানো।

২১. উৎপন্ন ফসলের বাজারজাতকরণের সকল ধরনের সহায়ক ব্যবস্থা চালু করা। সরকারের পক্ষ থেকে গরিব ভূমিহীন জনগণকে পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি সহায়তা প্রদান করা।

২২. সম্ভাব্য সব ধরনের পরিস্থিতিতে গণমুখী সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা গঠনে প্রণোদনা দেয়া।

২৩. ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সাথে সাথে স্থানীয় তহসিল অফিস,সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার থানা এবং সর্বোপরি কোর্ট থেকে ন্যায়সম্মত অধিকার আদায় করে নেবার জন্য কৃষকদের সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলা।

২৪. কৃষক আন্দোলন/গরিব মানুষের অধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত নাগরিক সমাজ-সংগঠনগুলোর প্রচার-এডভোকেসি কার্যক্রম জোরদার করা।

২৫. কৃষক আন্দোলনের সফল কাহিনীসমূহ সঠিকভাবে নথিভুক্ত, প্রকাশ ও ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

২৬. ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা।

২৭. বণ্টন পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি Watch dog mechanism (যেমন নাগরিক কমিটি) প্রতিষ্ঠা করা।

২৮. বণ্টন প্রক্রিয়ার গতি দ্রুততর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি আইনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন নিশ্চিত করা।

২৯. খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়াকালীন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩০. খাস জমি ও ভূমিহীন ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের জন্য সরকারি জরিপের পাশাপাশি ভূমিহীন কৃষক, কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও এনজিও-সমূহের প্রতিনিধি নিয়ে একটি স্বাধীন জরিপ কমিটি গঠন করা।

৩১. ভূমিহীনদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩২. প্রভাবশালীদের জমি আত্মসাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় ভূমিহীন ও সচেতন নাগরিকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কার্যকর চাপ সৃষ্টিকারী জোট (pressure group) গঠন করা।

৩৩. ভূমি-সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন সহজবোধ্যভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

৩৪. প্রভাবশালীদের দ্বারা দায়েরকৃত ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে যত ধরনের মামলা আছে তা প্রত্যাহার করা।

খাস জমি নিয়ে অতীতে বাগাড়ম্বর হয়েছে অনেক। কাজের কাজ হয়েছে যৎসামান্য। দেশের ৬০ ভাগ মানুষকে কার্যত ভূমিহীন রেখে উন্নতি-প্রগতি অসম্ভব। দেশে প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ তথা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহিস্থের (excluded) অন্তর্ভুক্ত (include) করতে একটি মৌলিক কৃষি সংস্কার (ভূমি ও জলা সংস্কার যার অনুষঙ্গ) অনস্বীকার্য। আর তা বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যে সরকারই থাকুক না কেন থাকতে হবে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, হতে হবে তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, উদ্যোগী ও আন্তরিক। আমাদের চিহ্নিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ (enabling environment) নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পূর্বশর্তসমূহ পালন করতে হবে :

১. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে খাস জমি-জলা আত্মসাৎ করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে দেশে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, যারা খাস জমির সুষম বণ্টনে প্রধান অন্তরায়।

২. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে অবৈধ দখলদারদের বড় অংশ সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের সম-দলভুক্ত।

৩. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে খাস জমি-জলা চিহ্নিতকরণ ও বিলি-বণ্টন ফলপ্রদ করা জনকল্যাণকামী স্থানীয় সরকার ও সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব নয় (যা সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন"-এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ)।

৪. ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড ব্যবস্থা সেকেলে; ভূমিসংশ্লিষ্ট অফিস-আদালত অদক্ষ ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। রেকর্ড ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য মাত্রার স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সরকার ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে অনুধাবন করতে হবে যে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব যদি প্রকৃত ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাস জমি বণ্টন করা যায়।

৬. খাস জমির চিহ্নিতকরণ, বণ্টন এবং কৃষকের কার্যকর অধিকার নিশ্চিতকরণ — এসব ইস্যুতে জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিবেশন আহবান করা উচিত।

৭. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে খাস জমি-জলা সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যুতে ভূমিহীন, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে স্পষ্ট ঘোষণা থাকা প্রয়োজন।

৮. গরিব জনগণের অধিকারের প্রশ্নে সমস্ত কৃষক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও খাস জমির বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের অদক্ষতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা।

৯. খাস জমি বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় এবং থানা পর্যায়ের সমস্ত সামাজিক সংগঠন, এনজিও ও রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের কণ্ঠ প্রসারিত করা।

শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সম্পর্কিত সুপারিশ

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি যেহেতু অত্যন্ত জটিল সে জন্যই সমাধান নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু পূর্বশর্তের কথাও উল্লেখ করেছি। সমাধানযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জবরদখলকারী গোষ্ঠী ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টরা ইতোমধ্যে পরিকল্পিতভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করছেন। আর ধর্মভিত্তিক উগ্রসাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের ভিত প্রশস্ত হওয়ার ফলে এ প্রক্রিয়া দৃঢ়তর হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতাধীন সম্পদ-সম্পত্তির মালিক সরকার নয়, সরকার হল রক্ষক বা জিম্মাদার (custodian not owner)। সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা হল ঐ সম্পত্তি মূল মালিক এবং/অথবা তার উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে দেয়া; সেই সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত (লিজ) দেয়া এবং বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারদের অগ্রাধিকার দেয়া। সরকার যখন নিজেই বলছেন যে ২ লক্ষ একরের বেশি জমি-সম্পত্তি তার হাতে নেই[৪৯], তখন ধরে নিলে হিসেবে কোনো ভুল হবে না যে ২০ লক্ষ একর জমি-জমা দুর্বৃত্তরা গ্রাস করেছে।

আমি স্পষ্ট মনে করি যে সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট (specific) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। যেহেতু সমস্যাটি ভূমি সম্পদকেন্দ্রিক ও তা ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছে সেহেতু সুপারিশকৃত কোনো কোনো সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞজনের অভিমত/মতামত নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার প্রধান সুপারিশগুলো হলো নিম্নরূপ:

[৪৯] সরকারি হিসেবে দেশের ৬১ জেলা (পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলা বাদে) থেকে প্রাপ্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির সমন্বিত তালিকা অনুযায়ী দেশে অর্পিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৩৬ একর যার মধ্যে ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের দখলীয় সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪২০ একর, আর বেহাত বা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে আছে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪২০ একর। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী ঐ সম্পত্তির তালিকা গেজেটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তালিকা প্রকাশে আইনী জটিলতা দেখা দিয়েছে যে কারণে ভূমি মন্ত্রণালয় দিক-নির্দেশনা চেয়ে উপদেষ্টা পরিষদে সারসংক্ষেপ পাঠিয়েছে (সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০০৭)।

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন [The Vested Property Repeal (Return) Act-2001]- আর কালক্ষেপণ না করে বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ আইনে বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে যে সব পরিবর্তন সুপারিশ করেছেন সে সব বিবেচনা করা।

২. জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সরকারি ঘোষণা হিসেবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া যে উক্ত আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

৩. শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সম্পদ প্রত্যর্পণের লক্ষ্যে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা (জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণসহ)।

৪. সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারি রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি মূল মালিক/উত্তরাধিকারীদের কাছে লিজ (বন্দোবস্ত) দেয়া।

৫. শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে অধিগৃহীত যা কিছু ৯৯ বছরের লিজ (বন্দোবস্ত) দেয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করে মূল মালিক/উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেয়া।

৬. সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (priority) দেয়া, যেমন

   ক) অর্পিতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়েছেন,

   খ) যে সব খানা নারী প্রধান,

   গ) অর্পিতকরণের ফলে যারা বসতভিটা হারিয়েছেন,

   ঘ) অর্পিত মন্দির, প্রার্থনাস্থল, শ্মশান ঘাট ইত্যাদি,

   ঙ) তহসিলদারসহ ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবং তাদের যোগসাজসে যারা যে সব সম্পত্তি দখল করেছেন,

   চ) যে সকল ক্ষেত্রে প্রায় সকল উত্তরাধিকারী এ দেশের নাগরিক।

৭. জবরদখলকৃত শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি চিহ্নিত করে বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা।

৮. যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিভিন্নকারণে বিলম্বিত হতে পারে অথবা সমাধান বিঘ্নিত হতে পারে তাদের জন্য বিশেষ 'ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ' এর ব্যবস্থা করা। ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সরকারি খাস জমি-জলা, বন্ড, ঋণ সুবিধা (অর্থে এবং/ অথবা পণ্যে) ইত্যাদি।

৯. যে সকল শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির আইনগত দাবিদার (উত্তরাধিকারী) অনুপস্থিত সে সকল সম্পত্তি মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র হিন্দুজনগোষ্ঠীর (বিশেষত নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের) উন্নয়নে ব্যবহার করা ।

১০. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারকে (সংবিধানের ৫৯-৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি মোতাবেক) সর্বোচ্চ মাত্রায় সম্পৃক্ত করা।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন (সর্বশেষ ২০০৮ সালে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী)। অমানবিক এই সমস্যাটি গত ৫০ বছর যাবৎ জিইয়ে রাখা হয়েছে ; ভূ-সম্পত্তি হাত বদল হয়েছে যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আইনগতভাবে প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাও হয়ত বা দুষ্কর ; সরকার বলছেন তাদের হাতে মাত্র ২ লক্ষ ১৫ হাজার একর ভূ-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ প্রায় সকল সম্পত্তি সরকারের বেহাত হয়েছে;[৫০] জোরদখলকারীরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতা বলয়ের সাথে সুসম্পর্কিত - সুতরাং কেউ কেউ হয়তবা ভাবতে পারেন যে সমস্যার সমাধানে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কল্পনাপ্রসূত অথবা যথেষ্ট

[৫০] সরকারের হিসেবে মোট শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির মধ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে "ক" তালিকাভুক্ত ২ লক্ষ ১৫ হাজার একর, আর সরকারেরই হিসেব মতে তাদের হাতে নেই এমন অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ৭ লক্ষ একর (যা "খ" তালিকাভুক্ত)। এসব হিসেবপত্তরে অনেক মারপ্যাচ আছে। এ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Barkat, Abul (2014b), "A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Property Act and Vested Property Act", পৃ. ৯-১২।

বাস্তবমুখী নয়। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট - সমস্যাটি মানব-সৃষ্ট কিন্তু মনুষ্য বিরোধী। সুতরাং সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান হতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যতে একই ধরনের এবং অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় অনিবার্য।

আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি সংক্রান্ত সুপারিশ

১. বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে) তা পূর্ণভাবে (কোনোভাবেই খণ্ডিত নয়) এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

২. শান্তি চুক্তির যে সকল ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনও কার্যকরী হয়নি সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া, যেমন ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি কমিশন সক্রিয়তর করা।

৩. আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও ঐতিহ্যগত শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা।

৪. জোরপূর্বক দখলকৃত পাহাড়ি জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি-শান্তি চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া মোতাবেক– ভূমি কমিশনে প্রেরণ ও সমাধান করা।

৫. সমতল ভূমির যে সকল বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছেন– তাদের স্বেচ্ছায় সমতল ভূমিতে ফিরে আসার জন্য প্রণোদনা দেয়া।

৬. সমতল ভূমির বাঙালি বসতি স্থাপনকারী অথবা বসতি নন, বন বিভাগ, সেনা বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি (উন্নয়ন প্রকল্পসহ) কর্তৃক ব্যক্তিগত অথবা যৌথ ভূমি-বন অধিগ্রহণ এখন থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা (complete moratorium)।

৭. যে সব আদিবাসী মানুষ ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব নিজ জমিতে বসবাস করছেন অথচ তাদের কোনো দলিলপত্তর নেই তাদের বসবাসকৃত ঐ জমিতে মালিকানা দলিল করে দেয়া (এটা ১৯০৮ সালের Limitation Act এর Section 26 সমর্থন করে)।

৮. আদিবাসী মানুষের ভূমি-অধিকার (যা আংশিকভাবে CHT Regulation 1900-এ স্বীকৃত) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া।

৯. ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির সাথে ভূমি কমিশন আইন ২০০১-এর যে সব ধারা সাযুজ্যহীন সেগুলো সংশোধন করা (শান্তি চুক্তি অনুযায়ী) এবং সংশোধিত ঐকমত্য অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা।

১০. পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা নন অথচ রাবার চাষসহ অন্যান্য প্লানটেশন চাষের জমি নিয়েছেন এবং গত ১০ বছর চাষাবাদ করছেন না এমন সব চুক্তি বাতিল করা।

১১. আদিবাসীদের প্রথা ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া।

১২. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।

১৩. আদিবাসীদের ভূমি জোরদখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

১৪. বনের আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা ও বনবিভাগের হয়রানি মামলা প্রত্যাহার করা।

১৫. ইকো পার্কের নামে বন উজাড় বন্ধ করা।

ভূমি-মামলায় পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ সংক্রান্ত সুপারিশ

সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো বহাল রেখে যেমন সমস্যার আদর্শ সমাধান সম্ভব নয় তেমনি এটাও ঠিক যে কাঠামো পরিবর্তন না করেও "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" হিসেবে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এদেশে ভূমি-মামলার বিষয়টির সুরাহা দেখতে হবে সামগ্রিক কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত মানব উন্নয়ন-এর অংশ হিসেবে। আর এসব বৈপ্লবিক এবং/অথবা বড় মাপের

সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত না করা গেলেও কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব যা ভূমি-মামলা-সংশ্লিষ্ট দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-ক্লেশ প্রশমনে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে সংস্কারের আওতায় আসতে পারেঃ (ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন; (খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইন ব্যবস্থা; (গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা। এবং অবশ্যই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১)-বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের লাগাতারভাবে বলে যাওয়া এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব কার্যকর করার প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এসব বিবেচনা থেকেই আমার প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোর্ট, ভূমি প্রশাসন, ও থানা-পুলিশের দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. স্থানীয় পর্যায়েই (গ্রাম/ইউনিয়ন/পাড়া/মহল্লা) প্রচলিত প্রথাগত 'শালিস' পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে নারীসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার জন্য স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

৪. দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি ট্রাইবুনাল গঠন করা।

৫. ভূমি-মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা– তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণ আইনসম্মত (কারণ দ্রুত নিষ্পত্তি আর্থিক-পেশী প্রতিপত্তিবানদের জন্য লাভজনক হতে পারে)। ভূমি-মামলা শ্রেণিবদ্ধ করে বিভিন্ন শ্রেণির মামলার নিষ্পত্তির সময়-সীমা বেঁধে দেয়া।

৬. নৈতিক উন্নত মানস-কাঠামো সম্পন্ন অধিক সংখ্যক দক্ষ পেশাজীবী বিচারক নিয়োগ দেয়া।

৭. ন্যায় বিচারের রায় কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা (যেমন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা স্বচ্ছ করা)।

৮. উপজেলা কোর্ট পুনঃস্থাপন করা (জনকল্যাণকামী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ)।

৯. ভূমির প্রকৃত মালিক অথবা তার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিরূপণ করা (বিক্রেতার মালিকানা নিশ্চিত না হয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা; জাল দলিল নিরূপণ করার ব্যবস্থা করা)।

১০. মাঠ পর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত ছাড়া *মিউটেশন* (নামজারি অথবা জমা-খারিজ) না করা।

১১. ভূমি-মামলার রায় প্রভাবিত করতে রাজনীতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরত রাখা– বিষয়টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা (সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা)।

১২. জমির জাল দলিল/কাগজপত্র করা এবং অবৈধ জমি দখলের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা (এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা)।

১৩. এমন আইন করা যাতে জমি-জমার জাল দলিলকরণের সাথে সম্পৃক্তরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

১৪. সার্ভেয়াররা যেন ভূমির রেকর্ড এবং সেটেলমেন্ট-এর কাজ সঠিক এবং প্রভাবমুক্তভাবে করতে সক্ষম হন– সরকারকে এ দায়িত্ব নেয়া।

১৫. আইনজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পেশার মানবিকীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; কেসের শ্রেণিভিত্তিক ফিস্ নির্ধারণ; ম্যাল-প্রাকটিস দূর করা ইত্যাদি)।

১৬. জমি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের মালিকানাস্বত্ব গুরুত্বসহ বিবেচনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা।

১৭. পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন এবং এ আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয় খতিয়ে দেখা (বিষয়টি জন্মসূত্রে মানুষের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের সাথে সম্পর্কিত)।

আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা সংক্রান্ত অন্যান্য সুপারিশ

১. খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ অকৃষি খাস জমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

২. ১৯৯৪ সালের শিকস্তি-পয়স্তি আইনের সংশোধনী বাতিল করা এবং শিকস্তি-পয়স্তির সকল চর-ভূমি খাস হিসেবে ঘোষণা দেয়া।

৩. রিয়াল এস্টেট ব্যবসা অথবা তথাকথিত গৃহায়নের নামে খাস জমি, জলাশয়-জলমহাল দখল ও ভরাট কঠোরভাবে দমন করা।

৪. খাস জমি-জলা ও উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত জমি-সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার (সংবিধানিক অধিকার) ও ভোগদখল নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা।

৫. অকৃষি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সিলিং নির্ধারণপূর্বক আইন প্রণয়ন করা এবং সিলিং উদ্বৃত্ত অকৃষি জমি সরকারের হাতে নিয়ে বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কার করা।

৬. সকল ভূমি জরিপ কাজ প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও স্থায়ী জরিপকারীদের দিয়ে করার ব্যবস্থা নেয়া।

৭. ভাগ/বর্গাচাষসহ অন্যান্য ভোগদখল স্বত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের আদলে করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা। বর্গাস্বত্ব আইন যথাদ্রুত সংস্কার ও বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যেন তা দারিদ্র-বান্ধব হয় এবং বর্গাধীন জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল হয়।

৮. কৃষি খাতে কর্মরত দিনমজুরসহ নারী-পুরুষভেদে সকলের জন্য বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমান নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ।

৯. ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতর করতে রেকর্ড সংরক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন ও সেটেলম্যান্ট একই মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা।

১০. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আদিম পদ্ধতি বাতিল করে সম্পূর্ণ বিষয়টি সমন্বয়পূর্ণ একক কর্তৃত্বে আনার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার একক পদ্ধতির আওতায় সার্টিফিকেট (CLO: Unitary System of Certificate of Land Ownership) প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা (এক্ষেত্রে বাঁধার বিষয়াদি বিবেচনা করে জনগণকে অবহিত করা)।

১১. ভূমি ও জলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট দারিদ্র দূরীকরণের জন্য একটি “জাতীয় ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি” (National Land-water Utilization Policy; National Land Use Policy) প্রণয়ন করা।

১২. সরকারিভাবে ভূমি-জলা ব্যাংক (Land-Waterbodies Bank) প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যাংকে ভূমি-জলা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদির হাল নাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে কেউ তথ্য পেতে পারেন: খাস জমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্ত অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সকল অর্পিত সম্পত্তির ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্ত অন্যান্য; আদিবাসী মানুষের জমি-জলা-বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবরদখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা ইত্যাদি; চিংড়ি ঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবর দখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা; সকল ভূমি-মামলার ধরন, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধের কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা; সকল বর্গাদারের বর্গাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট তথ্যের হাল নাগাদ অবস্থা ইত্যাদি।

১৩. কৃষি খাস জমি, অকৃষি খাস জমি, চরের জমি, আদিবাসীদের ভূমি, জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়িমহাল, চা বাগানের জমি, ওয়াকফ, ট্রাস্ট, দেবোত্তর সম্পত্তি, জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, ভূমি ব্যবহার, ভূমি জরিপ, ভূমি সংস্কার, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন– এসব নিয়ে যেসব আইনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রস্তাব করা হয়েছে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১৪. ভূমি সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকারসহ একক উত্তরাধিকার আইন (unitary law of inheritance) প্রণয়ন করা।

অধ্যায় ৫

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শেষ কথা

জমি, জলা, জঙ্গল আর জনমানুষ (যাদের বেশিরভাগই গ্রামে বাস করেন এবং দরিদ্র)– এসব বাদ দিলে বাংলাদেশে সম্পদ কোথায়? আর এ চার সম্পদের কার্যকরী সম্মিলনই তো আসলে উন্নয়ন। যে মানুষ জমি ও জলায় শ্রম দেন তিনি তার মালিক নন– এটাই 'রেন্ট-সিকার' নিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তবেষ্টিত বাংলাদেশের বর্তমান ও চলমান বাস্তবতা। জমি-জলা তো সম্পদের মাতা আর জমি-জলায় শ্রম দাতা হলেন সম্পদের পিতা। মাতা-পিতার প্রাকৃতিক স্বাভাবিক এ সম্পর্কটি এ দেশে অস্বীকৃত। এখানেই তো অনুন্নয়নের গোড়ার কথা।

একথা তো ধ্রুব সত্য যে জমি ও কৃষকই হলো সভ্যতার ভিত যেখানে কর্ষণ হলো সভ্যতার সাংস্কৃতিক ভিত্তি। জমি— দুষ্প্রাপ্য সম্পদ, আর সে কারণেই এ সম্পদের মালিকানা সবসময়ই পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক। আর জমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা সম্পৃক্ত বিষয়াদি সন্ত্রাস, কালো কর্মকাণ্ড, মামলা-মোকদ্দমাসহ প্রায় সকল ধরনের উৎপাদনবিরোধী ও মানব-কল্যাণবিমুখ কর্মকাণ্ডের উৎস। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎসও জমি। জমি— মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক শক্তিরও উৎস। জমির এতই অন্তর্নিহিত গুণ ও শক্তি যে বর্তমান কাঠামোতে কোনো ধরনের জমি-জলা বণ্টন (খাস-অখাস নির্বিশেষে) নিঃসন্দেহে প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। সেই সাথে একথাও অনস্বীকার্য যে, গরিব মানুষকে জমি দেবার কথা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করেননি— এহেন সরকার এখনও পর্যন্ত এদেশে বিরল। কিন্তু যেহেতু আইনগতভাবেই দরিদ্র জনগণই খাস জমি-জলাসহ সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলায় প্রকৃত মালিক হবার কথা সেহেতু তাদের মালিকানা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। দরিদ্র মানুষের মালিকানায় খাস জমি-জলা— দারিদ্র্য উচ্ছেদেও অন্যতম প্রধান কৌশল হতে পারে। উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনীতিতে বার্ষিক যে ৭ শতাংশ-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে কৃষি- ভূমি-জলা সংস্কার করলে শুধু যে তা অর্জন হবে তাই নয়, বরঞ্চ সেই সাথে ধনী-দরিদ্রের সম্পদ বৈষম্য ও অসমতা যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পাবে। তাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বেগবান হবে। শক্তিশালী হবে প্রকৃত 'টেকসই উন্নয়ন'-এর ভিত।

জমি-জলা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা-অধিকার অথবা আইনগতভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মালিকানা নিশ্চিত করার সাথে ধর্মের অথবা জাতিসত্তা হিসেবে সংখ্যালঘু অথবা আদিবাসী হবার অথবা দরিদ্র হবার কি সম্পর্ক? এ সম্পর্ক থাকতে পারে শুধু অসভ্য সমাজে। আমরা যতই অসভ্য সমাজে বাস করি না কেন– 'আমি (প্রত্যেকে) অসভ্য' এ দাবি তো ধোপ-দুরস্ত একজন দুর্বৃত্তও এদেশে মানবেন না। দেশকে সবার জন্য বাসযোগ্য করার আগে নিজের মানস-কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন; হতে হবে মনে প্রাণে মানবকল্যণকামী, অসাম্প্রদায়িক– এদেশে অধিকাংশ মানুষই তো মনে প্রাণে তাই। মনে রাখা উচিত হবে যে যেসব দুর্বৃত্তরা খাস জমি-জলা অথবা হিন্দুদের সম্পত্তি ও আদিবাসী মানুষের সম্পত্তি জোরদখল করে লুটেপুটে খাচ্ছে তারা কিন্তু এ দেশের গুটিকয়েক মানুষ– সংখ্যায় স্বল্প। ঐতিহাসিকভাবেই তো অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো ও প্রগতির ক্ষেত্র এদেশে যথেষ্ট উর্বর ও বিস্তৃত। তা হলে তো কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারও সম্ভব।

সমস্যাটা রাজনৈতিক। বৃহৎ রাজনৈতিক দল মাত্রই জমি-জলার বিষয়টিকে শুধু ভোটের ইস্যু হিসেবেই দেখেন। সেটাও তো ভাল কথা– অন্তত ইস্যুটি স্বীকৃত (অনেক বড় মাপের ইস্যুও তো এখনও স্বীকৃত নয় আবার নন-ইস্যুকে ইস্যু করতেও আমরা পারদর্শী)। অবশ্য তারা ক্ষমতায় আসার আগে গরিব মানুষকে জমি-জলা সম্পত্তি দেয়ার কথা বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ফেরত দেবার কথা বলেন, আদিবাসী মানুষের সব সমস্যার সমাধানে প্রতিশ্রুতি দেন, আর নারীকে দিয়ে দেন সবকিছু– কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করেন। আর অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের দল– প্রগতিশীল-অপ্রগতিশীল নির্বিশেষে একই ওয়াদা করেন– পার্থক্য হলো

তারা কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারেননি; সেই সাথে এ নিয়ে কার্যকরী-ফলপ্রসূ কোনো আন্দোলন-লড়াই সংগ্রাম করছেন– তাও নয়। নাগরিক সমাজসহ বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কেউ কেউ কখনও কখনও কেন যেন এ বিষয়ে বেশ যুক্তিসঙ্গত কথা বলেন। এখন যা দরকার সেটা হলো কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বহুমুখী জটিল বিষয়টিকে জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যেহেতু এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের যুক্তিসঙ্গত প্রাণ-দাবি সেহেতু ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন ভূমি সংস্কারের খসড়া প্রস্তাবও প্রণয়ন করেছিল। এ খসড়া প্রস্তাবের সারাংশ নিম্নরূপ: "১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে এদেশের ভূখণ্ডে জমি মালিকানায় মেরুকরণ শুরু হয় বড়ো ও ছোট মালিক-চাষি দুই শ্রেণিই বাড়তে থাকে এবং মাঝারি চাষি কমতে থাকে, যার ফলে জমির মালিকানায় বৈষম্য বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে ছোট মালিক-চাষি ও বর্গাচাষি দুয়েরই আপেক্ষিক সংখ্যা বাড়তে থাকে। ছোট চাষিদের জমিতে নিবিড় চাষ ও আধুনিক চাষ-পদ্ধতির প্রয়োগের কারণে ফলনও বড়ো চাষিদের জমির তুলনায় বেশি হারে বাড়তে থাকে। তাই একই সঙ্গে দু'টো কারণে রাষ্ট্রীয় দর্শন অনুযায়ী সমতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের পথে যাবার জন্য, এবং দেশের কৃষিতে সার্বিকভাবে উৎপাদনের হার বাড়াবার জন্য ভূমি সংস্কার জরুরি হয়ে পড়ে। জমির বণ্টনে পূর্ণ ইকুইটি এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা কেবল সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক (যৌথ) মালিকানা ও যৌথ চাষের মাধ্যমেই হতে পারে যাতে ইকনমি অব্ স্কেল আদায় করা যায় এবং ফসলের বণ্টন শ্রম অনুযায়ী হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি মালিক-চাষিদের নিজের নিজের জমির ওপর গভীর টান থাকে যার ফলে হঠাৎ করে মালিকানা হারিয়ে ফেললে তারা উৎপাদন-কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারে এই কারণে এই পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বড়ো ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে যারা জমিতে বড়ো স্কেলে শ্রমিক নিয়োগ করে ও পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রম শোষণ করে অনর্জিত আয় ভোগ করে তাদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। এসব বিবেচনায় পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করে যে, ভূমি সংস্কারের প্রথম পর্যায়ে যে আয়তনে জমি ঐতিহাসিকভাবে বেশি ফলনশীল হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় রেখে একটা সীমার ওপরে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে সেখানে দৃষ্টান্তমূলক সমবায়ভিত্তিক চাষ হবে। বর্তমানে যেসব বর্গাচাষি এ-সমস্ত জমিতে চাষ করছে তাদের এই সমবায়গুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া হবে। যে সমস্ত বর্গাচাষি ভূমি-সংস্কারসীমার চাইতে ছোট জমিতে কাজ করছে তাদের যতদিন সমবায়ের পরিধি বাড়িয়ে সদস্য করা না হয়; ততদিন তাদের আইনগত ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য, এবং যাতে সমবায়ভিত্তিক চাষের বাস্তব পরীক্ষার জন্য অর্থপূর্ণ আয়তনে জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, এই বিবেচনায় জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা প্রস্তাব করা হয় ১০ 'স্ট্যান্ডার্ড' একর, যে সীমা বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে জমির ফলনশীলতার তারতম্য অনুযায়ী কমবেশি হবে (যথা, কুমিল্লার জন্য ৭.৫ একর এবং যশোরের জন্য ১৩.৮ একর)। এভাবে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে তাদের সমবায়ভিত্তিক চাষের জন্য ভূমিহীন পরিবার থেকে কর্মী নেওয়া হবে এবং তাদের সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে অষ্টম শ্রেণি, এবং তাদের পরিবারিক জমির পরিমাণ তিন একরের অনূর্ধ্ব হতে হবে। এদের মধ্যে এই কাজে মুক্তিযোদ্ধা এবং/অথবা সেচ-গ্রুপের দায়িত্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চাষিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে" (আনিসুর রহমান, "পথে যা পেয়েছি", ২০০৪: ৫১-৫২)।

বাংলাদেশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক যে বিকাশ প্রবণতা সেখানে 'উন্নয়ন' বলতে শুধুমাত্র মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা যে কোনো পথে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি বুঝলে ভুল হবে। কারণ এসব বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধির হারের সাথে প্রকৃত দারিদ্র্য হ্রাসের সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য উচ্ছেদ করে না; বৈষম্য-অসমতা দূর করে না; উল্টো– অনেকক্ষেত্রে ঐ বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধিরই সহায়ক। আসলে উন্নয়ন দর্শন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল এমন হতে হবে যা দারিদ্র্যের সব রূপ নিরসন করবে এবং সেই সাথে অর্থনীতির বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। আর তা যদি নিশ্চিত করতে হয় সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে যেখানে মানব উন্নয়নে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি, কৃষক সংগঠনসহ বিভিন্ন স্তরের নাগরিক সমাজকে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা ও ভূমি অফিসের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর

করতে হবে জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ওপর। প্রস্তাবিত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারই পারে এ দেশে দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক একিভূত উন্নয়ন সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে। এ সংস্কার সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে দুটি বিষয়ের সম্মিলন প্রয়োজন: (১) উষ্ণ হৃদয় সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব, এবং (২) সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ। সমগ্র বিষয়টি মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনায় সিক্ত সুদৃঢ় এক রাজনৈতিক অঙ্গিকারের বিষয়। বিষয়টি যেহেতু জ্ঞানভিত্তিক লড়াই-সংগ্রামের, সেহেতু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন নীতি-কৌশল বিষয়ে দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব (home grown epistemology) বিনির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা জরুরি।

তথ্য উৎস

ABDULLAH, A. (1976). "Land Reform and Agrarian Change in Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies,* Vol. 4, No-1, January.

ADNAN.S, and R. DASTIDAR (2011). Alienation of the Lands of Indigenous Peoples in the Chittagonj Hill Tracts of Bangladesh. Chittagonj Hill Tracts Commission (CHTC) and International Work Group for Indiginous Affairs.

AHMED, A. (1995). *Rural Land Use in Bangladesh.* Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development.

AHMED, S. A. (1996). Personal Letter to the Director, ADAB, Mr. Shamsul Huda after having reviewed the Research Report "Impact of Vested Property Act on Rural Bangladesh: An Exploratory Study" by Barkat et al, 1996. Dhaka.

আইয়ুব, আলী মোহাম্মদ খান (২০০৭). *গাড়ো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী।* সোভা প্রকাশক: ঢাকা

AKTAR, S. and A. S. M. ABDULLAH (2007). "A Comparative Study on Hindu Law between Bangladesh and India. Asian Affairs'', vol. 29, No. 4: 61-95, October-December, 2007; CDRB Publications.

ALAM, M. at el. (2010). ''Attractiveness of Tea Industry in Bangladesh: A Projection Based on Porter's Five Forces Model.'' Institution of Cost and Management Accountant of Bangladesh (ICMAB), Dhaka, vol. xxxviii. American REALLY took over the world. London: Ebury Press.

AMIN, S. N. (1996). ''The World of Muslim Women in Colonial Bengal 1876-1939''. Social, Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia, Series 55. Brill Academic Publishers.

ANGOC and ALRD (2011). Asian Regional Workshop on Women and Land Rights: Workshop Proceedings. Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

আনিসুর রহমান, মো. (২০০৪), পথে যা পেয়েছি, ঢাকা: এ্যডর্ন পাবলিশার্স।

আনিসুর রহমান, মো. (২০০৮). "বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার"। শামসুল হুদা (সম্পাদিত), দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে ভূমি কৃষি ও জলা সংস্কার অপরিহার্য। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভলপমেন্ট।

বায়েস, আব্দুল এবং মাহাবুব হোসেন (২০০৭). *গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি: জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা।* ঢাকা: রাইটার্স ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং স্বরাজ প্রকাশনী।

বায়েস, আব্দুল এবং মাহাবুব হোসেন (২০১৩). *তিন বিঘা জমি–কৃষি ও খাদ্য বিবর্তন বৃত্তান্ত।* ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।

বারকাত, আবুল (১৯৮৪). "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান"। সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ঢাকা: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র।

বারকাত, আবুল (১৯৮৫) *বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য।* আবু মাহমুদ রচিত মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১. ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বারকাত, আবুল (২০০১). "বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন: গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ঢাকা: ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

বারকাত, আবুল (২০০৩). "বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্র: কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। ঢাকা, ৩ জানুয়ারি। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বারকাত, আবুল (২০০৪ক). "বাংলাদেশের রাজনৈতিক— অর্থনৈতিক চালচিত্র: কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী-২০০৪*, পৃ. ৩-৩৮, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বারকাত, আবুল (২০০৪খ). "গভীর ষড়যন্ত্রের পথ ধরে দেশ গাঢ়ো অন্ধকারের দিকে দ্রুত এগুচ্ছে "। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ সেপ্টেম্বর।

বারকাত, আবুল (২০০৫ক). "বাংলাদেশ মৌলবাদের অর্থনীতি "। ড. আব্দুল গফুর প্রথম স্মারক বক্তৃতা। ঢাকা: ১৪ এপ্রিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বারকাত, আবুল (২০০৫খ). "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার: মহা বিপর্যয় রোধে সেক্যুলার ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই " । সেক্যুলার ইউনিটি বাংলাদেশ। ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর। ঢাকা: সেক্যুলার ইউনিটি বাংলাদেশ।

বারকাত, আবুল (২০০৫গ). "অর্পিত সম্পত্তি আইন: ক্ষতির ব্যাপ্তি ও করণীয় প্রসংগে"। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এণ্ড ইনটারন্যাশনাল এফেয়ার্স আয়োজিত সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা ২০০৫।

বারকাত, আবুল (২০০৬ক). "একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী: ১৫ জুলাই ২০০৬।

বারকাত, আবুল (২০০৬খ). "একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী: ১৫ জুলাই ২০০৬।

বারকাত, আবুল (২০০৭ক) বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি। ঢাকা: সোসাইটি, ইকনমি এণ্ড স্টেট জার্নাল।

বারকাত, আবুল (২০০৭খ). "বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের বঞ্চনা"। ঢাকা: এলএলআরডি, নিজেরা করি, সমতা, মে ২০০৭।

বারকাত, আবুল (২০০৮ক). "বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: উন্নয়নের দিগন্ত"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার ২০০৮, চট্টগ্রাম: ৭ ফেব্রুয়ারি।

বারকাত, আবুল (২০০৮খ). "বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা: প্রকৃতি ও সামধান"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, এএলআরডি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার)। ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

বারকাত, আবুল (২০০৮গ). "বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: উন্নয়নে যার বিকল্প নেই"। Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 24, no. 1 and 2.

বারকাত, আবুল (২০০৯). "বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন"। বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে রচিত মূল প্রবন্ধ ০৭ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা।

বারকাত, আবুল (২০১১). "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে"। *Bangladesh Journal of Political Economy*, vol. 27, no. 1 and 2, pp. 29-36.

বারকাত, আবুল (২০১২ক). "বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি"। জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২।

বারকাত, আবুল (২০১২খ). "বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট"। শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা: ২৭ জানুয়ারী ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বারকাত, আবুল (২০১২গ). "গণমুখী সমবায় আন্দোলন: কৃষকের দারিদ্র্য মুক্তির অন্যতম পথ"। এএলআরডি আয়োজিত "খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুদে কৃষকের সমবায় আন্দোলন" শীর্ষক আলোচনা সভায় উত্থাপন পত্র। ঢাকা: ২০ অক্টোবর ২০১২।

বারকাত, আবুল (২০১৪ক). "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের সন্ধানে"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোক-বক্তৃতা, ঢাকা: ২২ মার্চ ২০১৪

বারকাত, আবুল (২০১৪খ). "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"। *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "লোকবক্তৃতা ২০১৪", ২২ মার্চ ২০১৪ (৮ চৈত্র ১৪২০)*, সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বারকাত, আবুল (২০১৪গ). "বাংলাদেশে রাজনৈতিক মৌলবাদের অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: মর্মার্থ ও করণীয়"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনার ২০০৫, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা: ১২ ডিসেম্বর ২০১৫

বারকাত, আবুল (২০১৪ঘ). "বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি"। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ বক্তৃতা, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেট ভবন, রাজশাহী: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

বারকাত, আবুল (২০১৫). *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে।* মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা: ঢাকা

বারকাত, আবুল (২০১৬ক). *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে।* মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা: ঢাকা

বারকাত, আবুল (২০১৬খ). "বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি"। অধ্যাপক আহমেদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা। বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

বারকাত, আবুল ও ওবায়দুর রহমান (অনূদিত), (২০০৬ক). *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল., ওবায়দুর রহমান ও সেলিম রেজা (অনূদিত), (২০০৬খ). *বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি—বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকথা।* ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০০৮). জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর নির্বাচনী ইশতেহার। ঢাকা: প্রচার কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০১৪). জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ এর নির্বাচনী ইশতেহার। ঢাকা: প্রচার কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

BAQEE, A. (1998). Peopling in the Land of Allah Jane Power, Peopling and Environment: The Case of Char-lands Bangladesh. Dhaka: The University Press Limited.

BARKAT, A. (2003). Rights to Development and Human Development: Concepts and Status in Bangladesh. In Dr. Hameeda Hossain (Ed.) Dhaka: Human Rights in Bangladesh, Ain-o-Shalish Kendra.

BARKAT, A. (2004a). Land and Agrarian Reforms: An Inescapable Hurdle, presented as keynote paper on the occasion of Land Rights Day, Dhaka 9 June, 2004.

BARKAT, A. (2004b). Poverty and Access to Land in South Asia: Bangladesh Country Study. UK: University of Greenwich, Natural Resources Institute.

BARKAT, A. (2005a). Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh. Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm. March 2005. Sweden: Sida and FÖreningen for SUS.

BARKAT, A. (2005b). Criminalization of Politics in Bangladesh. Lund University. 15 March. Sweden: Lund University.

BARKAT, A. (2005c). Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth. South Asia Conference on Social and Religious Fragmentation and Economic Development. Cornell University. 15-16 October. Cornell University: South Asia Conference on Social and Religious Fragmentation and Economic Development.

BARKAT, A. (2005d). Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh. Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm. March 2005. Sweden: Sida and FÖreningen for SUS.

BARKAT, A. (2006). "Economics of Fundamentalism and Growth of Political Islam in Bangladesh". no 23 (2), Dhaka: Social Science Review.

BARKAT, A. (2007a). Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the Basis of 30 Case Studies. In: Berger, Maurits. S. & Barkat, A.(ed.) Radical Islam and Development Aid in Bangladesh. The Hague: Netherlands Institute for International Relations.

BARKAT, A. (2007b). "Political Economy of Religious Fundamentalism: The Case of Bangladesh. Department of Economics and International Development". 26 October. UK: University of Bath.

BARKAT, A. (2011a). "Political Economy of Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with the Vested Property Act". In A. DASGUPTA, M. TOGAWA and A. BARKAT (Eds.) Minorities and the State: Changing Social and Political Landscape of Bengal, chap. 5. pp. 91-118. New Delhi: SAGE Publishers India Pvt. Ltd and Japanese Association for South Asian Studies (JASAS).

BARKAT, A. (2011b). Land Reform Monitoring Report: Bangladesh. A report prepared for ANGOC & ALRD. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

BARKAT, A. (2012). "Minorities and Human Rights: Democracy Matters. Bangladesh-India Friendship Society". Dhaka. October 2012. Dhaka: Bangladesh-India Friendship Society.

BARKAT, A. (2014a). "Political Economy of Indigenous Peoples in Bangladesh". In S. ZAMAN (Ed.) Survival or Extinction? Adivasi Rights in Bangladesh. Chap. 1. pp. 6-79. Bangladesh, Dhaka: National Human Rights Commission (JAMAKON).

BARKAT, A. (2014b). "A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Property Act and Vested Property Act". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 30, no. 1, pp. 1-62.

BARKAT, A. (2014c). "Land Reform Monitoring Report 2013: Bangladesh". Prepared for ANGOC and ALRD Bangladesh. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BARKAT, A. (2015a). "Development Trends of Bangladesh Economy and Society, and Lessons from Japan’s Development: A Non-Traditional View". Presented at a Seminar organized by Japan Foundation, Japan, Tokyo: 07 October, 2015.

BARKAT, A. (2015b). "Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh". Presented at the 19th Biennial Conference of the Bangladesh Economic Association, 8-10 January 2015, Dhaka: Bangaldesh Economic Association.

BARKAT, A. (2015c). "A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A probabile global catastrophe with reference to Bangladesh". Lead Speaker’s Paper presented at The International Institution for Strategic Studies (IISS), London: 9 September 2015.

BARKAT, A. (2016). Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh. Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.

BARKAT, A. and P. K. ROY. (2004). *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage*. Dhaka: Association for Land Reform and Development and Nijera Kori.

BARKAT, A. and S. AKHTER (2001). "A Mushrooming Population: The Threat of Slumization Instead of Urbanization in Bangladesh". Harvard Asia Pacific Review. 5(1). P. 27-30.

BARKAT, A. and S. HUDA (1988). “Politico-Economic Essence of Ethnic Conflicts in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh”. *Social Science Review*, vol 5. no 2, December 1988, The Dhaka university studies, Part-D. University of Dhaka.

বারকাত, আবুল এবং শফিক উজ জামান (১৯৯৮). "বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব: একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, খণ্ড (একত্রে প্রকাশ) ৫৬, ৫৭, ৫৮, অক্টোবর ১৯৯৬-জুন ১৯৯৭।

বারকাত, আবুল., শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (২০০৬). *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার।* পাঠক সমাবেশ: ঢাকা।

BARKAT, A. and SAFIQUE UZ ZAMAN (1998a). "Impact of Vested Property Act on Minorities in Bangladesh: A Human Right Perspective". In Regional Consultative Meeting on the Minorities. Kathmandu. August 1998. Nepal: South Asian Forum for Human Rights and Odhikar.

BARKAT, A. and SAFIQUE UZ ZAMAN (1998b). "Vested Property Act: Political and Economic Consequences. Political, Economic and Legal Aspects of the Vested Property Act". Report. Poverty Alleviation Research Program, Grameen Trust, Grameen Bank. November 1998. Dhaka: Poverty Alleviation Research Program.

BARKAT, A. et al. (1997a). Political Economy of Vested Property Act in Rural Bangladesh. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BARKAT, A. et al. (1997b). Vested Property Act: Towards a Feasible Solution. Report. Dhaka: PRIP Trust.

BARKAT, A. et al. (2000). An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act, Framework for a Realistic Solution. Dhaka: PRIP Trust.

BARKAT, A. et al. (2008a). Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property. Dhaka: Pathak Shamabesh.

BARKAT, A. et al. (2008b). Development as Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh. Dhaka: Pathak Shamabesh.

BARKAT, A. et al. (2008c). Women's Ownership of and Access to Land and Land-related Interests: Perspective from Agrarian-Land-Aquarian Reform in Bangladesh. A paper presented at "South Asian Workshop on Access to Land, Water and Forest Resources of the Poor, Women and Indigenous People: Towards an Action Agenda"; Organized by Association for Land Reform and Development, ALRD. Dhaka: 29 June, 2008.

বারকাত, আবুল., শফিক উজ জামান ও সেলিম রায়হান (২০০৯ক). *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি ও জলায় দরিদ্রের অধিকার।* দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

BARKAT, A. et al. (2009b). Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Abidashis in the Plain Districts of Bangladesh. Dhaka: Pathak Shamabesh.

BARKAT, A. et al. (2009c). Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts. Report. Dhaka: UNDP and Human Development Research Centre (HDRC).

বারকাত, আবুল (২০১০ক). "বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: উন্নয়নের দিগন্ত"। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৭-৮১৭। এপ্রিল ২০১০। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

BARKAT, A. et al. (2010b). Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Report. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Royal Danish Embassy.

BARKAT, A. et al. (2014a). Land Laws in Bangladesh: A Right-based Analysis and Suggested Changes (in 22 Vol), Dhaka: Human Development Research Centre & Manusher Jonno.

BARKAT, A. et al. (2014b). Assessing Inheritance Law and their Impact on Rural Women in Bangladesh. Dhaka: International Land Coalition.

BARKAT, A. et al. (2015). Study on Rural Land Market in Bangladesh and Drafting of Policies on Possible Methods for Equitable Inclusion of Poor, Marginalized and Women into the Market. Dhaka: Manusher Jonno Foundation.

BARKAT, A., A. Al. HUSSAIN, and M. I. HOSSAIN (2011). "Mismatch of Minority Population in Bangladesh: Population Census vis-à-vis National Voter List". Bangladesh Journal of Political Economy, vol. 27, no. 1 and 2, pp. 9-28.

BARKAT, A., and P.K. ROY (2003). Bangladesh: Community-based Property Rights and Human Rights – An Overview of resources, and legal and policy developments, in Isabel de la Torre and David Barnhize, eds., The Blues of a Revolution: The Damaging Impacts of Shrimp Farming, published by ISA Net and APEX, USA.

BARKAT, A., P.K. ROY, and M.S. KHAN. (2007). Charland in Bangladesh-Political Economy of Ignored Resource. Dhaka: Pathak Shamabesh, SAMATA and HDRC.

BARKAT, A., S. ZAMAN, A. RAHMAN and A. PODDAR. (1996). Impact of Vested Property Act on Rural Bangladesh: An Exploratory Study. Report. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BARKAT, A., S. ZAMAN, and S. RAIHAN (2000a). Khas Land: A Study on Existing Law and Practices, Programme for Research on Poverty Alleviation. Dhaka: Grammen Trust, Grammen Bank.

BARKAT, A., S. ZAMAN, and S. RAIHAN (2000b). Distribution and Retention of Khas Land in Bangladesh. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BARKAT, A., S. ZAMAN, and S. RAIHAN (2001). Political Economy of Khas Land in Bangladesh. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BARKAT, A., G.M. SUHRAWARDY and A. OSMAN. (2015). Increasing Commercialization of Agriculture Land and Contract Farming in Bangladesh, Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BARKAT, A., G.M. SUHRAWARDY and P.S. GHOSH. (2011). Commercialization of Agricultural Land and Water bodies and Disempowerment of the Poor in Bangladesh: An Exploratory Study. Dhaka: Association for Land Reform and Development.

BASU, KAOSIK (2000). A Prelude to Political Economy. Oxford: Oxford University Press.

BELL, DANIEL (1960). The End of Idelogy: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. New York: The Free Press.

চৌধুরী, এম. আর. (সম্পাদিত), (১৯৯৮). "কলঙ্ক মোচনের লড়াই: অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের সামাজিক সংগ্রাম দু-বছরের অভিজ্ঞতা"। ঢাকা: এএলআরডি।

চাকমা, অ্যাড. জ্ঞানেন্দু বিকাশ এবং অ্যাড. প্রতিম এবং সুগত চাকমা (সম্পাদিত), (২০১২) "পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন"। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন।

CAPRA, FRITJOF (1988). The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. New York: Bantam Books.

CHANG, HA-JOON (2003). Globalization, Economic Development and the Role of the State. London and New York: Zed Books and Third World Network.

CHANG, HA-JOON (2008). Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. New York: Bloomsbury Press.

CHANG, HA-JOON and GRABEL, ILENE. (2005). Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual. London: Zed Books Ltd.

CHARLES G. and C. RIST. (1948). A History of Economic Doctrine (2nd ed.). London: George G. Harrap & Co Ltd.

CHOMSKY, N. (2003). Imperial Ambitions: Conversations with Noam Chomsky on the Post – 9/11 World. N.Y: Penguin Books.

CHOWDHURY, A. M., A. HAKIM, and S.A. RASHID. (1997). "Historical Overview of the Land System in Bangladesh". Land. vol. 3, no. 3. Philippines, Manila: Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development

CHOWDHURY, P. B. (1993). Enemy (Vested) Property Ordinance: A Tyranny to the Minorities of Bangladesh (Communal Discrimination in Bangladesh: Facts and Documents). Dhaka: Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council.

দে, ডি. (১৯৯৯). *শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু।* বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম: শৈলী পাবলিশার্স।

দেবনাথ, এন. সি. (২০০০). *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা।* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

দৈনিক যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর, ২০০৭।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর, ২০০৭।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ মে, ২০১৬।

DANDEKAR, V.M. and N.K. RATH (1971). “Poverty in India, Policies and Programme”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 6, No. 1.

DALE, P., R. MAHONEY, and R. MCLAREN. (2007). Land Markets and the Modern Economy.UK: RICS.

DAVIES, PAMELA O. (n.d.). Marriage, Divorce, and Inheritance Laws in Sierra Leone and Their Discriminatory Effects on Women. Available at https://www.wcl.american.edu/hrbrief/12/3davies.pdf [Accessed 22 Feb. 2016]

DEANE, PHYLLIS (1989). *The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.

DEANE, PHYLLIS. (1978). *The Evolution of Economic Ideas*. UK: Cambridge University Press.

DESAI, SUNDERLAL T. (1994). *Mulla Principles of Hindu Law* (6th ed.). India, Mumbai: N.M. Tripathi Private Limited.

DHAMIJA, D. R. (1994). *Registration Act* (3rd ed.). India, Allahabad: The Law Book Company (p) Ltd.

ELAHI, K.M. and J.R. ROGGE. (Eds.), (1990). Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh, Riverbank Erosion Impact Study. Dhaka: Jahangirnagar University.

FAALAND, J. and J.R. PARKINSON. (1977). Bangladesh: The Test Case of Development. India, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (2002a). Gender and Access to Land. Land Tenure Studies 4. Rome: FAO

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (2002b). Land Tenure and Rural Development. Land Tenure Studies 4. Rome: FAO.

FUSFELD, DANIEL R. (1982). The Age of the Economist. Scott, Foresman and Company.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৪), The Land Reforms Ordinance 1984, (Ordinance No. X of 1994), 26th February 1984, (during Autocreation Military Rule in 1984).

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫), অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা। ভূমি মন্ত্রণালয়: বিজ্ঞপ্তি ৭ই মার্চ ১৯৯৫; নং ভূম:/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৫-অকৃষি খাসজমি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১). *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (সর্বশেষ সংশোধনিসহ মুদ্রিত অক্টোবর ২০১১), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৪). *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অণুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

গাইন, ফিলিপ (২০০৮) *অনুসন্ধানী রিপোর্ট: পরিবেশ ও মানবাধিকার*। ঢাকা: সেড।

GAIN, P., et al. (1998). *Bangladesh: Land, Forest and Forest People*. Dhaka: Society for Environment and Human Development.

GANI, A. B. M. O. (1997). *The Problems of the Charlands and Probable Solutions*. Dhaka: Social Institute.

GHATAK, M. and S. ROY (2007). "Land Reform and Agricultural Productivity in India: A Review of Evidence". Oxford Review of Economic Policy, vol. 23, Issue 2. pp. 257-269. Oxford: OUP.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (1973). The First Five Year Plan 1973-78. Planning Commission.

GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (1989). Land Reforms in Bangladesh. Dhaka: Ministry of land.

GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (1999). Census of Agriculture 1996, National Series, Volume 1, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (2003). Land Administration Manual. vol.1&2. Dhaka: Ministry of Land, Government of the People's Republic of Bangladesh.

GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (2011). Sixth Five Year Plan FY2011- FY 2015 Accelerating Growth and Reducing Poverty Part 2 Sectoral Strategies, Programs and Policies. Dhaka: Ministry of Planning.

GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (2012). Population and Housing Census 2011, Socio-Economic and Demograpic Report, National Service, Volume 4.

GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH (2013). Bangladesh Economic Review 2013. Dhaka: Economic Advisor's Wing, Finance Division, Ministry of Finance.

GRIFFIN, K., A.R. KHAN, and A. ICKOWITZ. (2002). "Poverty and the Distribution of Land". In RamchandranV.K. and Swaminathan, M. (Eds). Agrarian Studies-Essays on Agrarian Relations in Less Developed Countries. India, Chennai: Tulika.

HANSTAD, TIM., and JENNIFER BROWN. (2001). Land Reform Law and Implementation in West Bengal: Lessons and Recommendations. Seattle, Wash.: Rural Development Institute, United States

HARVEY, D. (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

HARVEY, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University

HARVEY, D. (2006). Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso.

HARVEY, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism.Oxford: Oxford University Press.

HARVEY, D. (2009). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009. The Hague: Institute of Social Studies.

HASSAN, N. et al. (2013). Trends in the availability of agricultural land in Bangladesh. Dhaka: NFPCSP, FAO-UNO.

HOSSAIN, M. and BAYES, A. (2009). Rural Economy and Livelihoods: Insights from Bangladesh. Dhaka: A H Development Publishing House.

HOSSAIN, T. (1995). Land Rights in Bangladesh: Problems of Management. Dhaka: The University Press Limited.

HUME, D. (1894). An Enquiry Concerning the Human Understanding. Oxford: Clarendon Press.

HUME, D. (1961). A Treatise of Human Nature. Garden City, New York.: Doubleday.

JANNUZI, F.T. and J.T. PEACH (1979). “Note on Land Reform in Bangldesh: The Efficacy of Ceilings”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 6. No. 3, April.

JANNUZI, F.T. and J.T. PEACH. (1990). "Bangladesh: A Strategy for Agrarian Reform". In Prosterman, R. L., Temple, M. N. and Hanstad, T. M. (Eds). Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies. USA: Lynne Rienner Publishers, Inc.

JINNAH, SHAH I MOBIN (2013). Land and Property Rights of Rural Women in Bangladesh. Bangladesh, Dinajpur: Community Development Association (CDA).

KOZUL-WRIGHT, and RAYMENT, P. (2007). The Resistible Rise of Market Fandamentalism: Rethinking Development Policy in an Unbalanced World. London: Zed Books and Third World Network.

KRUGMAN, PAUL (2013). End this Depression Now. New York: W.W. Norton & Company Ltd.

KUAN, L. Y. (2000). From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000. Marshall Cavendish Editions.

মন্ডল, এম. এ. সাত্তার. (২০১২). “বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর: সম্ভাবনার শেষ নেই”। অধ্যাপক ড. আখলাকুর রহমান স্মারক বক্তৃতা, ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১২, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

মাসুদ, এ. আর. (২০১০) *ভূমি আইন।* বাংলাবাজার, ঢাকা: কামরুল বুক হাউস।

MANDEVILLE, BERNARD (1733). The Fable of the Bees. London: J. Roberts.

MARX, KARL. “Economic Manuscripts of 1857-59” in Pre-Capitalistic Socio-Economic Formations, Moscow: Progress Publications, 1979.

MAZZUCATO, MARIANA (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthen Press.

MINHAS, B.S. (1974). Planning and the Poor, Delhi: S. Chord & Co.

MUKHERJEE, R. (1933). Land Problem of India. India, Calcutta: University of Calcutta.

NSEMIWE, NSAME (2006). Gender Dimensions of Land Customary Inheritance under Customary Tenure in Zambia. This paper is based on the paper presented at the XXIII FIG Congress in Munich, Germany, 8-13 October 2006.

ORWELL, G. (1949). Nineteen Eight-Four. London: Secker and Warburg.

PIKETTY, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. (Goldhammer, A. Trans.). Harvard: The Belknap Press of Harvard University.

QUASEM, M. A. (2011). "Conversion of Agricultural Land to Non-agricultural Uses in Bangladesh: Extent and Determinants". Bangladesh Development Studies. vol. XXXIV, March 2011, no.1. Dhaka: BIDS.

RAIHAN, S., S. FATEHIN, and I. HAQUE. (2009). Access to Land and Other Natural Resources by the Rural poor: The Case of Bangladesh. Dhaka: SANEM.

RAKSHIT, M. K. (1979). The Law of Vested Properties in Bangladesh (1st ed.). Chittagong: Mrinal Kanti Rakshit.

RAKSHIT, SREE MRIDULKANTI (2008). The Principles of Hindu Law. Bangladesh, Dhaka: Kamrul Book House.

RODRIK, DANI (2011). The Globalization Paradox. Oxford: Oxford University Press.

ROLL, ERIC (1956). A History of Economic Thought.Third edition. NJ: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

ROUSSEAU, J. JACQUES (1755). Discourse on Inequality (প্রকাশনার স্থান ও সন স্পষ্ট নয়)।

ROY, RAJA DEVASISH et al. (2000). The Chittagong Hill Tracts Life and Nature at Risk. Bangladesh, Dhaka: Society for Environment and Human Development (SEHD).

সরকার, বিবেকানন্দ (২০১০). *ভূমি জরিপ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন এবং বিধিমালা।* বাংলাবাজার, ঢাকা: বাংলাদেশ ল বুক কোম্পানী।

SACHS, J. (2012). The Price of Civilization: Reawekening Virture and Prosperity after the Economic Fall. London: Vintage Books.

SAHA, B.K. (2007). Land Reform and Peasant Movements in Bangladesh. A Thematic Paper for the SACEPS Task Force on Poverty Eradiction (February 2007).

SAMUELSON, PAUL. and W. BARNETT. (2007). Inside the Economist's Mind. Malden, MA: Blackwell Pub.

SARGENT, THOMAS J. and N. WALLANCE. (1976) "Rational Expectations and the Theory of Economic Policy". Journal of Monetary Economics 2 (1976). 169-183. [online]. Available at Amsterdam: North-Holland Publishing Company. http://ecfor.ru/books/Rational_expectations_and_the_theory_of_economic_policy.pdf [Accessed 22 Feb. 2016].

SEN, AMARTYA K. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A Knopf, Random House, Inc.

SEN, R. L. (1994). Impact of Enemy (Vested) Property Laws on Bangladesh. In National Seminar on Enemy (Vested) Property Act. Dhaka: Samprodaik Samprity Parishad.

SHERGILL, H. S. (1986). Land Sales and Land Prices in Punjab: 1952-53 to 1978-79. Economic and Political Weekly. vol. xxi, pp. 38-39.

SHUKRANA, UZMA (n.d.). Justification of reform of Hindu Inheritance law: Bangladesh Perspective. Thailand, Bangkok: International Conference on International Relations and Development (ICIRD).

SIDDIQUE, K. (1997). Land Management in South Asia: A Comparative Study. Dhaka: The University Press Limited.

SKIDELSKY, ROBERT (2010). Keynes: The Returns of the Master. Penguin Books.

SMITH, ADAM (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (The Wealth of Nations), London: J.M. Dent & Sons; New York: E. P. Dutton.

SOBHAN, K. M. (1994). A Peep into Enemy (Vested) Property Act. In National Seminar on Enemy (Vested) Property Act. Dhaka.

STIGLITZ, JOSEPH E. (2006). Making Globalization Work. London and New York: W.W. Norton and Co.

STIGLITZ, JOSEPH E. (2013). The Price of Inequality.New York: Penguin Books.

STIGLIZ, JOSEPH. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: Allen Lane, The Penguin Press.

SWAPAN ADNAN (2004). Migration, Land and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

TALEB, NICHOLAS, N. (2010). The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. Penguin Books.

TOUFIQUE, K. A. and TURTON, C. (2002). Hands Not Land: How Livelihoods are changing in Rural Bangladesh. Dhaka: BIDS and DFID.

UNITED NATIONS. (2002). United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues.

WALLACE, T. (2013). Property Rights and Women's Economic Participation in Bangladesh, Accessed on:http://www.cipe.org/blog/2013. 23rd June, 2014.

WILLIAMSON, JOHN (1990). "What Washington Means by Policy Reform", In John Williamson (ed.) Latin American Adjustment: How much Has Happened? Washington, DC: Institute for International Economics.

WORLD BANK (2002). Poverty in Bangladesh: Building on progress. Washington, DC: Author (Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit, South Asia Region).

WORLD BANK (2008). World Development Report 2008– Agriculture For Development. Washington DC.

WORLD BANK (2016a). Rural population (% of total population). [online]. Available at http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS [Accessed 7 Feb. 2016].

WORLD BANK (2016b). Dynamics of Rural Growth in Bangladesh: Sustaining Povrty Reduction, Washington, D.C: World Bank Group.

YUSUF, A. (Eds.) (2011). Agriculture of Bangladesh– Capitalistic or Semi-Feudalistic (In Bangla). Dhaka: Pathok Shamabesh.

ZAMAN, M. Q. (1987). Endemic Land Conflict and Violence in Char Villages of Bangladesh. Dhaka: Jahangirnagar University.

নির্ঘণ্ট

অ

অর্থ খাজনা
অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সহচর
ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৫ কোটি ৯০ লাখ মানুষ
অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্মুভোবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স
অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য
অ-স্বাধীনতার সকল উৎস
অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী
অনুন্নয়নের এ-আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নের মানবিকীকরণ
অনুপার্জিত আয়কারী
অশুভ আঁতাত
অকৃষি-জমি
অসৎ রাজনীতিবিদ
অসাম্প্রদায়িক
অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র
অসাম্প্রদায়িকতা-জাতীয়তাবাদ-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র
অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রাম
অধিকার সচেতন
অধিকার হরণের মাধ্যম
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন
অর্পিত জমি-সম্পত্তি (ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়)
"অপারেশন বর্গা"

আ

আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য
আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিবর্তন
আর্থ-সামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতা
আয়ের দারিদ্র্য
আইন-কানুন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে অভিগম্যতার অভাব
আপদকালীন ধার
আফজালুল বাসার
আবাসনের দারিদ্র্য
আবুল বারকাত
আব্দুল কাদের
আম জনতা
আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
আয় ও সম্পদ বণ্টন
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
আদিবাসী

আদিবাসী নারী
আদিবাসী নারীর উত্তরাধিকার
আদিবাসী মানুষের জমি ও বন দখলে বিভিন্ন রূপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড
আদিবাসী মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট মানুষ
আদিবাসী মানুষ সরল
আদিবাসী মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন
আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি-জলার মালিকানা এবং অভিগম্যতা সংশ্লিষ্ট বাঁধাসমূহ
আদিবাসীদের ভূমি আইন
ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু গোষ্ঠী
আনিসুর রহমান
আরিফ মিয়া
আত্মসাৎকারী

ই

ইকোপার্ক
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
ইউপি চেয়ারম্যান
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী
“ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান”

উ

উচ্ছেদ আতঙ্কে বসবাস
উপেন্দ্রনাথ রায়
উন্নয়নে ইনপুট সরবরাহ
উন্নয়নের সাংবিধানিক মর্মার্থ
উন্নয়ন অংশীদারিত্ব
উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক-বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে অন্তর্ভুক্তি
উন্নয়ন-এ অংশীদারিত্বের প্রশ্নে
উপযোগমূল্য
উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ
উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি অবকাঠামোর বিলুপ্তি
উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতি
উত্তরাধিকার আইন
উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদ-সম্পত্তিতে
উত্তরাধিকার-বঞ্চনা
উষ্ণ হৃদয় সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব
উৎপাদনে শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি
উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি
উৎপাদন সম্পর্ক
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুক্তি
উৎপাদিকা শক্তি

ঋ

অভিবাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতি
মাত্রাতিরিক্ত লবণের উপস্থিতি ফলন-বৃদ্ধি চক্রের উপর মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব
বিপন্নতার ঋণাত্মক অভিঘাত
চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য
দরিদ্র ভাগচাষি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগঠিত উৎসের ঋণ নিতে অক্ষম
ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধার প্রসার

এ

একজন অদরিদ্রের দারিদ্র চিন্তা
অনবায়নযোগ্য সম্পদ বিনষ্ট
এম মইনুল ইসলাম
এইচডিআরসি
এনজিও
এসি ল্যাণ্ড
এসি ল্যাণ্ড অফিসের কর্মকর্তাগণ
এসিসট্যান্ট কমিশনার (ভূমি)
এডাম স্মিথ
এডিসি রেভিনিউ

ঐ

ঐতিহ্যগত অধিকার
ঐতিহ্যগত-প্রথাগত মালিকানা

ও

ওরাও
ওয়াক্‌ফ

ঔ

ঔষধি গাছ-গাছলার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে

ক

কবুলিয়ত
কাগুজে স্বীকৃতি আর বাস্তবে ফারাক
কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ
কার্টেজিয়
কার্টেজিয় প্যারাডাইম
কানুনগো
কার্যত ভূমিহীন
কোনো 'অর্থনীতিবিদই'– শ্রেণি নিরপেক্ষ সত্তা নন
ক্রমবর্ধমান বৈষম্য
ক্রমবর্ধমান বহিঃস্থকরণ-প্রান্তিকতা

ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা
ক্রমবর্ধমান কালো টাকার কারণেই শহরে জমির দাম-অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে
ক্রয়-বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও দানসূত্রে পাওয়া জমি
কৃষকের অধিকার
কৃষক সংগঠন
কৃষি শুমারী
খাঁটি বর্গাচাষি খামার
কৃষি দিন মজুরের তুলনীয় অবস্থার অবনতি
কৃষিতে নারী-শ্রমের স্বীকৃতি
কৃষি-ভূমি-জলা উত্থিত দারিদ্র-বঞ্চনা পুনরুৎপাদন
কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সাথে নগরায়নের সম্পর্ক
কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার চলমান আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়

খ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি
খাদ্য-বঞ্চনা
খাস কৃষি জমির শ্রেণি পরিবর্তন
খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের জন্য আশীর্বাদ না-কি অভিশাপ
খাস জমি অন্যের দ্বারা অবৈধভাবে দখল
খাস জমি বিতরণে অনিয়ম
খাস জমিতে অভিগম্যতাহীনতা
খাস জমির অপ্রতুলতা
খাস জমির উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার
খাস জমির বণ্টন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে ঘুষ
খাগড়াছড়ি
খাজনা
খোরাকি ধার
খাঁটি- বর্গাচাষির চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি
খাঁটি মালিক-চাষ কমছে
খাঁটি-বর্গাচাষ বাড়ছে
খুশি কবির
খিয়াং

গ

গণমুখী গ্রামীণ সমবায়
গণদারিদ্র্য
গ্রাম থেকে শহরে "গলাধাক্কা অভিবাসন"
গলাধাক্কা অভিবাসন
গলাচিপা
গোলকায়ন
গোষ্ঠীগত অধিকার
গ্রাম্য টাউট
গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও কর্মহীনতার ফল

গারো
"গুড ব্রাদার"
"গুড সিস্টার"
'গণমুখী সমবায়'

ঘ
ঘনীভবন
ঘুষ

ঙ
জ্ঞানতত্ত্বীয়
জ্ঞান সাধনা
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত মানুষ
জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার
"সর্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার"
দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব বিনির্মাণ

চ
চরের মানুষ
চরের জমি-জলা
চর জব্বার
চরম দরিদ্র
চড়া সুদে ঋণ
চাক
চেতনায়নের নির্দেশক
চিংড়ি চাষজনিত প্রান্তিকতা
চিংড়িমহাল
চিহ্নিত খাস জমি
"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত"

ছ
ছিটেফোঁটা সংস্কার দিয়ে হবে না

জ
জন্মগত, প্রথাগত ও ঐতিহাসিক অধিকার
জনগণের ভূমি-অধিকার
জবরদখল
জবাবদিহিতামূলক আইনি-কাঠামো
জল-সম্পদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস
জল-জলায় আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার
জলা সম্পদে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকারহীনতা
জলাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ

জাতিগত উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া
জাতীয় আয়ে নারীর প্রকৃত অবদান
জমি ও জলা এদেশের মূল ও মৌলিক সম্পদ
জমি-দস্যুর শক্তিশালী এক বলয়
জমিদারী আমল
জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাসের ফলে ফলন
জমি-সম্পত্তিতে নারীদের অধিকারহীনতা
জমি-জমায় নারীর অধিকার
জমি-জলার প্রকৃত উৎপাদিকা হ্রাস
জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার
জমি-জলায় বিভিন্ন ধরনের অন্যায্য ভোগদখল স্বত্ব
জমি-জলা-জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের জন্মগত অধিকার
জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট
জীবন-সমৃদ্ধি
জুম
জোসেফ স্টিগলিজ
জোর করে ফসল দখল
জোরপূর্বক দেশচ্যুতি
জোরপূর্বক দেশান্তর
জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি
জোতদাররা
জিডিপি-তে নারীর অবদান
জিডিপি-তে পুরুষের অবদান
জিডিপি-র সাথে 'ভালবাসার অর্থনীতির' আর্থিক মূল্য
জ্য-জ্যাক রুশো
"জনসংখ্যা স্থানান্তর"
"জাল যার জলা তার"
"জাতীয় ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি"

ট

টেন্যুরিয়েল সিস্টেম
টেকসই কৃষি
ট্রাস্ট
টাঙ্গাইল

ড

ডালু
"ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং"

ঢ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে জমি-জলা দস্যুতা
ঢাকা শহরের প্রায় ৪০০০-এর উপরে বস্তির নাম এখন ব্যক্তির নামে

ত

তহশিল অফিস
তহশিলদার
তহসিল অফিসের কাগজ
তালিকায়ন প্রক্রিয়া
তুলনামূলক সুবিধা

থ

নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন
"বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ"
"থুসোডাইডেস নীতি"

দ

দ্রব্য খাজনা
দাস সত্তা
দারিদ্র্য
দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন: নি:স্বায়ন থেকে ভিক্ষুকায়ন
দারিদ্র্য-উদ্ভূত বঞ্চনা
দরিদ্র
দরিদ্র নারী দ্বিগুণ বঞ্চিত
দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যা
দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার
দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি-জলা বণ্টন
দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
দরিদ্র-বান্ধব
দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির পথরেখা
দরিদ্র-বঞ্চিত-দুদর্শাগ্রস্থ মানুষ
দুর্নীতি
দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থ মূল্য
দুর্বৃত্তদের স্বার্থরক্ষা
দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ
দুর্বৃত্তায়ন-চক্র
দুশ্চিন্তা-উদ্ভূত রোগ বৃদ্ধি
দেবোত্তর সম্পত্তি
দেশজ জ্ঞানতত্ত্ব
দেকার্তে
"দায়ভাগ আইন"

ধ

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী মন-মনন-মানসিকতা
ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা

ধর্মীয় উগ্রতা
ধনিক শ্রেণি
ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের
ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতি

-ন

নগরায়ন
নগরায়ন নয় বস্তিয়ায়ন
নগর-জীবনের গ্রামায়ন
নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয়
নব্যচোরা গ্রুপ
নব্য-উদারবাদী
নব্য-ঔপনিবেশিক সামন্ত সেনাপ্রভু
নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন
নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা
নামজারি বা জমা-খারিজ
নারী প্রধান খানায়
নারীদের প্রতি সহিংস আচরণ
নারীর ক্ষমতায়নে বাধা
নারীর ক্ষমতায়ন
নারীরা বহিঃস্থই ছিলেন বহিঃস্থই আছেন
নারীরা পিছিয়ে আছেন
নারীর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস
নারীবিরোধী ভূ-সম্পত্তির মালিকানা আইন/উত্তরাধিকার আইন
নাগরিক সমাজ সংগঠন
ন্যায্য অধিকার
ন্যায় বিচারিক যুক্তি
ন্যায় অধিকার
নৃগোষ্ঠী
নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ
নিম্নমধ্যবিত্ত
নির্বাচনী ইশতেহার
নিরঙ্কুশ দরিদ্র
নিরঙ্কুশ বা সম্পূর্ণ ভূমিহীন
নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট-বঞ্চনা
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য
নিয়মিত ধার
নিঃস্ব মানুষ
"নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা"
"নিরন্তর বঞ্চনা-বৈষম্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি"
"নারী-পুরুষের সম-সুযোগের অধিকার"
"নারী-পুরুষের সমানাধিকার"

"নারীর অধিকার"
নৈতিক যুক্তি

প

পরচা বা নকশা
পরজীবী শ্রেণি
পানখুয়া
পার্বত্য চট্টগ্রাম
পাত্র
পরিত্যক্ত সম্পত্তি
পাহান
পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতি
পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য
পরিবেশ-বান্ধব কৃষি
পরিত্যক্ত ও প্রান্তীয় জমি
পৈতৃক-উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি
পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা-উদ্ভূত
পিতৃতান্ত্রিক সামন্তমানসিকতার সমাজ
পূর্ববঙ্গ অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন
প্রকৃত উন্নয়ন মানে শুধু মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি নয়
প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা
প্রথাগত অধিকার
প্রযুক্তি
প্রযুক্তি-ব্যবহার চাহিদা
প্রকৃত জেলে
প্রকৃত অর্থের উন্নয়ন
প্রকৃত বনবাসী
প্রকৃত কৃষক
প্রগতির শক্তি
প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল
প্রজাস্বত্ব আইন
প্রান্তিকতা
প্রান্তিকতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য
পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা
পুঞ্জিভূত
পুঞ্জিভবন
পিতৃতান্ত্রিক সামন্তমানসিকতার সমাজ
"পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন"
"পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত-বাজারকে কাজ করতে দাও",
"প্রকৃতি বিজ্ঞান"
"পার্সোনাল ল"
"পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং"

ফ

ফটকা-ব্যবসা
ফটকাবাজ গোষ্ঠী
ফাও-খাওয়া শ্রেণি
ফ্রিটজফ কাপ্‌রা
"ফিউডাল ব্যবস্থা"

ব

বম
বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল
বর্গা প্রথা সামন্তবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ
বর্গাদার
বর্গাচাষি-মালিক খামারের চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
বর্গাচাষি-মালিক খামার বৃদ্ধি পেয়েছে
বন্ধক
বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণ প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করা
বঞ্চনার প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে
বঞ্চনার ফাঁদ ভেঙে ফেলা
বণ্টন প্রক্রিয়া
বণ্টনযোগ্য পরিমাণ ভূমি-জলা
বহুজাতিক কর্পোরেশন-এর তামাক চাষে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বলপূর্বক অভিবাসন
বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য
বিদ্যুৎ মানে আলোকিত মানুষ গড়ার মাধ্যম
বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী
বিশ্ব ব্যাংক
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
বিশ্বায়ন
বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল
বিকৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি
বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি-পশু-পাখিসহ জীববৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে
ব্যাপক দরিদ্র-বঞ্চিত-দুদর্শাগ্রস্থ মানুষের প্রতি সম্মান
ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন
বন্দোবস্ত পাওয়া জমির
বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ও অভিঘাত
বাস্তুচ্যুতি
বালুমহাল
বাসস্থান-বঞ্চনা
বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা
বায়ারচর
বাৎসরিক চুক্তির আর্থিক মূল্যমান
বাজার অর্থনীতিতে এক দুষ্টচক্র কাজ করে চলেছে

বাজার অন্ধত্ব
মাছ বাজারজাতকরণ এক জটিল প্রক্রিয়া
সংবিধান
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বাংলাদেশ একক জাতি সত্তার রাষ্ট্র নয়
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ হবে এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র
বাদি ও বিবাদি
বাহ্যিকতা
বাণিজ্যিক চাষাবাদ
বস্তিয়ায়ন
বহির্ভুক্তকরণ
বৈষম্য বৃদ্ধির রূপ
বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান
বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতি
বৈষম্যহ্রাসকারী সাংবিধানিক যুক্তি
বৈষম্যহীন অর্থনীতি
বৈশ্বিক পুঁজিবাদের আধিপত্যে
"বৈষম্যদূরীকরণে কৃষি বিপ্লব"
"বৈরী অন্তর্ভুক্তিকরণ"
"বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫
"বাজে অর্থনীতি"
"বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি
"বাণিজ্য করো আরো বাণিজ্য করো - বাণিজ্যে বেসাতি"
"বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ"
"বিশ্বায়নের সুযোগ নিলে এগিয়ে যাবে আর না নিতে পারলে বিপদে পড়বে"
"বিশ্বায়নই সর্বরোগের দাওয়াই-নিরামক"
"বিপ্রতীপ বর্গা"

ভ

ভূমি রেজিস্ট্রেশন
ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি
ভূমি অধিকার আন্দোলনের সফলতার কাহিনী
ভূমি অফিসের বহুমাত্রিক দুর্নীতি
ভূমি প্রশাসনে অভিগম্যতার অভাব
ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা
ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-দুর্নীতি
ভূমি মামলার দীর্ঘসূত্রিতা
ভূমি মামলায় পুলিশ দুপক্ষের কাছেই ঘুষ খাচ্ছে
ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়
ভূমি সংস্কার পরিদর্শক (এলআরআই)
ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ-মামলা

ভূমি জরিপে দুর্নীতি ও ঘুষ
ভূমি জরিপ
ভূমি নিয়ে বিরোধ
ভূমি-দস্যুতা, জল-দস্যুতা, বন-দস্যুতা
ভূমিকেন্দ্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি
ভূমিকেন্দ্রিক মামলা-মোকদ্দমায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়
ভূমিকেন্দ্রিক চলমান মামলা
ভূমি-উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম
ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ
ভূমির পুঞ্জিভবন
ভূমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা
ভূমিহীন
ভূমিহীন শ্রেণি
ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা
ভূমিহীনতা
ভূমিচ্যুত
ভূমি-জল-বন দস্যুতা বৃদ্ধি
ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি
ভূমি আইনের গণবিরোধী রূপ
ভূমি আইন
ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক দুর্নীতি
ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল
ভূমি মালিকানার পুঞ্জিভবন
ভঙ্গুরতা-উদ্ভূত বঞ্চনা
ভাগ প্রথায় খড়ের বিভাজন
ভাসমান মানুষ
ভাগ-চাষ
ভাগচাষ-বর্গাচাষ
ভাগচাষ-বর্গাচাষসহ জমিতে বিভিন্ন ভোগদখল স্বত্ব
ভাগচাষি যত দরিদ্র, ধার-দেনার প্রয়োজন তার তত বেশি
ভুমিহীনতা
ভোগদখলস্বত্ত্ব
"ভাগচাষি মালিক"
"ভালবাসার অর্থনীতি"
'ভ্যালু চেইনে'
"ভূমির কেন্দ্রিকতা"

ম

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
মধ্যস্বত্বভোগী
মধ্য-মধ্যবিত্ত
মধ্যবিত্ত
মহাশ্বেতা দেবী

মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি
মৎস্য খাত
মৎস্যজীবী
মৎস্যজীবীদের-সমবায়
মজুরি
মজুরির বিধি
মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক
মানব সম্পদ বিনষ্ট
মানবকল্যাণকামী উন্নয়ন
মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন
মানবাধিকার
মানস-কাঠামোর দারিদ্র্য
মানবিক উন্নয়ন
মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণ
মানুষের কল্যাণে আইন প্রণয়ন হয়নি
মানুষের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ সম্প্রসারণ
মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোনো অনড়-স্থির বিষয় নয়
মামলার ব্যয়
মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ
মাহাতো
মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ
মুক্ত ইচ্ছা
মুক্তবাজার দর্শন
মুক্তবাজার দর্শন যা দরিদ্র-বান্ধব নয়
মুক্তবাজার কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে ‘প্রান্তকে’ শোষণ করে
মুনাফার লোভে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শোষণ
মুসলিম নারী
মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার
মুসলিম উত্তরাধিকার আইন
মুক্তিযোদ্ধা
মুক্তিযুদ্ধ
মেরুকরণ
মৌলবাদের মেধাশক্তি
মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতি
মোজাম্মেল হক
মো. কবিরুজ্জামান
মো: আনিসুর রহমান
মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি
“মহাবুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতিসম”

র

রাঙ্গামাটি
রাখাইন

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
রাষ্ট্র ও সরকারের নিয়ন্ত্রনমূলক ভূমিকা
"রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী সত্তা থাকবে না"
রাজনৈতিক দারিদ্র্য
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সহচর
রাজনৈতিক স্বাধীনতা
রাজনৈতিক বিধি
রাজনৈতিক সিস্টেম বাজারের ব্যর্থতাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে
রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
রাজবাড়ি
রাজশাহী
"রেন্ট সিকিং দুর্বৃত্ত" সিস্টেমের কারণে বেড়েছে শহরে জমির দাম
'রেন্ট সিকিং'
'রেন্ট-সিকার' সিস্টেম
"রেন্ট-সিকার"
রোহিঙ্গা
রেজিস্ট্রেশন
রাজনৈতিক সদিচ্ছা
রিজার্ভ ফরেস্ট
"রাজনৈতিক পাটিগণিত"

ল

লবণ উৎপাদনের জমি
লাঠিয়াল ও সরদার গোষ্ঠী
লিজ
লুটেরা
লুসাই
"লুণ্ঠন সংস্কৃতি"

শ

শস্যের বিভাজন অনুপাত
শ্রমের ফলপ্রদতা বৃদ্ধির যুক্তি
শ্রম খাজনা
শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি
শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি
শহরের বস্তিতে
শহরায়ন
শহুরে উঠতি বুর্জোয়া
শফিক-উজ-জামান
শারীরিক-স্বাস্থ্যগত দুর্দশা-উদ্ভূত বঞ্চনা
শামসুল হুদা
শান্তি বাহিনী

শান্তি চুক্তি
শিক্ষা-বঞ্চনা
শিক্ষার দারিদ্র্য
শ্রেণি
শ্রেণিস্বার্থীয়
শ্রেণিস্বার্থীয় কৌশল
শ্রেণিকাঠামো
শ্রেণি-সম্পর্ক
শ্রেণিসংঘর্ষ
শোষণ মুক্ত ও শ্রেণি বৈষম্য
"শত্রু সম্পত্তি আইন"
"শরিয়া আইন"

স

সেটেলম্যান্ট অফিসের কাগজ
সেলিম রেজা
স্যার উইলিয়াম পেটি
সম্পদ-সম্পত্তিতে ন্যায্য হিস্যা উত্থিত ক্ষমতায়ন
সম্পদচ্যুত
সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা
সম্পত্তিতে নারীর অধিকার
সম্পত্তির অধিকার-বঞ্চনা
সম্পত্তির তুলনামূলক স্বল্প বাজার মূল্য
সচেতনায়ন
সচেতনায়ন-মধ্যস্থতাকারী ক্ষমতায়ন
সনাতনী অধিকার
সমঅধিকার
সমবায়ী
সমাজতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন
সমতলের আদিবাসী
সমতলের সাঁওতাল
সমতাবাদ
সরকার ও ক্ষমতার রাজনীতির সহচর
সরকারি ভূমি অফিসের কর্মকতা
সরকারি সাহায্য-লাভের অধিকার
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
সংস্কার স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না
সন্ত্রাস আর ত্রাসের রাজত্ব
সংখ্যাগুরু আদিবাসী মানুষকে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘুতে রূপান্তর
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
সংবিধান
সাঁওতাল
সাদা বিপ্লব

সাইমন কুজনেৎস্
সাম্প্রদায়িক অ-সম্প্রীতি
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
সাবেদ আলী
সার্বজনীন মালিকানা অধিকার
সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের কাগজ
সামন্তবাদ
সামন্তবাদী
সামাজিক অধিকার
সামাজিক অধিকার ও গোষ্ঠীগত অধিকার
সামাজিক পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা
সামাজিক বনায়ন প্রকল্প
সামাজিক ভারসাম্যহীনতা
সামাজিক মর্যাদা হ্রাস-বিলুপ্তি
সামাজিক সুবিধাদি
সামাজিক সুবিধাদি প্রাপ্তি-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন
সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার
সামাজিকভাবে নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক
সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য রক্ষা না করতে পারার বঞ্চনা
সাংবিধানিক স্বীকৃতি
সাংবিধানিক অধিকার
সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি
সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকারকে শ্রদ্ধা করা
সালিশ
সুদহীন ধার
সুযোগের অভাব বা সমসুযোগের অভাব
সুরক্ষার নিশ্চয়তা
সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক অবস্থান চমকপ্রদ
সিলিং
সিলিংউদ্বৃত্ত
স্বচ্ছতা-উদ্ভূত ক্ষমতায়ন
স্বচ্ছতার গ্যারান্টি
স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা
স্বল্প-বৈষম্যের মধ্য আয়ের দেশ
স্বল্পমেয়াদি সুফল
স্বল্প-মজুরীর দারিদ্র্য
স্বাস্থ্য-বঞ্চনা
স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য
স্বাধীনতা ও মুক্তির অন্তর্নিহিত মূল চেতনা
স্বাধীনতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী অ-স্বাধীন
স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ
স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ
স্থানীয় প্রভাবশালী

স্থানীয় গণপ্রতিনিধি
স্থানীয় টাউট
"সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য নিরসনে...সম্পদের সুষম বণ্টন"
"সর্বজনীন সম্পদ-সম্পত্তি মালিকানা অধিকার"
"সব কিছু উদারীকরণ ও মুক্তকরণ করো"
"সরকারি অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী"
' "সুপার ধনী'
"সুযোগের সমতা"
স্বদেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শনের'
"স্ব-ভূমি-ভাগচাষি"

হ

হাজং
হারি
হিন্দু নারী
হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার

ক্ষ

ক্ষমতা কাঠামোর অসহযোগিতা
ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ
ক্ষমতাহীনতা
ক্ষমতাহীনতা-উদ্ভূত বঞ্চনা
ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী
ক্ষুধার দারিদ্র্য
"ক্ষতি হ্রাস কৌশল"

২১ দফা এজেন্ডা

A
absentee landlord
Absolute landless
Absolute poor
absurd proposition
adverse inclusion
agrarian reform
Agrarian-Land-Aquarian Reform

B
"bad economics"

C
Cartesian framework
centrality of land
CHT Regulation 1900
class change of khas land
class neutral
class relations
class structure
CLO: Unitary System of Certificate of Land Ownership
common property rights
compartmentalized
conscientization
conscientization-mediated empowerment
contract money for leasing of land
cost of corruption
custodian not owner

D
deprivation trap

E
EBSATA-1951
ecologically suicidal
economically unjust
Economics of Love
effective demand for criminalization of politics
End of Ideology
Enemy Property Act
ensuring full freedom that people shall enjoy
ensuring opportunities for a full life
epistemologically
exclusion of the excluded
expanding choices to lead lives people value
extermination
external factors
externalities

F
fragmented
freedom mediated
Functional landless
"For the 1%, Of the 1%, By the 1%"

G
globalization
Great Intellectual Fraud

H
Hardcore poor
holistic as part of historical process
home grown epistemology
humane development
'hard issue'
"Hand not Land"
"Home grown development philosophy"

I
inclusion of the excluded
industrialization
informal sector

L
labour rent

M
marginalization
market fundamentalism
missing hindu population
mutation

N
National Land-water Utilization Policy; National Land Use Policy
natural science
Neo-liberal development philosophy

P
physical weaknesses
political arithmetic
Political Economy
poverty
powerlessness
production relations
productive forces
Public purpose
'personal law'
"Political Pricing"

R
regulatory role
removal of all sources of un-freedom
rent-seeker
res congnitans
res extensa
respecting constitutional and justiciable rights
RR-Record of Right
rural-to-urban forced migration

S
slumization
socially impoverishing
state as night guard
static, stationary status
super-duper rich
sustained inclusion of the excluded
'soft issue'

T
The Vested Property Repeal (Return) Act-2001
"Trickle down theory"

U
unitary law of inheritance
unpeopling
urbanization

W
well-being
"Water Preservation Act"